কাজল

রমেশচন্দ্র সেন

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭.

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬০

ছয় টাকা

: লেখকের অন্যান্য বই :

শতাব্দী

কুরপালা

গৌরীগ্রাম

চক্রবাক

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

মালঙ্গীর কথা

মৃত ও অমৃত

তারা তিনজন

কয়েকটি গল্প

সাগ্নিক

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন : ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীবিষ্ণু প্রেস : ২৩এ, ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত

পরম স্নেহভাজন সাহিত্যামোদী বন্ধু

শ্রীমান অজয়কুমার বসু

করকমলে—

প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র জগৎ থাকে। শিশু জগৎ গড়ে তার খেলনা ও পুতুল লইয়া। পুতুলের বিবাহে পাঁচজনকে মাটির লুচি. ও কাদার পায়েস খাওয়াইয়া তৃপ্তি পায়। বড় হইয়া সেই শিশুই ঘরবাড়ি তোলে, সংসার করে। কারও কারও জগৎ আরও বড় হয়, ব্যাপক হয়। বন্দুক কাঁধে করিয়া কেহ দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছোটে, বিমানে চড়িয়া কেহ বা করে মেরু আবিষ্কার। সূর্যের চারদিকে গ্রহের মতন নিজের গড়া এই জগতের চারিধারে মানুষ ঘুরপাক খায়। ইহাই তার বিধিলিপি আবার ইহাতেই তার আনন্দ।

কাজল গরিব গৃহস্থের মেয়ে। বাড়ি পল্লীগ্রামে, ফুল্লশ্রী নদীর উপর। উন্মুক্ত আকাশ, সবুজ গাছপালা, নদীর স্নিগ্ধ জল, মাঠের বুকে জাফরান রঙের রোদ— এই ছিল তার জগৎ।

ভোরে প্রতিবেশী ওয়াজেদ মিয়ার মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙে। নিরালা পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দুপুরে কোকিল কুহুকুহু ডাকিলে তার প্রাণ অজানা বেদনায় ভরিয়া ওঠে। কেমন যেন রঙিন বেদনা!

ছোট্ট পরিবার। ছোট তাদের জগৎ। যজমানি করিয়া কাজলের বাবা রামলোচন চাল কলা আনাজ আনেন, দু এক বিঘা জমিও আছে, তার ধান কলাই পান। মেয়েরা ধান সিদ্ধ করে, ডাল ভাঙে, চিঁড়া কোটে।

অবসর সময়ে পরিবারের সবাই মিলিয়া করে পরচর্চা। পাশের বাড়ির চপলার বয়স পনর হইতে চলিল। এখনও বিবাহ হয় নাই। চপলার বাবা রামনাথের চেয়ে ভাবনা হইল প্রতিবেশী রামলোচনদেরই বেশী।

কিন্তু কাজল এ সব আলোচনায় থাকে না। সময়ও তার কম, কাজ অনেক। ঠাকুরসেবা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রাখা, তার উপর নিজের রান্না—এগুলি নিত্যনৈমিত্তিক।

উপরি ফরমাশও অনেক রকম। উঠানে কাঠ ও ধান চাল শুকাইতেছে। আকাশজোড়া মেঘ করিল। ডাক পড়িল কাজলের। তার বৌদি বলিল, তাড়াতাড়ি সব তুলে ফেল ঠাকুরঝি। কাপড়গুলোও দেখো। গাংপারে ছাগল বাঁধা রয়েছে কিন্তু।

বৎসর অন্তর বৌদির ছেলেমেয়ে হয়। মায়ের সন্তান হওয়াও বন্ধ হয় নাই। এই সব সময় আঁতুড় ঘরের ভার পড়ে তার উপর। কাজল বালবিধবা, তার উপর অসাধারণ সুন্দরী, তাই মা সর্বদাই তাকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেন। কাজের ভার দিয়া ত্যাগী ও সংযমী করিয়া তুলিতে চান। গ্রামের সমাজও তাতে সায় দেয়। বলে, এই হ'ল ঠিক রাস্তা। কাজে না থাকলে নানা প্রলোভন আসবে। যৌবন হ'ল ঘৃতকুম্ভ, আর আগুন সে ত চারধারে লকলক করছে।

এই আগুনের হাত হইতে কাজলরূপী ঘৃত-কলসকে রক্ষা করার জন্য তার উপর বিধিনিষেধের অন্ত ছিল না। ইহা খাইতে নাই, উহা করা নিষেধ। মা কখনও সাবধান করিয়া দেন, গুনগুন করিস নে কাজল। লোকে কি বলবে?

এই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া আঠারো বছরের এই মেয়েটি অনেক কিছুই আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সবটা পারিল না।

কোন শুভ কর্মের সময় সে হয়ত সামনে যাইয়া দাঁড়াইল, পাড়ার বর্ষীয়সী কালী ঠাকরুন অমনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি ওদিকে চেয়ো না কাজল। তোমার চোখ পড়লে অকল্যেণ হবে। কাজল ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যায়। বাঁশের তৈরি ঘাটে দাঁড়াইয়া ফুল্লশ্রীর ছোট ছোট ঢেউয়ের দিকে চাহিয়া থাকে। সেগুলি ঠিক তার বুকের ছোট ছোট আকাঙ্খার মতন, উঠিয়াই আবার ভাঙিয়া পড়ে।

নদীর দু'পারে দুটা উঁচু থাম, তাতে কতকগুলি তার বাঁধা। তাদের পারের থামটা কাজলের বাড়ির নিচে ঘরের ধারে ইটে বাঁধানো বেদীর উপর। আগে সে, তার দাদা গণেশ, ও-বাড়ির কালুকাকা, অন্নপিসি সবাই থামে কান লাগাইয়া শব্দ শুনিত। সোঁ সোঁ শব্দ। এখন শোনে এ যুগের ছোটরা।

কিন্তু কাজলের এই থাম ও তাদের আকর্ষণ কমে নাই। ঐ তারের ভিতর দিয়া দেশ দেশান্তরের খবর আসে, আবার তাদের গ্রাম ধূপগঞ্জের খবর বিদেশে চলিয়া যায়। সে বিস্মিত হইয়া ভাবে, ইহা সম্ভব হয় কি করিয়া?

রৌদ্রে তামার তার ঝলমল করে, জলে ডুব দিয়া পাখীর দল আসিয়া তারের উপর রৌদ্র পোহায়। ঠোঁট দিয়া নিজেদের পালক ঠোকরায়। একে

অপরকে আদর করে। নানা রং বেরংয়ের পাখী, লাল হলদে কালো, কোনটা বা কালোর মধ্যে সাদা। কাজল মুগ্ধ নয়নে দেখে।

আর দেখে দু'একখানা উড়োজাহাজ, দূর হইতে জাহাজের শব্দ আসে, শব্দ ক্রমে নিকটতম হয়। তার দাদার বন্ধু পাঁচুদা বলে, জানো কাজল, এক ঘণ্টা আগে জাহাজটা কলকাতায় ছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে বরিশালে পৌঁছবে ?

কাজলের বিস্ময় জাগে, সে হাঁ করিয়া মানুষের তৈরি ঐ বিহঙ্গমের দিকে চাহিয়া থাকে।

তার মা সুন্দর মেয়ের এই কৌতূহলটুকুও বরদাস্ত করিতে পারেন না। বলেন, দেখছিস কি হাঁ করে, লজ্জা করে না ?

কাজলের নিকট হইতে জগৎ একে একে সব কাড়িয়া নেয়। কাড়ে অশন বসন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। এমনি ভাবে একটি তরুণীর স্বাভাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু মানুষ আনন্দধর্মী, সে চায় আনন্দ। ব্যথা বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চায়। কাজল বাড়ির শিশুদের মধ্যে সেই আনন্দ খুঁজিয়া নেয়। তাদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বুলিতে কথা বলে, হালুম সাজে। লুকোচুরি খেলে। আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একবার সামনে আসিয়া বলে, বুক্কি। শিশুরা খিল খিল করিয়া হাসে।

তার দাদা গণেশের ছোট মেয়েটিকে ঝিনুক করিয়া দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে অন্যমনস্ক ভাবে এক একবার বুকে চাপিয়া ধরে। পাঁচু বলে, মা হ'লে তোমায় ভারী মানাত। যেমন রূপ তেমনি বুকভরা ভালবাসা।

কাজল লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে। ভাবে, ছিঃ, পাঁচুদার এ কী কথা !

পাঁচুর দাদা শ্রীনিবাস জেলার মস্ত বড় উকিল। প্রচুর রোজগার। বনেদী ধরনের যৌথ পরিবারের কর্তার যে সব গুণ থাকা দরকার শ্রীনিবাসের মধ্যে তার প্রত্যেকটি গুণই ছিল। পাঁচুকে তিনি একাধিক চাকরি যোগাড় করিয়া দেন, কারবার করিবার জন্য কয়েকবার টাকা দেন। কিন্তু চাকরি করা পাঁচুর ধাতে পোষায় না। কারবারে প্রতিবারেই সে লোকসান দেয়। শ্রীনিবাসের ছোট ভাই—ইহাই পাঁচুর প্রধান পরিচয়। লোকটি অলস নয়, কাজ তার অনেক। দিনে একবার করিয়া সে

গোঁফের ডগা ছাঁটে, আধ ঘণ্টা অন্তর তেড়ি বাগায়, গ্রামের শখের থিয়েটারে বাঁশী বাজায়। ছোকরা সখীদের নাচ শেখায়। এর উপর তাস পাশা ত আছেই।

এই সব কাজের মধ্যে প্রায় সর্বক্ষণই সে সুর ভাঁজে। কখনও ঠুনঠুন পেয়ালা ; কখনও—যত বাঁধি মন ভালবাসিব না তায়।

কাজলের মা শারদা কড়া মেজাজের লোক। বিশেষতঃ বিধবা মেয়ের সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ। কিন্তু পাঁচুকে তিনি অদ্ভুতভাবে বরদাস্ত করেন। বলেন, ও আমার ঘরের ছেলে, গণেশ আর পাঁচুতে কি কোন তফাত আছে ?

গরীবের সংসার। অভাব অনটন লাগিয়াই আছে। কারও অসুখ করিলে পাঁচু সাবু বার্লি কিনিয়া দেয়। কোন দিন হয়ত বড় একটা মাছ হাতে করিয়া আসে। বলে, হাটে মাছটা দেখে বড্ড লোভ হল তাই নিয়ে এলাম। এবেলা আমি এখানেই খাব, মাসিমা।

সে আসিলে ছোটদেরও আহ্লাদ যেন ধরে না। কোনদিন তারা জিলিপি পায়, কোনদিন বা দিলবাহার তিলুয়া।

পাঁচু পূজা ও নববর্ষে শারদাকে জমকালো পাড়ের শাড়ি প্রণামী দেয়। মধ্যে মধ্যে গণেশের স্ত্রীকে দেয় তরল আলতা কিম্বা রঙিন সাবান।

কিন্তু লোকটি পাকা তীরন্দাজ। অন্য দিকে চাহিয়া তীর ছুঁড়িলেও তার লক্ষ্য ঠিকই বিদ্ধ হইল। কাজল মজিল। এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গেল, সমাজ তুমুল আন্দোলন তুলিল। গ্রামের জমিদার ষোড়শী বাবু রামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন, মেয়ে সামলাও লোচন। অমন সুন্দর মেয়ে, পাঁচজনের নজর ত পড়বেই। শুনলাম পেঁচো ছোঁড়া তাকে নিয়ে নৌকো করে হাওয়া খায় আর গান গায়, যত সব আদ্দিরসের গান।

রামলোচন কহিলেন, কে এসব বলেছে আপনাকে ? আমার মেয়ে নৌকোয় চড়ে নি আজ দু'বছর।

তাই নয় হ'ল। নৌকোয় না চড়ে কূলে বসেই হয়ত মজা লুটছেন। আমি তোমায় সাবধান করে দিলুম। যুবো মেয়ে হ'ল বারুদের স্তূপ, আগুনের ফুলকি থেকে তফাতে রাখতে হবে বৈকি।

রামলোচন বাড়িতে আসিয়া স্ত্রীকে সব বলিলেন। শারদা মেয়েকে

গালাগালি করিলেন। বাড়ির নিচে নদী আছে, কেলেঙ্কারি করার আগে ডুবে মরতে পার নি ?

রামলোচন বলিলেন, না বকে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বল।

বোঝাব আমার মাথা। বয়স কুড়ি হতে চলল, বুড়ো মেয়ে, নিজে বুঝে চলতে পারে না ?

রামলোচন কহিলেন, নিজেদের কথাটাও একবার ভেবে দেখ, এই বয়েসে—

তুমি চুপ কর—এক ধমকেই শারদা স্বামীর মুখ বন্ধ করেন। মেয়েকে শাসান, নিজেকে বাঁচাবার জন্য একদিন ফুল কেটে তোকে তফাত করে দিয়েছিলাম। দরকার হলে আবার তেমনি তফাত করে দেব।

উত্তর কলিকাতার কোন পল্লী, নাম সোনাবাগান।

দুইটা গলিতে মিলিয়া ইংরাজীর 'টি'র মতন। দক্ষিণেরটা চওড়া, সারা দিন রোদ থাকে। দুপুরে ইঁটে বাঁধানো পথের উপর পা রাখা যায় না। ঠিক মাঝখান দিয়ে উত্তরমুখো আর একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সূর্য রশ্মির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দুপুরে পনর বিশ মিনিটের জন্য যদি বা একটু রোদ পড়ে, তাহাতে পথের উপরের থুতুও শুকায় না। জুতার কাদায় গলিটা সারাক্ষণ প্যাঁচ প্যাঁচ করে।

পাঁচু কাজলকে লইয়া এই গলির আট নম্বর বাড়িতে উঠিল। বাড়িটা অন্ধকার, স্যাঁতস্যেঁতে ভাপসা গন্ধে ভরা। গন্ধ কাজলের ঘরেই বেশী, কুয়াসার মতন সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, হাত দিয়া গন্ধটাকে যেন ছোঁয়া যায়।

বাড়িতে সাতটা উনান। চার জন ভাড়াটের ঘরের সামনে চারটি, বারান্দার দু'কোণে দুটি, একটি সিঁড়ির তলায়। আঁচ দিলে সবগুলি উনানের ধোঁয়াই যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া কাজলের ঘরের মধ্যে ঢোকে। চোখ নাক জ্বালা করিয়া ওঠে।

কলিকাতা সম্বন্ধে এই তরুণীর কল্পনা ছিল রঙিন। মস্ত বড় শহর, সব কিছুই এখানে বিরাট, চওড়া রাস্তা আয়নার মতন ঝকঝকে, বিজলী আলোয় রাত্রে তাতে মুখ দেখা যায়। বাড়িগুলি যেন এক একটি রূপকথার রাজপুরী।

আটনম্বর বাড়িতে উঠিয়া তার সেই কল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে পাঁচুকে বলিল, এটা কলকাতা ত?

পাঁচু হাসিয়া বলিল, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি।

যাক্, তুমি আর একটা বাড়ি দেখ।

নিশ্চয় দেখব। যে বন্ধুটিকে লিখেছিলাম সে তাড়াতাড়িতে এইটে নিয়ে ফেলেছে।

দেখো লক্ষ্মীটি, পাড়াটা যেন ভাল হয়। আমার এখানে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করে না।

পল্লীটা দিনের বেলায় বেশ নিস্তব্ধ থাকে। তরুণীরা সারা দুপুর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। কখনও বা বর্ষীয়সীরা, বাড়িওয়ালীরা বাড়ির সদরে বসিয়া অনাবৃত বক্ষের ঘামাচি মারে, কোলের বিড়ালকে আদর করে। আর বলে সত্য মিথ্যায় জড়ানো নিজেদের অতীত জীবনের ইতিহাস।

এই সময় পানওয়ালারা গলিটা জুড়িয়া ঝুটা বাসন, পানের থালা ও খয়েরের বাটি মাজিতে বসিয়া যায়। তারাও নানারকম গল্প করে গত রাত্রের দালালির গল্পই বেশী। বাবুদের কে কতটা বেকুফ বানাইয়াছে সেই সম্পর্কে তাদের মধ্যে যেন গল্পের প্রতিযোগিতা চলে।

ঘর ঘর ভাড়াটে, প্রায় প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠের উপর ঘোড়ার পায়ের নাল বসানো।

সন্ধ্যার পর ঘরে নাচ গান শুরু হয়। তবলা বাজে, সঙ্গে চলে হৈ হুল্লোড়। কাজলের বুঝিতে কিছুই বাকী থাকে না।

এ কী ব্যাপার? দেশে থাকিতে পাঁচু বলিল, তাকে বিদ্যাসাগরী মতে বিবাহ করিবে। আর শেষটায় কিনা আনিয়া তুলিল রূপজীবিনীদের পল্লীতে। সে বলে, এ কোথায় আনলে তুমি আমায়! এরা কারা?

ওরা যাই হ'ক না কেন তাতে তোমার কি?—কথার প্রথম দিকে পাঁচুর স্বর ছিল বেশ রুক্ষ। কাজলের মুখের দিকে চাহিয়া সুর একটু মোলায়েম করিয়া সে আবার বলিল, আমরা ত আর এখানে বরাবর থাকছি না।

কাজল ভয়ে ভয়ে বলিল, বিদ্যাসাগর মশাইর—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, বললেই ত আর ঝপ করে হয় না, রেজেস্ট্রি আছে, হাকিমের কাছে যেতে হবে।

কাজল কহিল, হাকিম! হাকিম দিয়ে কি হবে? আমার ভয় করে।

ভয় করবে বলেই ত দেরি করছি, কিন্তু হাকিম চাইই। বিধবার বিয়ে, আমরা দুজনে দুই জাত। তার উপর আমার পরিবার আছে। ওটা যদি না থাকত—কথাটা বলার সময় তার মুখখানা যেন হিংস্র হইয়া উঠিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাঁচু কিন্তু বেশ জমাইয়া তোলে। কারও ঘরে গান বাজনার আসর বসিলেই তার ডাক পড়ে। সে বাঁশী তবলা হারমোনিয়ম ফরমাশ মতন সবই বাজায়, গান গায়। বাবুদের সঙ্গে মদ্য পান করে। মদটা বেশী হইয়া গেলে কোন দিন বা নাচে।

একদিন সে কাজলকে কহিল, চল না আধুলির ঘরে, আজ মুজরো আছে। সব সময় বসে বসে বাড়ির কথা ভাবলে শরীর টিঁকবে কেন?

তা থাক্, আমার লজ্জা করে। তুমিও আর অমনি করে নেচো না। অত মদ খেও না। শরীর ভেঙে যাবে যে—

হেঃ হেঃ, বিলিতী মদে আবার শরীর ভাঙে নাকি? ডাক্তাররা নাড়ী ছেড়ে গেলে রোগীকে ব্র্যাণ্ডি দেয় জান?

বাড়ি শুদ্ধ সবাই পাঁচুকে পছন্দ করে। বাড়িওয়ালী প্রমীলা বলে, কাজল মেয়েটা দেমাকে বটে কিন্তু ছেলে একখানা পাঁচু—গাইতে, নাচতে। তাছাড়া কেমন খাসা গোঁফ চুমরোয়।

গোঁফের উপর প্রমীলার কেমন যেন দুর্বলতা আছে। কোন অচেনা পুরুষের কথা উঠিলেই সে প্রশ্ন করে, তা গোঁফ আছে? চুমরোয় ত?

পাঁচু বাড়িওয়ালীকে প্রায়ই নস্য ও তামাকপাতা উপহার দেয়। একদিন দিল একখানা রঙিন চিরুনি।

প্রমীলা বলিল, এখন আর রঙিন চিরুনি দিয়ে কি হবে?

কেন? আপনার বয়সটাই বা এমন কি? তা ছাড়া চেহারা যা রেখেছেন।

পাঁচুর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া প্রমীলা বলিল, সে কথা অবিশ্যি বলতে পার। এই সেদিনও বেনেদের ম্যানেজার বলছিল—

কি বলছিল দিদি?

সে আর শুনে কি হবে? লজ্জার কথা। বলছিল, শরীর যা আঁটসাট রেখেছ তাতে যুবো মেয়েরাও তোমার কাছে হার মানে, পিরমিল। জান ত ম্যানেজারকে? এখন এষ্টেটের মালিক বললেই চলে। খালি সভা করে, বক্তিমে দেয়, গোঁফ যা একজোড়া রেখেছে।

এই ধরনের আলোচনায় প্রৌঢ়ার মন বেশ সরস হইয়া ওঠে। কোলের

বিড়ালটাকে আদর করিতে করিতে বলে, বেড়াল একখানা এই মেনি। শীতের সময় পিঠে এমন পিঠ লাগিয়ে শোয়, মনে হয় পশমের জামা গায়ে দিয়ে রয়েছি।

ঘরে ঘরে আমোদের বন্যা। মেয়েরা গান গায়, নূপুর পরিয়া নাচে। পাঁচু তবলায় চাটি দেয়। দ্রব্যগুণের প্রভাবে লম্পটের দল বাঃ, বাঃ মেরি জান প্রভৃতি শব্দ করে আর কাজল তখন নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবে তার দেশের কথা। গাছপালা, মাঠঘাট, সূর্যের কিরণ, রাত্রির জোছনা এমন কি দেশের অন্ধকারটুকুও যেন অপরূপ স্নেহমাখানো। সবই যেন শান্তি বিলায়, মঙ্গল বিকিরণ করে।

স্নিগ্ধ তাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাসি। সে হাসি আর দেখিবে না ভাবিলে তার বুকটা হু হু করিতে থাকে। বেশী করিয়া মনে পড়ে দাদার ছেলে গোরাকে, মনে পড়ে গদার কথা। তাদের প্রতিবেশী উমাচরণের ছেলের কুকুর গদা, নাদুসনুদুস লোমশ গড়ন। গদা তাদের গ্রামের সব কুকুরের চেয়ে বলবান।

এক একবার ভাবে, আচ্ছা, বাবা এখন কি করিতেছেন? তিনি কি একবারও তার কথা ভাবেন না? নিশ্চয় ভাবেন। তাকে যে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, বিধবা মেয়ের দুঃখে রামলোচন মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে কাঁদিয়া উঠিতেন, কাজল, মা।

ভারী স্নেহময় তিনি। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। লোকটি স্বভাবদুর্বল, তার উপর গরিব। ভারী গরিব।

কাজলের সঙ্গে এই বাড়ির দুটি মেয়ের বেশ ভাব হইল। একজনের নাম প্রিয়। একদিন সে আসিয়া কাজলকে বলিল, শুনলুম তুমি বামুনের মেয়ে। আমাদের এক ঝাড়। তাই ভাব করতে এলুম।

প্রিয়র যত গর্ব জাতি লইয়া। এই পথের মেয়ে সে নয়। বাপ তার বিশুদ্ধ বামুন, দুবেলা আহ্নিক করে। পৈতা হাতে পেচাইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া কত মন্ত্র আওড়ায়।

প্রিয় বলে, অত কি মনে থাকে? দুটো আছে, পেল্লয় পয়দ আর জবাকুসম—

সর্বদাই সে ছোঁয়াছুয়ি বাঁচাইয়া চলে।

'একটু সরে যাও দেখি, সবে এই চান করে উঠচি।' ছুঁয়ে দিও না যেন বামুনের মেয়ে ভাত নিয়ে যাচ্ছে'—তার মুখে এই সব সাবধান বাণী লাগিয়াই

আছে। প্রায় সব সময়ই সে গামছা পরিয়া থাকে। গায়ে জড়ায় আর একখানা গামছা। বপু বেশ স্থূল। তাই সমস্ত অঙ্গ ঢাকা পড়ে না। মেয়েরা বলে, গামছা গোঁসাই।

পাঁচু বামুন নয় শুনিয়া প্রিয় একদিন বলিল, এ্যাঁ অন্ত্যজ?

কাজল বলিল, তোমার কাছে যারা আসে তারাই কি সব নিকষ কুলীন?

তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি শুনি? তারা হল জাহাজের যাত্রীর মতন। যার সঙ্গে এসেছিলাম সে ছিল চক্কোত্তি বামুন।

কাজলের অপর বান্ধবীর নাম সুবালা। সে করে তার বাবুর গল্প। বলে, সে থাকলে আজ কি আর রাস্তায় দাঁড়াতে হয়? দু দুখানা তার দোকান, একখানা মশারির, আর একখানা ফল পাকুড়ের। নিত্য ফল নিয়ে আসত, কলা, কমলালেবু, আম, আপিল, যখনকার যা। বলেছিল একখানা বেনারসী দেবে, আর একটা আয়না বসানো আলমারি।

কাজল প্রশ্ন করে, কি হ'ল তার?

সুবালা উত্তর করে, হয়ত মোটর চাপা পড়ে মরেছে, যা মদ খেত।

কথাটা বলে নিতান্তই নির্বিকারভাবে। তার লম্বা গলা আরও লম্বা হয়। কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া পড়ে।

সুবালা কাজলকে ভালবাসে। প্রায়ই তার উনান ধরাইয়া দেয়। ছাদ হইতে শুকনা কাপড় লইয়া আসে। দুপুরে পাঁচু না থাকিলে আসিয়া গল্প করে। মধ্যে মধ্যে কাজলের চিবুক ধরিয়া বলে, তুই ভারী সোন্দর। তোর বাবুর পছন্দ আছে বলতে হবে।

কাজল বলে, বাবু কি? ও আমার ভাল লাগে না?

বেশ বাবু বলব না। বলব তোমার পাঁচু, বলিয়াই সুবালা গম্ভীর ভাবে উপরের ঠোঁটে আঙুল ঘুরাইতে থাকে, পাঁচু যেমন করিয়া গোঁফে তা দেয় ঠিক তেমনি। কাজল হাসিয়া ফেলে।

একদিন দুপুরে কাজল সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রসবতীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। রাস্তা হইতে তাকে দেখিয়া ভদ্রবেশী একটি লোক বাড়ির সামনে দু'তিনবার ঘোরাঘুরি করিল। লোকটির মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মাঝখানে

তেড়িকাটা, গায়ে চুনট করা আদ্দির পাঞ্জাবি। দরজার চৌকাঠ পার হইয়া একটু ভিতরে আসিয়া সে ডাকিল, শোন।

কাজল ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তার কানে গেল, রসবতী বলিতেছে, নতুন কিনা।

কাজল শিহরিয়া ওঠে, নতুন! তার মানে? তাকেও কি তবে পুরানো হইতে হইবে না কি, দরজায় দাঁড়াইতে হইবে, ঐ ওদের মতন?

সে আর ভাবিতে পারে না, তার রাগ হয় নিজের উপর, রসবতীর উপর, পাঁচুর উপর। ইচ্ছা হয়, এই বাড়ি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

এক একবার রসবতীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, "আমি নতুন একথা বললে কেন? আমি ত ও রাস্তায় যাব না।" কিন্তু সাহসে কুলায় না।

কয়েকদিন আগের কথা। রসবতীর বিড়াল আদুরী কাজলের কোলে লাফাইয়া পড়ে। বিড়ালে কাজলের বড় ভয়। দূর দূর করিয়া আদুরীকে সে তাড়াইয়া দেয়।

রসবতী গা ধুইতেছিল। গামছা-পরা অবস্থায় একরূপ ছুটিয়া আসিয়াই বলিল, আদুরীকে মারলে যে বড়? আস্পর্ধা ত তোমার কম নয়।

কাজল বলিল, মারিনি ত আমি। লাফিয়ে গায়ে উঠেছিল, নামিয়ে দিয়েছি। বেড়ালে আমার বড্ড ভয়।

নেকী, বেড়ালে ভয়! আমি কলঘর থেকে দেখলুম, মারলি।

এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথায় কাজল অবাক হইয়া যায়। কোন উত্তর করে না। রসবতী মনের সুখে গালি পাড়ে, শেষটায় ক্লান্ত হইয়া নিজেই রণে ভঙ্গ দেয়।

সারাদিন পাঁচু বাড়ি ছিল না। ফিরিল সন্ধ্যার পর। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে রাত্রে কাজল কহিল, এ বাড়ি ছাড়বে কবে? রাস্তার লোকেও যে অপমান করে যায়।

পাঁচু রোজই মদ খায়। আজ মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল। জড়িত কণ্ঠে বলিল, তার মানে?

কাজল দুপুরের ঘটনাটা সবিস্তারে বলিলে পাঁচু হাসিয়া উঠিল, ওঃ—এই কথা, এ আর কি অপমান?

কাজল বিস্মিত হইয়া বলিল, অপমান নয়! এই শুনে তুমি হাসছ?

যাও, যাও, আর নেকামি করতে হবে না। সতীপনা দেখাতে এসেছেন।

হঠাৎ তুমি এত রেগে গেলে যে। কি নেকামি করলুম।

তোমার ঘ্যান ঘ্যানানি শুনলে আমার রাগ হয়।

কাজল বলে, তা ত হবেই। কি ভুল না করেছি!

পাঁচু হঠাৎ যেন খেপিয়া গেল। কাজলের দুই হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিল, ভুল করেছিস, ভুল! বাপ মা যখন কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে তখন ঠাঁই দিয়েছে এই পাঁচু হাজরা।

কাজলের হাতে বেশ লাগে কিন্তু সেই ব্যথাকে ছাপাইয়া ওঠে অপমান। তাকে নীরব দেখিয়া পাঁচু আরও রাগিয়া যায়।

হারামজাদীর সঙ্গে কিছুতেই পারবার জো নেই। আস্ত শয়তান—বলিয়া সে হাতের কাছের একটি ফুলদানি ছুঁড়িয়া মারে। কাজলের কপাল কাটিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়ে।

সে চীৎকার করে না, কাঁদে না—শুধু একটি শব্দ করে, উঃ। তারপর কাপড়ের খুঁট কপালে চাপিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

রাত্রি বাড়ে। বাড়িটা ক্রমে ক্রমে নিঝুম হয়। নিস্তব্ধ সমগ্র পল্লী। কাজল এক একবার দেওয়ালের দিকে চায়, আবার চায় মেঝের দিকে। সেখানে তার রক্তে রাঙা ফুলদানির কুচি ছড়ানো।

বাল্‌বের চারধারের দেওয়ালে ছোট বড় অসংখ্য পোকা। একটি টিকটিকি পোকা গিলিবার জন্য আড়ি করে। ছোট্ট প্রাণী কিন্তু কী হিংস্র তার চাহনি, সেই চাহনি শিকারকে মন্ত্রের মতন অভিভূত করে, নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

এক এক করিয়া অনেকগুলি পোকাই সে গ্রাস করে।

কাজল তার পোকা গেলা দেখে, তন্ময় হইয়া।

মাসখানেক পরের কথা। রাত আটটা, নয়টা, দশটা বাজে, পাঁচু ফেরে না। অন্যদিন দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে বলিয়া যায়, আজ কিছুই বলে নাই; তাই কাজল চিন্তিত হয়।

একাদশীর উপবাস, দুপুরে সাবু ভিজানো খাইয়াছে, পাঁচুর রাত্রির খাবার

তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতেই এইরূপ করে; রাত্রে এঁটো ছোঁয় না।

দরজায় দু'জন দাঁড়াইয়াছিল, সুবালা আর রসবতী। রসবতী মধ্যে মধ্যে সামনের পানওয়ালাকে ডাকিয়া বলে, দুটো পান দিয়ে যাও, তিন নম্বর, একটু বেশী করে চুন আর দোক্তা এনো।

পানওয়ালা চাকর ও দালালে মিলিয়া গলিতে রামচরণই পাঁচ ছয় জন। আট নম্বরের বাড়ির সামনে আঠাশ নম্বর বাড়ীর রোয়াকের রামচরণকে সবাই ডাকে তিন নম্বর বলিয়া।

কাজল একবার সদর দরজার নিকট হইতে মুখ বাড়াইয়া গলির এদিক ওদিক দেখিয়া যায়। সুবালা ঠাট্টা করে, ভয় নেই, নাগর ফিরবে।

সেবার কাজল মুখ বাড়াইতেই একটি পথচারী তার বন্ধুকে বলিল, দেখছিস কেমন টানা চোখ, একেবারে হরিণের মতন। প্রাণ তর্ হয়ে যায়।

বন্ধুটি নেশায় চুর হইয়াছিল, সে চোখ উল্টাইয়া বুকে হাত রাখিয়া কাজলের উদ্দেশ্যে বলিল, মেরি জান।

সুবালা ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, দরজায় ছিল রসবতী আর কাজল। রসবতী কাজলের সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু মানুষকে গালি পাড়িবার এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিল না। মাতালের উদ্দেশে বলিল, বুড়ো ধাড়ীর মরণদশা!

কি বললি, মরণদশা? আমি বুড়ো ধাড়ী!—বলিয়া মাতাল তাড়া করিতেই কাজল ভিতরে চলিয়া গেল। রসবতী বলিল, ভারী যে তেজ দেখছি, বীর হনুমান।

মাতালের বীরত্ব তখন দেখে কে? সে লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে, তারস্বরে চেঁচায়। তার বন্ধু বলে, স্টপ, ভুঁদো, অন্ততঃ এবারটি ফর্ মাই সেক।

ভুঁদো আরও জোরে চেঁচাইয়া ওঠে, ভয় করি নাকি কাউকে? ঘোষপাড়ার ছেলে আমি, সন্নো ঘোষের নাতি।

এই সময় এক কনষ্টেবল আসিয়া পড়ায় ভুঁদোর মাথায় যেন জলপড়া পড়িল! একগাল হাসিয়া কনষ্টেবলকে বলিল, সেলাম আলেকুম বড় মিয়া।

গম্ভীরভাবে দাড়ি চুমরাইয়া কনষ্টেবল বলিল, যাও, যাও হল্লা মত্ করো।

রসবতী মাতালের উদ্দেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া বলে, তুয়ো।

কাজল ঘরে বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবে। গুণ্ডার আক্রমণ, গাড়ী চাপা পড়ার ভয়, কলিকাতায় বিপদ পদে পদে। ভাবিয়া সে কোন কূলকিনারা করিতে পারে না। এক একবার মনে হয়, পাঁচু হয়ত অন্য কোন মেয়েমানুষের বাড়ি যাইয়া ফুর্তি করিতেছে। আজকাল তার ভাবগতিক যেমন তাহাতে সে সম্ভাবনাও কম নয়। কখনও সে খোঁড়া হর্তুকির চিবুক ধরিয়া নাড়ে, কখনও বেদানার লালচে গালে টোকা দেয়। কাজল এসব লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু পাঁচুকে কিছু বলিতে ভরসা হয় নাই।

সারাদিন প্রায় উপবাসী আছে, শরীর দুর্বল, এক একবার চোখ বুজিয়া আসে, মাথা ঢলিয়া পড়ে। কাজল চোখ রগড়াইয়া ঘুম তাড়ায়, কান খাড়া করিয়া থাকে। অন্যদিন বেশী রাত্রে ঘরের বাহির হয় না। আজ পা টিপিয়া টিপিয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। দরজায় কান লাগাইয়া পথের লোক চলাচলের শব্দ শোনে।

শেষ রাত্রের দিকে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্নে দেখিল, ছোট্ট ডিঙিতে করিয়া সে ও পাঁচু ফুল্লশ্রীতে বেড়াইতেছে। চাঁদিনী রাত, খাল নদী গাছপালা সারা প্রকৃতি যেন অভিসারের পোষকপরা। জোছনার সে এক অপূর্ব মহোৎসব। পাঁচু বাঁশী বাজায়। বাঁশীর সুরে চারিদিক যেন ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে, কাজলের কানে বাজে সেই সুরের মূর্ছনা।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে চোখ মেলিয়া দেখে পাঁচুর খাবারের ঢাকনি এক পাশে পড়িয়া, মেজেয় মাছের কাঁটা ছড়ানো, দরজা পর্যন্ত ঝোলের দাগ। তার বুকটা ছাঁৎ করিয়া ওঠে।

এই সময় সুবালা সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে আসিতেছিল। কাজলের মূর্তি দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কাজল কাঁদিয়া ফেলিল, এমনি সে কাঁদে না, কাঁদেও নাই বহুদিন। পাঁচ বছর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। সেকথা কিছুই মনে নাই, স্বামীর সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার ছিল না। শুধু মনে পড়ে সুশ্রী এক কিশোরকে। বিবাহের পর ছেলেটি একবার কাজলদের বাড়িতে আসিয়াছিল। পাড়ার মেয়েরা বলিল, এই তোর সোয়ামী, দেখছিস কেমন চেহারা, যেন রাজপুত্তুর।

কাজল রঙচঙে একটা মাটীর পুতুল দেখাইয়া বলে, রাজপুত্তুর না হাতী! আমার হাতের পুতুলটা ওর চেয়ে ঢের সোঁদর।

তার বয়স যখন আট তখন আসে বিধবা হওয়ার সংবাদ, শারদা মেয়েকে গাং ঘাটে লইয়া যান। তাকে স্নান করাইয়া শাঁখা ভাঙেন, পরিতে দেন শাদা থান।

কাজলের মনে পড়ে তাদের গ্রামের যতীন চক্রবর্তীর পোষাক বদলানোর কথা। যতীন ধূপগঞ্জ আর্ট থিয়েটারে একই রাত্রে প্রথমে রাজা সাজে, তার পরে আসে ঝির পোষাক পরিয়া। এও সেই রকম এক মজার ব্যাপার মনে করিয়া কাজল মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। শারদা তার গালে প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিলেন, হারামজাদী কপাল যে পুড়েছে তাও বোঝ না।

সেদিন কাজল খুব কাঁদে। কপালপোড়া যে কি বস্তু তাহা বোঝে নাই, কাঁদে মায়ের চড় খাইয়া। তার পর আবার কাঁদিল আজ।

তখন নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে নাই। আজ পারে। মানুষে মানুষে ঠাসা এই পৃথিবীটাকে একান্তই রিক্ত মনে হয়, ঘিঞ্জি গলিটাকে যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

নদীপারের জমি জলে ধ্বসিয়া পড়ার আগে হইতেই মাটির বুকে সরু দাগ পড়ে। তীরের লোক উহা দেখিয়া সতর্ক হয়। পাঁচুর প্রেমেও সেইরূপ ফাটল ধরিয়াছিল। একটুতেই সে রাগিয়া যাইত। তেল নুন মশলার কথা বলিলেও মুখ ঝামটা দিয়া উঠিত, মশলাও গিলে খাও নাকি ?

একদিন বাঁধিল ডিম খাওয়া লইয়া। কাজল ডিম খাইবে না। পাঁচুও জিদ ধরিল, তাকে ডিম খাওয়াইবে। কাজল তার কথা রক্ষা না করায় সে রাগিয়া বলিল, সতী সেজে থাকবে আর কতকাল ? ডিম তোমায় খেতেই হবে, আমার হুকুম।

আর এক দিনের কথা। কাজল বলে, বাড়ি ছাড়ার কি করলে ? আর বিদ্যা—

বাড়ি ছাড়ার কথা তবু উত্থাপন করা চলে কিন্তু বিদ্যাসাগরের নাম করার উপায় নাই। কাজলের মুখে বিদ্যা পর্যন্ত শুনিয়াই পাঁচু রাগিয়া গেল। বলিল, এই পণ্ডিতটা দেশের কী ক্ষেতিই না করে গেছে !

কাজল বুঝিত সবই কিন্তু তার কোন উপায় ছিল না। সে স্রোতের আবর্তে তৃণের মতন ভাসিয়া চলিল।

দুপুরে প্রিয় আসিয়া প্রবোধ দিল, এ রাস্তার নিয়মই এই। আমার চক্কোত্তিটাই কি কম হারামজাদা ? সব গহনা নিয়ে পিট্‌টান দিলে। তোর বাক্স টাক্স দেখেছিস ত ?

কাজল কোন কথা বলিল না। প্রিয় বলিল, কাল উপোস করে আছিস। খাবি আয়, তোর জন্যও চারটি চাল নিয়েছি। জানি ত বামুনস্য বামুন গতি।

কাজল বলিল, আজ থাক। তোরা আমায় একটু একলা থাকতে দে।

প্রিয় বলিল, না খেলে বাঁচবি কি করে, শরীরটাই ত আমাদের সম্বল।

আবার সেই শরীর সম্বলের কথা, ভবিষ্যতে বেশ্যা হওয়ার ইঙ্গিত। কাজল আর সহ্য করিতে পারে না, ঝাঁজালো স্বরে বলে, তোরা আমায় ভাবিস কি বল্ দেখি ?

প্রিয় স্থির সংযত কণ্ঠে উত্তর করিল, ভাবি—আর একটা হতভাগী বাড়ল, আর সে হতভাগী বামুনের মেয়ে।

কাজল একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। প্রিয় তার বন্ধু, তাকে ভালবাসে, সেও মনে করে কাজলের ঐ ছাড়া আর গতি নাই। সে আর ভাবিতে পারে না, দুই ভ্রূর মধ্যে কালীর মূর্তি কল্পনা করিয়া ডাকে, মা, মা কালী।

তার বাবা তাকে শিখাইয়াছিলেন, বিপদে পড়লে দুই ভ্রূর মধ্যে মা কালীর ধ্যান করবি।

দুই দিন এইভাবে কাটে। প্রিয় তাকে ডাকিয়া খাওয়ায়। সুবালা যত্ন করে।

একদিন কাজল সামনের পানের দোকানের তিন নম্বরকে ডাকিল। বেঁটে খাটো এই মানুষটি স্পিরিটের বৈয়মে ভিজানো গিরগিটির মতন চেহারা, হিংস্র চাহনি, নাকটা ডাইনে একটু বাঁকা। পানের দোকানে বসিয়াই এই তিন নম্বর পতিতার দালালি করে, বেশী রাত্রে চড়া দামে মদ বেচে। গুজব যে কোকেন বেচাই তার প্রধান ব্যবসা। লোকটাকে কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু খাতির করে সবাই। এমন লোককে দিয়াই কাজ হাসিল সম্ভব তাই কাজল তাকে ডাকিয়াছিল। সে আসিয়াই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, কি হুকুম কাজল বিবি ?

আমি বিবি নই, বাঙালীর মেয়ে। বড় বিপদে পড়ে তোমায় ডেকেছি। তুমি বাবুর খোঁজ করে দাও।

তিন নম্বর বলে, জরুর। দো-আনিকো বাবু বাগ্. গেইলো। হামি পাত্তা লিয়ে আইলাম। দো-আনি বকশিশ করলো পঁচাশ রূপেয়া।

কাজল বলিল, আমি গরীব মানুষ। বেশী ত দিতে পারব না !

তুমি ভাল মানুষ আছ। হামি মুফৎ করিয়ে দেব। উনার নাম কি

আছে? হামি ত জানিয়েছি পাইচঁু বাবু। লেকিন বান্নুরজি কি ঘোষ্যাল, পুরানাম কি আছে?

শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা।

সমঝ গেইয়েছি, ছিরি পাঁইচু গোপাল হাজার।

হাজার নয় হাজরা।

ঠিক সমঝ গিয়া, হাজরা রোড হ্যায়, ঐ হাজরা।

রাত ৯টার পর তিন নম্বর আসিয়া খবর দেয়, কাইশিপুর বেলিয়াঘট্টা ইটাগড় তামাম ঢুঁড়লাম—লেকিন বাবুকা পাত্তা মিলল না।

কাজল কহিল, কাল আবার চেষ্টা করে দেখ।

কাল সেকেগা নেই, বহুৎ কাম আছে।

পরশু?

নেই, এতোয়ারমে পাত্তা লেগা।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কালী কীর্তন জান?

জরুর। কালী মাইকা গাহনা বাজনা, উ সব জানি।

ও কালী কীর্তন খুব ভালবাসত, যেখানে কালী কীর্তন হয় সেই সব জায়গায় খোঁজ কর—বলিয়া কাজল তার হাতে একটি টাকা দিতে গেলে তিন নম্বর বলিল, রূপেয়া দেকে কি হোবে?

তোমার খরচ পত্তর হয়েছে।

খরচা বহুৎ ভৈলো। টিরেনকা মাশুল লাগলো, টিরেম উরেম ভি চাপলাম। খরচা ভৈলো দো রূপেয়া।

কাজল আর একটি টাকা বাহির করিলে তিন নম্বর বলিল, কুছ দরকার নেই। তুমি ভালমানুষ আছ, তুমহার কাম মুফৎ করব।

তিন নম্বরের সহৃদয়তায় কাজল মুগ্ধ হইয়া যায়। বলে, গরিব মানুষের তুমি উপকার করলে, মা কালী তোমার ভাল করবেন।

তুম্ গরিব নেই দিদি, লেকিন রাণী আছ। আচ্ছা দিন ঘুমে আসুক, তব্ জাস্তি বকশিশ লেব।

তিন নম্বর মধ্যে মধ্যে আসে, কাজলের কাছে দুঃখ করে, এতো রাস্তা ঢুঁড়লাম, লেকিন বাবুকা পাত্তা মিলল না।

তার সহানুভূতি কাজলের হৃদয় স্পর্শ করে। সে বলে, তুমি নিজের লোকের মতনই করছ। কি আর করবে, সবই আমার বরাত।

প্রিয় একদিন বলিল, তোর সঙ্গে তিন নম্বরের এত গুজুর গুজুর কিসের রে?

কাজল বলিল, ও তার খোঁজ করছে কিনা।

প্রিয় বলিল তিন নম্বর করবে খোঁজ! তা হলেই হয়েছে।

ও চালাক লোক, সন্ধান পেতেও পারে।

চালাক বলেই ত ভয়। কতবার যে নাম পালটেছে ঠিক নেই। আগে নাম ছিল সহদেব। মাঝখানে হল আকরাম, তখন এ পাড়ায় থাকত না। এখন সেজেছে রামচরণ।

কাজল বলিল, যাই বল লোকটা ভাল। আমার কাছ থেকে একটি পয়সা নেয়নি।

প্রিয় হাসিয়া বলিল, তা যাক্, তবে, আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে; উচিত ছিল হারুকে দিয়ে খোঁজ করানো। আমাদের হারাধন ডাক্তারের কথা বলছি।

কাজল হারাধনকে চিনিত, প্রিয়র ঘরে দেখিয়াছে। সে বলিল, বেশ, আজই তাকে বল ভাই।

হারাধন ডাক্তার সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে বেশ একটু লম্বা, দোহারা গড়ন, মাথায় টাক, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। লোকটি আগে ছিল মার্টিন কোম্পানির টালি ক্লার্ক, বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস করে।

প্রিয়র সর্দি হইলে, দাঁত কনকন করিলে হারাধন নিজেই ঔষধ দিয়া যায়। ফি নেয় না, ওষুধের দাম নেয় না, শুধু এক গ্লাস করিয়া জল খায় আর দুইটি পান। চুন খায় কিছু বেশী। হোমিওপ্যাথির, বিশেষ করিয়া নিজের সুখ্যাতি তার মুখে লাগিয়াই আছে। সে বলে, ডাক্তাররা ছেড়ে দিলে, দিলুম ঠুকে ক্র্যাটিগাছ, মাদার টিংচার। রোগী ঝপ্ করে উঠে বসল।

একদিন বলিল, চণ্ডী দত্তর কেসে আমার ডায়গনোসিস দেখে ডাক্তার হোয়াইটহেড বললেন, ইউ আর এ মারভেল হারিডেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় প্রকাশ করে, এর জন্য আমার কোন ক্রেডিট নেই। যা কিছু মহাত্মা গুরুদেবের—বলিয়া তার গুরু 'ডাক্তার বলে'র উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। তারপর প্রণাম করে হানিমানকে।

রসবতী বলে, যেমন গামছা গোঁসাই, তেমন জুটেছে তার ডাক্তার গরুড় গোঁসাই।

প্রিয় হাসিয়া বলে, ওর নাক উঁচু বলে ঠাট্টা করছিস কম্। লোকটা কিন্তু বিদ্যের গুদাম।

সে হারাধনকে বলিল, তুমি পেঁচোর একটু খোঁজ কর। বেলগেছে, কামবিল, পটলডাঙার হাসপাতাল সব ত তোমার হাতের মধ্যে। দারোগা পুলিসে তোমার ওষুধ খায়।

হারাধন নিজের সুখ্যাতিতে খুশি হইয়া প্রিয়কে একটি সিগারেট দেয়। আবার কাজল সিগারেট খায় না শুনিয়া বলে, বেশ কর। তামাক হচ্ছে ভারী খারাপ জিনিস। ওতে টোব্যাকো-হার্ট হয়।

সে চলিয়া গেলে প্রিয় কাজলকে বলে, ধুতি চাদর পরে ঘোরে বটে কিন্তু হারুর পসার খুব। আনি, দো-আনি, গাইয়ে বিন্দু, ফজলি আম সব ওর ওষুধ খায়। রোগী ওর সব জায়গায়, ও ঠিক খবর এনে দেবে।

রসবতী টানিয়া টানিয়া বলিল, লোকটা বেশ তবে দোষের মধ্যে বামুন নয়।

প্রিয় বলে, কে বললে? ওরা শাকদ্বীপ, আমরা যেমন কনোজদ্বীপ। বামুন দুরকম কিনা।

বাড়িওয়ালী প্রমীলা কোন দিনই কাজলকে ভাল চোখে দেখে না। বলে, মেয়েটা দেমাকে। তা বাবা রূপ কি আর দেখিনি? নিজেরাও কুরূপ কুচ্ছিত নই। কিন্তু দেমাকে বলতে পারবে না কেউ।

পাঁচু চলিয়া যাওয়ার পর সে একদিন কাজলকে বলিল, তোমার বরাত মন্দ, নইলে পাঁচুর মত ছেলে পালিয়ে যায়? ধরে রাখতে পারলে না? জান ত পুরুষের স্বভাব। নদী পেরিয়ে সাঁকো ভেঙে দিতে ওরা ভারী ওস্তাদ।

কাজল কোন উত্তর করে না।

দিন কয়েক পরে প্রমীলা তাকে মনে করাইয়া দেয়, কাল থেকে তোমার বাড়ি ধোয়ার পালা।

এ বাড়িতে ছয় ঘর ভাড়াটে, তাদের প্রত্যেককে পালা করিয়া বাড়ি ধুইতে হয়। বাড়ির প্রবেশ পথ, বারান্দা, তেতলা পর্যন্ত সিঁড়ি এগুলি পরিষ্কার রাখার ভার মেয়েদের উপর। কেহ নিজে ধোয়, কেহ ঝিকে দিয়া ধোয়াইয়া নেয়।

পাঁচু চলিয়া যাওয়ার পর কাজল ঝি তুলিয়া দিয়াছে। আজ তাকে নিজের হাতে বাড়ি ধুইতে হয়।

প্রত্যেক বারান্দায় একটি করিয়া ঝাঁজরি, সেগুলিতে বমি প্রস্রাব, উঠানে ছত্রিশ জাতের উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড়, চিংড়ির খোসা। কোমরে কাপড় জড়াইয়া, নাকে রুমাল বাঁধিয়া কাজল এইসব পরিষ্কার করে, নাক জ্বলিয়া যায়। পেট গুলাইয়া বমি আসে।

ধোয়াধুয়ির পর বাড়িওয়ালী নিজে তদারক করে। ত্রুটি ধরা, খুঁত খুঁত করা তার অভ্যাস। আজ কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও সে কোন খুঁত ধরিতে পারিল না। বলিল, ঝাঁট দেওয়া তোমার বরাবরের অভ্যেস বুঝি?

কাজল উত্তর করিল, ঝাঁট দেওয়া, গোবর নিকানো, দেশে এসব আমিই করতুম।

তা ছাড়া করবেই বা কে? ঝি চাকর রাখবার আর ক্ষ্যামতা কোথায়? শুনেছি ত পাঁচুর কাছে।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, কি বলেছে সে?

প্রমিলা বলিল, না না, এমন কিছু নয়। একজনের কথা আর একজনের কানে তুলব তেমন মা বাপের মেয়ে আমি নই।

দুপুরে প্রিয় ও সুবালা আসিয়া কাজলের ঘরে গল্প করে, এই পাড়ার গল্প, রেসের গল্প। একদিন সুবালা বলিল, তার এক বাবু পাঁচ টাকা খেলিয়া টালিগঞ্জের ঘোড়দৌড়ে একশত পঁচানব্বই টাকা পাইয়াছে।

কাজল বলিল, তোমার বাবুকে বল না তোমার নামে টিকিট কিনতে।

রক্ষে কর। পেয়েছে ত একশ পঁচানব্বই টাকা কিন্তু খুইয়েছে হাজার হাজার।

কাজলের জানিতে ইচ্ছা হয় ঘোড়দৌড়ের কর্তারা পাঁচ টাকায় একশত পঁচানব্বই টাকা দেয় কেমন করিয়া? আবার হাজার হাজার নেয়ই বা কোন্ কৌশলে? লাভের কথা শুনিয়া মনে মনে লোভ হয়, কিন্তু কিছু প্রকাশ করে না।

দিনটা একরূপ কাটে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় হইতে কথা বলারও লোক পাওয়া যায় না। সবাই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, কেহ প্রসাধনরত, কেহবা আগন্তুকের প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া। ভাগ্যবতীদের ঘরে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাবু আসে, নাচ-গান শুরু হয়। চলে হৈ হুল্লোড়।

কাজলের সময় আর কাটে না। প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়। পুরুষ মানুষগুলার ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে সে ঘর হইতে বাহির হয় না।

কিন্তু তাতেও রক্ষা নাই। কারও বাবু তার দিকে একটু মুচকি হাসিয়া চায়, কেহ নমস্কার করিয়া বলে, এই যে, কেমন আছেন, ভাল ত?

কাজল এসব কথার জবাব দেয় না। কেহ তার দিকে চাহিলে মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবুও মেয়েরা রাগ করে, ঈর্ষায় যেন ফাটিয়া পড়ে।

জিনিসটা একদিন চরমে ওঠে। রসবতী খপ্‌ করিয়া তার হাত ধরিয়া বলে, কি রে, আমার বাবু তোর দিকে চেয়ে ফিক্ করে হাসল কেন?

কাজল বলিল, আমি বলব কি করে?

নেকী! ডুবে ডুবে জল খাও—বলিয়াই রসবতী তার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল।

খোঁড়া হর্তুকি বলিল, ঠিক হয়েছে, ও আমার বেস্পতিবারের বাবুকেও চোখ ঠার দিয়েছে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। বাবু বলে, কী চোখেই না তোমায় দেখেছি, হারু।

রসবতীর ব্যবহারে কাজল অবাক হইয়া যায়। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার পর্যন্ত দেয় না। ট্রেন ছাড়িয়া দিলে লাইনের উপর দিয়া যেমন গড়াইয়া চলে তার জীবনও তেমনি গড়াইয়া চলিয়াছে। কোথায় এর শেষ, পথে কোন ষ্টেশন মিলিবে কিনা কিছুই জানে না।

আর এক উৎপাত দালালরা—গলির রামচরণ, কালীচরণের দল। তারা বাবুদের নিকট হইতে লোভনীয় সব প্রস্তাব লইয়া আসে। কেহবা উপদেশ দেয়, ইচ্ছে করলেই যখন সুখে থাকতে পার তখন মিছি-মিছি কষ্ট পাওয়া কেন?

একদিন তিন নম্বর আসিয়া বলিল, একঠো বাবু বড় জ্বালাতন করছে, দিদিমণি।

কেন?

উ বড় আমীর আদমী। উনহার বাবা বাঙ্কমে বহুৎ রুপেয়া রাইখে গেলো। বড়িয়া বাড়ি, বাগিচা, মোটর, কাপুড়কা কল—

তা আমার কাছে এসেছ কেন এসব বলতে?

হামি উনকো বোলিয়েছে তুমি সতী লছমী আছ, সুবিস্তা কুছু হোবে না।

বেশ করেছ, আর এসব কথা নিয়ে এসো না। পাখী, কালীচরণ এদেরও নিষেধ করে দিও।

তিন নম্বর মুচকি হাসিয়া চলিয়া যায়, যাওয়ার সময় কাজলের অলক্ষ্যে একটা চোখ বুজিয়া ভেংচি কাটে।

সেইদিনই বৈকালে প্রমীলা ঘর ভাড়া চায়। কাজল বলে, আমার হাতে কিছু নেই।

ভাড়ার টাকা হাতে না থাকলে সোনাবাগানে কেন? বস্তিতে উঠে যাও।

কাজল ভয়ে ভয়ে বলিল, শুনেছি আপনার কাছে দুমাসের ভাড়া জমা রেখেছিল।

সেটা জমাই থাকে। ভাড়ার বাবদ কাটান যায় না। বাড়ি ছাড়ার সময় হিসেব হয়। ধর শার্সি খড়খড়ি ভাঙল, আস্তর খসল, খিল খুলে গেল এসবের খতেন হয়। জমার টাকা থেকে সে সব কাটান যায়। পাড়া শুদ্ধ সবাই জানে পিরমিল বাড়িউলির আইনই এই।

কাজল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমীলা বলে, যাও বাছা, দাঁড়িয়ে কেন? পরশু অবধি সময় দিলুম।

কাজলের শেষ সম্বল ছিল এক ছড়া মফচেন। পাঁচু কলিকাতায় আসিয়া এই চেন ও একটা আংটি গড়াইয়া দেয়। আংটি বেচিয়া আগেই খাইয়াছে। বাড়ি ভাড়ার জন্য সেই দিনই সুবালার ফলওয়ালা বাবুর কাছে চেন ছড়াও বেচিয়া দিল।

পরদিন ভাড়া পাইয়া প্রমীলা বলিল, এই রকম ঠিক ঠিক দিয়ে যেও। পিরমিলের কাছে পান থেকে চুন খসবার জো নেই কিন্তু, বিশেষ করে ঘরভাড়ার বেলায়।

কাজল চলিয়া আসিতেছিল। প্রমীলা আবার ডাকিল, শোন।

কাজল ফিরিয়া তার সামনে যাইয়া দাঁড়াইলে সে বলিল, এ আবার করেছ কি? ছেলে হওয়া আটকাতে পারলে না? এ রাস্তায় যারা আসে পেটের সন্তান হ'ল তাদের শত্তুর।

এ পথে ত আমি আসিনি—কথাটা বলিতেই কাজলের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসে। প্রমীলা মুচকী হাসিয়া ছোট একটি শব্দ করে, ফুঃ…

কয়েকদিন যাবৎ কাজলও এই আশঙ্কাই করিতেছিল! আজ প্রমীলার কথায় সে রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। সন্তান সম্ভাবনা, এ কী বিপদ!

কাজলের মফচেন বিক্রির টাকা ফুরাইয়া গেলে শুরু হয় উপবাস। কিন্তু কাহাকেও সে কিছু জানায় না। এদিকে পেটের সন্তানের চাহিদা দিনের পর দিন শরীর শুষিতে থাকে।

একদিন দুপুরে সুবালা আসিয়া দেখে কাজল মেঝেয় শুইয়া কোঁকাইতেছে, পাখীর ছানার মতন চিঁ চিঁ শব্দ। বেদনা সকাল হইতেই ছিল, তার উপর পেটে কিছু পড়ে নাই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়ে।

সুবালা বলে, আশ্চর্য মেয়ে বটে, একবার ডাকতেও নেই।

কাজল বলিল, তোমাদের কত আর জ্বালাব ভাই ?

সুবালা অভিমানের সুরে বলে, পর মনে করিস কিনা তাই ওকথা বলতে পারলি। নিজের কথা না-ই ভাবলি, কিন্তু পেটের বাচ্চাটার কথাও ত ভাবতে হয়।

কাজল বলে, কেন যে ও এল ? খেতে না পেয়ে কখন পেটেই মরে থাকবে।

সুবালা বলে, ছিঃ ও কথা মুখে আনতে নেই।

কয়েকদিন আগে সে ও প্রিয় তাকে ঔষধ খাইতে পরামর্শ দেয়। বলে, সবাই খায়। এ রাস্তার নিয়মই এই। বাড়িউলি ওষুধ জানে।

কাজল তখন খায় নাই। বহু পাপ করিয়াছে, ভ্রূণ হত্যার পাপ করিতে আর রাজী নয়।

সুবালা কাজলকে খানিকটা দুধ খাওয়াইলে বেদনার কিছুটা উপশম হয়। বৈকালে হারু ডাক্তার আসে। সব অবস্থা শুনিয়া ঔষধের পুরিয়া বাঁধিয়া, পুরিয়াটা নিজের কপালে ছোঁয়াইয়া সে বলিল, জয় গুরুদেব। তুমি ভক্তি করে খাও, কাজল।

কাজল পুরিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া ভিতরের গ্লোবিউলগুলি খাইয়া ফেলে।

হারাধন বলে, এবার নিজের হাতে আমায় একটি পান দাও দেখি, আর এক গ্লাস জল।

প্রিয় হাসিয়া বলিল, শখ খুব। সোঁদর হাতের জল খাওয়ার জন্য গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

হারাধন বলে, প্রায়শ্চিত্ত না হলে রোগ সারবে কেন ? পানটা হ'ল প্রায়শ্চিত্ত। যাক, তুমি আছ কেমন ?

বলি হোমিওপ্যাথি করতে, তা শুনবে না। এক ফোঁটা মার্কবিন্ আয়ড্ দিলেই কমত। দু' ফোঁটার বেশী দরকার হত না।

যে খরচা দেবে তার যে বিশ্বাস নেই। সে বলে, হোমিওপ্যাথি খাওয়া আর টাঙ্কির জল খাওয়া এক কথা।

হারাধন উত্তেজিত ভাবে বলিল, থিয়েটারে আবদালা সাজেন, তাই নিয়েই থাকুন না কেন? হোমিওপ্যাথির কি জানেন? যাক্, তাকে ব'ল যে নীলরতন সরকারের মতন ডাক্তারও স্বীকার করতেন যে, হোমিওপ্যাথি একটা মস্ত বড় সায়েন্স।

ডালিম বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, নীলরতন ভাল ডাক্তার, আমি জানি। গাইয়ে বিন্দুর মার অসুখে এসেছিল।

হারাধন বলিল, বিন্দুর বাড়িতে আমিও অনেক ট্রিটমেন্ট করেছি।

যাওয়ার সময় সে প্রিয়কে বলিয়া গেল, ওষুধের চেয়ে কাজলের বেশী দরকার পথ্যের।

তার ঔষধে এবং সুবালার যত্নে কাজল সরিয়া উঠিল। সুবালা ও প্রিয় পথ্যের খরচা চালাইল।

সুবালার অবস্থা ভাল নয়, তবে সম্প্রতি এক ফলওয়ালা বাবু জোটায় দিন কোন রকমে চলিয়া যায়।

প্রিয়র মাস খানেক যাবৎ অসুখ। তার বাবুর চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই। সে টোটকা ঔষধ আনিয়া দেয়। জল পড়া, ঠাকুর-পূজার ফুল, সন্ন্যাসীর চরণামৃত যোগাড় করিয়া আনে। তার জন্য খরচার কার্পণ্য করে না।

প্রিয় ভুগিয়া ভুগিয়া অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। চোখের নিচে কালো দাগ। সর্বাঙ্গে ব্যাধির ছাপ। তবে রোগের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নাই।

কিন্তু বাড়ির মেয়েরা তাকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। বলে, ও গামছা গোঁসাই তোমার আবার এ বেয়াধি কেন?

শেষ পর্যন্ত হারাধনের ঔষধ খাইয়াই প্রিয় সারিয়া উঠিল, সে ডাক্তারকে একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিল! ডাক্তার কাজলকে বলিল, রাঁধতে হবে কিন্তু তোমায়।

প্রিয় বলিল, ওই রাঁধবে। বামুনকে ত আর অন্য জাতের ছোঁয়া খাওয়াতে পারি না।

হারাধন বলিল, আমরা খাই কিন্তু।

পুরুষ মানুষের কথা ছেড়ে দাও। তোমরা হ'লে শালগ্রামের নুড়ি, গোবর জল ছিটিয়ে দিলেই শুদ্ধু।

রান্না ভাল হইয়াছিল। হারাধন, প্রিয়র বাবু, সুখ্যাতি করিল সবাই। প্রিয় বলিল, বাস্তুদেবতাকে দিলে হত। তার এখনও খাওয়া হয় নি।

প্রিয় প্রমীলাকে বলে বাস্তুদেবতা। কোন ঘরে খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হইলে এই দেবতাটি অনেক বেলা পর্যন্ত না খাইয়া থাকে। সবাই তাহা জানে। তার ঘরে ভাল খাবারগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। প্রমীলা বলে, এটা হল বাড়িউলির পেন্নামি।

সেও সুখ্যাতি করিল। কাজলকে বলিল, তুমি বামুনের মেয়ে, কারও বাড়িতে রাঁধুনীগিরি যোগাড় করে নাও, তা'হলে আর ভাড়া পড়ে থাকবে না।

কাজল বলিল, যোগাড় করে দিন না দিদি!

প্রমীলা মুখ ঝামটা দিয়া উঠিল, আমি কি চাকরির দালাল নাকি, না আপিসের সাহেব যে চাকরি করে দেব!

সে জানে যে এই ঠিকানা টের পাইলে কাজলের রান্না খাওয়া দূরের কথা, তার হাতের জলও কেহ ছুঁইবে না, তবুও বাড়িভাড়ার শোকে কথাটা একবার তুলিল। একমাসের ভাড়া তার বাকী পড়িয়াছিল।

প্রিয় হারাধনকে বলিল, কাজলের রোগ ত সারালে, এবার ওর বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেও।

ডাক্তার কাজলের বিষয় প্রায় সবই জানিত। সে বলিল, কি করব বল দেখি?

সে তুমিই ভাল জান।

দেখছি ত নার্সের কাজ আর দরজীগিরি—ডাক্তার তারপরই কাজলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি লিখতে পড়তে জান?

বাংলা জানি, চিঠি-লেখা, বই-পড়া।

ইংরেজী?

না।

অন্ততঃ ইংরেজীতে পড়তে পারলে সুবিধে হত।

প্রিয় বলিয়া উঠিল, ছুঁচের কাজও বেশ ভাল জানে। কেমন সোঁদর কাঁথা সেলাই করেছে।

কাজল প্রিয়কে আস্তে আস্তে বলিল, ওকে বল সেলাইর কল চালাতেও শিখেছি।

প্রিয় হাসিয়া উঠিল, তা জোরে বলতে পারিস্ না! লজ্জাবতী লতা আমার। কল চালাতে আবার শিখলি কবে?

বেদানার কলে ওই শিখিয়েছে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হারাধন আসিয়া খবর দিল, কাজলের একটা সুবিধে বোধ হয় হল।

প্রিয় কাজলকে ডাকিয়া আনিলে সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায়, কি কাজ, কবে থেকে করতে হবে?

একটি ভদ্দর লোক অনাথা মেয়েদের জন্য হোম খুলেছেন। তাঁকে তোমার কথা বলায় তিনি বলেছেন, বেশ নিয়ে আসবেন। সেখানে থাকতে পাবে, কাজ শিখবে। কালই তোমায় নিয়ে যাব, ভাবছি।

কাজল কহিল, আমি আর জন্মে আপনার মেয়ে ছিলুম।

ডাক্তার বলিল, বেশ, এক গ্লাস জল খাওয়াও আর একটা পান।

পরের দিন কাজল হারাধনের সঙ্গে ভদ্রলোকের বাড়ি গেল। লোকটি বৃদ্ধ, মাথার সব চুল সাদা, মাঝখানে তেড়ী।

প্রথম দর্শনেই কাজলের তাকে ভাল লাগিল না। পোকা গিলিবার আগে টিকটিকি যে ভাবে চায়, বৃদ্ধের চাহনি ঠিক সেইরূপ, দেখিলে ভয় করে।

ডাক্তার বলিল, ওঁকে পেন্নাম কর, উনি বামুন, একজন রায় সাহেব তা ছাড়া পুরাণরত্ন।

রায় সাহেব বলিলেন, ভুল করেছেন ডাক্তারবাবু, আমি পুরাণসিন্ধু।

কাজল প্রণাম করিলে পুরাণসিন্ধু তার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করেন, তারপর গালের উপর দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া আনেন। তিনি বয়সের এই সুযোগ গ্রহণ করায় কাজলের রাগ হয়। উহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলেন, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ভারী শান্ত, তোমায় হোমে রাখতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু এখন খালি নেই। তোমার ঠিকানা রেখে যাও, পরে জানাব।

হারাধন বলিল, আমাকে জানালেই হবে।

কথাটা বৃদ্ধের পছন্দ হইল না। হারাধন আবার বলিল, দেখবেন যাতে তাড়াতাড়ি হয়। পাদপূরণ করিল কাজল, আমার বড় ঠেকা—বলিয়াই নিজের জিভ কাটিল।

সবই আমি বুঝতে পারছি। তুমি আজ এই নিয়ে যাও, বলিয়া পুরাণসিন্ধু দশটাকার একখানা নোট তার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

কাজলের বাধ বাধ ঠেকে, সে হারাধনের দিকে চায় আবার চায় জানালার বাহিরে পাশের ছাদের আলিশার দিকে। সেখানে টবে একটা ফার্ণ গাছের পাতা মৃদু মৃদু দুলিতেছিল।

হারাধন বলে, টাকাটা নাও কাজল। উনি স্নেহ করে দিচ্ছেন।

নোটখানা নেওয়ার সময় কাজলের সর্বশরীর ঘামিয়া যায়।

দিন পনর কাটিয়া গেল। প্রমীলা কাজলের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সে ভাড়ার তাদাগা করে না যেন বিছার হুল ফুটায়। একদিন অপমান করিল ভাতুয়াকে দিয়া।

ভাতুয়া এ বাড়ির জমাদার। প্রত্যেক ভাড়াটের কাছে মাসে বার আনা করিয়া মাহিনা পায়। মাস কাবারের পর বাইশ দিন হইয়া যায়। কাজল পয়সা দিতে পারে না। ভাতুয়া বাড়িওয়ালীকে যাইয়া বলিলে সে কহিল, ওর কাছে গিয়ে খুব কড়া কড়া শোনা। আমিও পিছু পিছু আসছি।

ভাতুয়াকে দেখিয়াই কাজল বলে, পরশু নিও ভাতু।

পরশু মিলবে কাঁহাসে? তুমি বড় ঝুটা আছ।

কাজল বলে, না বাবা, আমি ঝুটা নই, পরশু ঠিক পাবে।

ভাতুয়া আর কড়া শুনাইতে পারিল না। কাজল আর পাঁচ জনের মত দেহ বিক্রয় করে না বলিয়া হয়ত তার প্রতি একটু সহানুভূতিও ছিল। সে শুধু কহিল, হামার খাবার নেই দিদিমণি। পিছন হইতে প্রমীলা বলিয়া উঠিল, তোর খাবার নেই তাতে ওর কি? ও মহাসুখে আছে, আপিল, নেশপাতি, কমলা লেবু খাচ্ছে। পারে না শুধু ভাড়া দিতে আর জমাদারের মাইনে দিতে।

সুবালার ফলওয়ালা বাবু প্রায়ই ফল আনে। সুবালাকে ফল খাওয়াইবার দিকে তার ভারী ঝোঁক। বলে, এতে ভাইটামিন আছে। স্বাস্থ্যের বইয়ে পড়েছি।

সুবালা কাজলকে ফল দেয়, প্রমীলার উহা সহ্য হয় না। আরও কয়েকদিন সে ফল খাওয়ার খোঁটা দিয়াছে।

ভাতুয়া বলিল, কালকে হামি কাম করতে পারব না।

প্রমীলা বলে, তোমার আর দোষ কি বাছা? ওর ত চোখে পর্দা নেই।

ভাতুয়া কাজ করিবে না শুনিয়া হর্তুকি বলিল, মেথরের মুখঝামটা সইবে, তবু সতীপনা।

রসবতী বলিল, সতীপনা না ছাই। শিকারের আশায় আছে, রুই কাতলার।

এই বাড়ির কেহই কাজলকে দেখিতে পারে না। বেদনাও নয়—যদিও সেই তাকে মেশিন চালাইতে শিখাইয়াছে। তারা যে পথের পথিক কাজল সেই পথ এড়াইয়া চলে। তাই সবাই বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় এই মেয়েটির কাছে নিজেকে ছোট মনে করে। মেয়েটা যেন তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বলিয়াই বড়। শুধু তাদের চেয়ে নয় অমন যে বিখ্যাত গাইয়ে ১৪নং বাড়ির বিন্দু, বড় তার চেয়েও। ইহাই তাদের পক্ষে অসহ্য।

শুধু প্রিয়, সুবালা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তারাও বাড়ীওয়ালীর ভয়ে সব সময় সহানুভূতি দেখাইতে সাহস পায় না। হয়ত প্রমীলা কখনও বলিয়া বসিবে, তিন দিনের লুটিস দিলুম, ঘর ছেড়ে দাও। তার মুখের "লুটিস" আদালতের পরোয়ানার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

বৈকালে সুবালা আসিয়া গোপনে কাজলের হাতে একটি টাকা দিয়া গেল। বলিল, জমাদারকে এই থেকে বার আনা দিস। পরে শোধ করবি।

কাজল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শোধ আর করেছি! একটু পরে আবার বলিল, টাকাটা ভাঙিয়ে আমায় দুই আনার মুড়ি মুড়কি আনিয়ে দিবি?

সুবালা বলিল, ভাঙাতে আর হবে না। আমি আনিয়ে দিচ্ছি। তুই সারাদিন না খেয়ে আছিস বুঝি?

কাজলের চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। শুধু আজ নয়, কালও সারাদিন সে অভুক্ত ছিল।

সমস্ত দুঃখ দুর্দশা অপমানের মধ্যেও কাজলের মাঝে মাঝে বাবাকে মনে পড়ে। ভাবে, সব অবস্থা জানাইয়া লিখিলে হয়ত তিনি আবার কোলে আশ্রয় দিবেন।

অনেক ভাবিয়া শেষে একদিন সে রামলোচনের কাছে পত্র লিখিল, বাবা আমি পাপী, আমি খারাপ। ভুল করেছি, তুমি ও মা আমায় ক্ষমা কর। আমি যে কি কষ্টে আছি তা তোমায় বোঝাতে পারব না। কষ্ট লাঞ্ছনা আর অপমান আমায় ঘিরে ধরেছে, চারিদিকে যেন আগুন।

তোমাদের গোয়ালের পাশের কুঁড়েয় আমায় স্থান দিও। আমায় তোমরা

ছুঁয়োনা, তাহলে গাঁয়ের জমিদার তোমাদের একঘরে করবে না। তোমার ও মায়ের কাছে এইটুকু আমি চাই। ভাসিয়ে দিওনা আমায়।

পথভ্রষ্ট তরুণী মেয়ে চোখের জল ফেলিয়া বড় আশা করিয়াই চিঠি দিল। পিতা সে চিঠির উত্তর দিলেন না। মা দুই ছত্রে লিখিয়া জানাইলেন, আর কখনও যেন তোর চিঠি না পাই। এবার চিঠির ওপর পাঁচ ঘা জুতো মেরেছি। আবার এলে মারব পঁচিশ ঘা।

কাজলের মন বিষাইয়া ওঠে, এই তার বাপ মা! কুকুর বিড়ালের মতন তাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, ঠেলিয়া দিলেন অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে। মেয়ের কাছে তাঁরা সংযম চান। কিন্তু চান কোন অধিকারে? কোন দিনই তাঁরা তাকে সংযম শেখান নাই। এই পরিণত বয়সেও মেয়ের সামনে সংযমের কোন আদর্শ তুলিয়া ধরেন নাই।

আজ তার বাপের উপরই বেশী রাগ হয়। তিনি দুর্বল সে জানে কিন্তু চিঠিখানার উত্তর দেওয়ারও কি তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না? ভয়ে নিজের সত্তাকে তিনি হারাইয়া ফেলিলেন!

কিন্তু কাহাকে এই ভয়? সমাজের কর্ণধার লম্পট জমিদার ষোড়শীচরণকে?

ভাবিয়া সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

পর মুহূর্তেই ভয় হয়, এ্যা শেষটায় পাগল হয়ে যাব না কি?

শহরতলীর বাগানবাড়ী। ফটকের উপর মস্ত বড় সাইনবোর্ড টাঙানো, "হৈমবতী অবলা আশ্রম।" স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পুরাণসিন্ধু এই অবলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আপিস ঘরে গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো বড় একখানা তৈল-চিত্র, নিচে লেখা, সতী হৈমবতী দেবী চট্টোপাধ্যায়।

পুরাণসিন্ধু রকিং চেয়ারে বসিয়া দোল খান, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে খাতা ও কাগজ পত্র। মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে।

তিনি খাতা খুলিয়া হিসাব দেখেন। খরচ বড় বেশী মনে হয়। আশ্রমে বিধবা অনেক, কিন্তু রোজই মাছ আসে। মাছ না আসিলে ডালের উপর নিরামিষ তরকারি দেওয়া হয়।

পুরাণসিন্ধু ম্যানেজারকে ডাকিলেন। এই ব্যক্তিটি একাধারে আশ্রমের বাজার সরকার, ম্যানেজার, কেরানী সবই। পুরাণসিন্ধু বলেন, রোজ মাছ আসে কেন? আশ্রমে বিধবাই ত বেশী।

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে উত্তর করে, সধবা এবং কুমারীও ত কয়েকটি আছে।

সব বিধবার দলে ফেলে দাও। বলবে পেট্রন বেশীর ভাগই জৈন। মাছ দেওয়াটা তারা পছন্দ করে না। ডালের মধ্যে সস্তা কোন্‌টা?

খেসারি।

খেসারির ডালই বেশী দিও। খেসারি খেতেও ভাল।

ডালের সঙ্গে একটা তরকারি কি দেব?

আবার তরকারি! বাজারে আলু পটল কুমড়োর খোসা বিক্রী হলে তাই দিয়ে একটা ঘ্যাট দিতে পার। বেশী লঙ্কা পড়লে খেতেও সুন্দর হবে।

তরকারির খোসা ত কিনতে পাওয়া যায় না।

আমি দেখি, যোগাড় করতে পারি কি না। খরচ কমাতে না পারলে আশ্রম চালানো অসম্ভব। পাগড়িওয়ালা চাঁদা বন্ধ করেছে আজ এক বছর। বেড়ালকোটের রাজাকে পেট্রন করা হল, সে বেটা চিঠি লিখলেও জবাব দেয়না। অথচ তার সম্বর্ধনায় খরচা করলাম দু শ' টাকার উপর।

ম্যানেজার বলিল, কর্পোরেশনের গ্র্যাণ্টও পড়ে আছে। কাউন্সিলর নবনীবাবুর কাছে গিয়েছিলুম। তিনি বললেন, আশ্রমের দুর্নাম। দেশের কোন উপকারই এতে হচ্ছে না।

বেটা ছুঁচো মনে করেছে টাকা বন্ধ করে—কথাটা পুরাণসিন্ধু চাপিয়া গেলেন।

নবনী বা নবনীত মৈত্র আশ্রমের কমিটির সদস্য। কনক নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ করার বড় আগ্রহ। পুরাণসিন্ধু তাকে সে সুযোগ দেয় নাই। সেই হইতে কর্পোরেশনের টাকা বন্ধ আছে। গেল বছর কমিটিতে পাশ হইয়াও আদায় হয় নাই। এ বৎসর পাশ হইবে কি না সন্দেহ।

ম্যানেজার বলিল, আতর্থী মশাইকে ধরবেন বলেছিলেন।

পুরাণসিন্ধু বলেন, সব বেটাই সমান। সে এই ফাঁকে আমার রহড়ার কিছু জমি সস্তায় বাগিয়ে নিতে চায়।

এরপর তিনি দেশ হিতৈষণা সম্বন্ধে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেন। বন্ধু-

বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে এইরূপ করা তাঁর অভ্যাস। দেশের ভাল, গরীবের মঙ্গল এ সব কেহ চায় না, চায় নিজের সুবিধা। সেই জন্যই জাতির এত বিড়ম্বনা। ক্যারেক্‌টার নাই, যাকে বলে মরাল ফোর্স।

বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ভাল কথা মনে পড়েছে। কনকের জন্য রোজই একটু মাছের ব্যবস্থা ক'র। মাছ না পেলে ডিম। ওর ক্যালসিয়ম ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে।

বৃদ্ধের অলক্ষ্যে ম্যানেজার একটু ঠোঁট বাঁকায়। পুরাণসিন্ধু বলেন, তুমি এখন যাও। একটি মহিলা এসেছেন, পার্সনাল ব্যাপার। এস, কনক এস।

ম্যানেজার বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কনক নই, কাজল।

ওঃ, হ্যাঁ কাজল। তা কনক নামটিও বেশ। বস।

কাজলের এই বৃদ্ধের কাছে আসার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আসিল শেষ চেষ্টার জন্য। আজ সকালে প্রমীলা বলিয়াছে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করলে তুমি ঘর ছাড়বে না দেখছি।

কাজল তাঁর বিপরীত দিকে একটি চেয়ারে বসিলে পুরাণসিন্ধু বলিলেন, তোমাকে দেখে বড় খুশী হলুম, তা বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে যে?

বাড়ি গিছলুম। না পেয়ে এখানে এসেছি। আমার একটা ব্যবস্থা করুন। আর চলছে না।

বেশ, আমার কাছ থেকে নিয়ে চালাও।

আপনি ত দিচ্ছেনই।

নো নো—সে কিছু নয়। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, তুমি আমার কাছে থাক!

আপনার বাড়িতে রাখবেন?

সিলি গুজ, আমার পুত্রবধূরা তাহলে ভাববে কি?

ভাববে আমি আপনার পালিতা মেয়ে।

আমি কণ্বমুনি আর তুমি শকুন্তলা। হেঃ হেঃ, সে যুগ এখন নেই।

বৃদ্ধের এই হাসিতে কাজল শিহরিয়া ওঠে। তিনি বলেন, কাজের কথায় এস। তুমি গরিবের মেয়ে, বেশ্যাবৃত্তি করতে এসেছ। আমি তোমায় বাঁধা রাখতে চাই।

ছিঃ ছিঃ, এ কী বলছেন আপনি?—বলিয়া কাজল চেয়ার ছাড়িয়া

উঠিতেই পুরাণসিন্ধু বলিলেন, জান আমি একজন রায়সাহেব, পুলিসের স্থপার ছিলাম ?

কাজল বলিল, না জানি না। স্থপার কি ?

স্যুইট গ্যুজ—বলিয়া রায় সাহেব কাজলের হাত ধরেন।

কাজল বলে, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন।

আমি তোমায় গয়না গাঁটি দেব, সুখে রাখব, উইলে প্রভিশন করব।

আমি কিছু চাইনা আপনার কাছে, আপনি আমায় যেতে পথ দিন।

অবলা আশ্রমের কর্তা এবার হট্টহাস্য করিয়া বলেন, এ রকম অভিনয় আমি ঢের দেখেছি, এ হচ্ছে আমার ছেলের ডিপার্টমেণ্ট। সে বায়স্কোপের ডিরেক্টর।

বায়স্কোপ। তাঁকে বলে আমায় সেখানে ভর্তি করে দিন।

ইয়ং-ম্যানের নাম শুনে অমনি সুর পালটালে ?—বলিয়া পুরাণসিন্ধু কাজলকে কাছে টানিবার চেষ্টা করেন।

তাঁর হাত ছাড়াইয়া লইয়া কাজল সেদিন আট নম্বরে ফিরিল বটে, কিন্তু ফিরিল সারা শরীরে লাঞ্ছনার চিহ্ন লইয়া।

দেশে বাতাবি লেবু লইয়া ছেলেদের সে ফুটবল খেলিতে দেখিয়াছে। আজ মনে হয় তার অবস্থাও মানুষের পায়ে পায়ে গড়ানো সেই লেবুর মতন। দুনিয়ার কাদামাটি মাখিয়া লাথি খাইতে খাইতে কোথায় সে চলিয়াছে।

সেই দিনই সে তিন নম্বরকে ডাকিয়া বলিল, তোমার সেই বাবুর খবর জান ? যার বাপ—

তিন নম্বর সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, যিস্‌কো বাপ বাঙ্কমে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে তুমি খবরও দাও।

জরুর। তব্ একঠো বাত শুনো। কুছু দম লাগাও।

কাজল তার অনেক কথাই বোঝে না। অনুমানে ধরিয়া লয়। কিন্তু 'দম' লাগাও ব্যাপারটা যে কি তাহা অনুমানেও বুঝিতে পারে না।

তিন নম্বর বলে, নয়া আদমি, তুমি এ সব সমঝ করবে না। হামি ঠিক করিয়ে দেব। দো চার রোজ পট্টি দেও।

শেষ পর্যন্ত শুনিবার জন্য কাজল আর অপেক্ষা করে না। তার সর্বশরীর যেন জ্বলিয়া যায়। রাগ হয় নিজের উপর, মা বাপের উপর, পাঁচুর উপর। পৃথিবীটা যেন পাঁচু ও পুরাণসিন্ধুতে ভরা।

সে চায়ের একটা কাপ লইয়া দেয়ালে ছুঁড়িয়া মারে, দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া নিজের কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়।

এই সময় হারাধন ডাক্তার ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া কাপড়খানা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। বলে, তুমি কি পাগল হয়েছ?

কাজল বলিল, হ্যাঁ, আপনারাই করেছেন। আপনি আর আপনার ঐ বুড়ো শালিক যত সব পুরুষ মানুষরা। আমায় কেন নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ ঐ—কাজল কথা শেষ করতে পারে না। রাগে তার ঠোঁট কাঁপে।

হারাধন কিছুই জানিত না। সে বলিল, এ্যাঁ, লোকটা এত বদমায়েস!

প্রিয় বলিল, ওর নামে কাগজে ছাপিয়ে দিন, বেটা জব্দ হবে।

হারাধন বলিল, কাগজে ওসব ছাপাবে না। কাগজওয়ালারা রায় সাহেবের হাতধরা।

দিন কয়েক পরের কথা। বেলা দুপুর। ভাতুয়া উঠান ধোয়ায়। রসবতী ঘরের সামনে বসিয়া টিয়াকে ছোলা খাওয়ায় আর বুলি শেখায়, বল রাধা কেষ্ট, বল রা…ধা…।

তার পোষা বিড়ালটা কিছুদিন হইল পলাইয়া গিয়াছে। সে দুঃখ করে, কত দুধ মাছ খাওয়ালুম খেয়ে মোটা হ'ল। আর যেই একটা মেনি পাওয়া অমনি দে ছুট। সাধে কি বলেছে পশু? মানুষ পশু, চারপেয়ে পশু, সব সমান। পশু আর পুষছি নে, বাবা।

বিড়ালের আগে ছিল একটি মানুষ। লোকটি প্রথমে 'বাবু' হইয়াই আসে, রসবতীর কেমন তার উপর ঝোঁক পড়িয়া যায়। তাকে ছাড়া চলে না, সে একদিন না আসিলে লোক পাঠায়।

এই লোকটি শেষটায় আর টাকা দিত না। ক্রমে ক্রমে রসবতীই তার খরচা চালাইতে আরম্ভ করিল। দুর্মূল্যের বাজারেও তাকে আদ্দির পাঞ্জাবি, শান্তিপুরে ধুতি কিনিয়া দিত। পাঁচজনের কাছে বলিত, ও আমার পিরিতের লোক।

আবার রাগিলে টাকার খোঁটা দিত, গালি দিত। লোকটা অদ্ভুত, কোন কথা বলিত না। দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিত।

প্রমীলা বলে, রসির মুখ আগে অত খারাপ ছিল না। লোকটাকে বকে বকে ঐ রকম দাঁড়িয়ে গেছে।

এই মানুষটা একদিন চলিয়া যায়। রসবতী তারপর বিড়াল কুড়াইয়া আনে। বিড়ালের পর আসে টিয়া। টিয়াকে সে দুধের সর দেয়, দেয় ছোলা ছাতু, লাল লাল লঙ্কা। বলে, বল রাধাকেষ্ট রা—ধা।

সেদিন পাশে ছিল হর্তুকি। সে কহিল, ওকে একটু পেঁয়াজ কুটে দি?

রসবতী বলে, তোমার যেমন বুদ্ধি। পেঁয়াজের মুখে ঠাকুরের নাম নেবে কি করে?

এই সময় মাথায় মালপত্র লইয়া দুইটি কুলি বাড়িতে ঢুকিল, পিছনের কয়েকজন রহিল বাহিরে দাঁড়াইয়া। সকলের আগেরটির মাথায় বড় একখানা আয়না। এক হাতে সে আয়না ধরিয়াছে, অপর হাতে একখানা কাগজ।

তাদের কলরব শুনিয়া প্রমীলা বাহিরে আসিয়া নাকে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে প্রশ্ন করে, এসব মাল কার?

সামনের কুলিটি বলিল, কজ্জন বাইজিকা।

প্রমীলা বলে, সে আবার কে? কোন্ গলি, কত নম্বর বলেছে?

ইসমে লিখা হ্যায়—বলিয়া কুলি হাতের চিরকুট খানি আগাইয়া ধরিলে প্রমীলা বলিল, দেখ ত পড়ে রস। আমার চশমাটা বাক্সে রয়েছে।

রসবতী কাগজখানি দেখিয়া কহিল, হ্যাঁ, এই ঠিকানাই লিখেছে।

প্রমীলা বলিল, ঠিকানা ভুল হয়েছে বোধ হয়, একবার আমারও এই রকম হয়েছিল। বাবু একটা কুকুর পাঠালে, বিলিতি হাইগু। কুকুর না যেন দস্যি। ভুল ঠিকানা নিয়ে লোকজন সারা শহর ঘুরল। এ বাড়িতে যখন পৌছল তখন দেখি কুকুরটা ধুকছে, তোয়াজের শরীর ত, বিলিতি হাইগু।

কুলিটি বলিল, ই কোঠিই হ্যায়।

প্রমীলা বলিল, মিছিমিছি ঝামেলা কর না। বাড়িউলির নাম বলেছে পিরমিল বাড়িউলি?

কুলি বলিল, এ আট নম্বর নেই হ্যায়?

তা ত হ্যায় বাবা। কিন্তু কজ্জন নামে ত কেউ নেই। আছে কাজল, ঐ দাঁড়িয়ে আছে। তা ওর এসব আসবে কোত্থেকে?

এই সময় তিন নম্বর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, এসব তুমার মাল আছে কাজলদি। হামি বাজার গেইছিলো, উসিসে গোলমাল হৈয়ে গেলো।

প্রমীলা হাঁ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। পর্বত গুহায় সঞ্চিত মণিমুক্তা দেখিয়া আলিবাবাও এতখানি হাঁ করিয়া ছিল কিনা সন্দেহ।

কাজল তিন নম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার এসব এল কোত্থেকে ?

কুলির মাথা হইতে মাল নামাইতে নামাইতে তিন নম্বর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলিল, যিস্‌কো বাপ বাক্সমে—

প্রমীলা বলিয়া উঠিল, ওঃ তাই বল। ব্যাঙ জুটেছে। ভাল ভাল, ভাড়াটা আর পড়ে থাকবে না।

তিন নম্বর বলে, ই সব বাত মত করো।

অন্য কেহ বলিলে আর রক্ষা ছিল না। প্রমীলা পাঁচটা কড়া কথা শুনাইত। কিন্তু তিন নম্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্যরকম। বাধ্যবাধকতা ঢের। তাই আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিন নম্বর কুলিদের মাথা হইতে মাল নামায় আর উচ্চকণ্ঠে গোনে, কুর্সি দোঠো, পাখলকা টিবিল, চারঠো কাপ পিয়ালা।

একজনের মাথায় ছিল বারকোশ ভরতি খাবার। ঢাকনি সরাইয়া তিন নম্বর বলিল, বহুত উমদা চিজ। সানদিশ রসগুল্লা দহি মালাই।

হর্তুকি বিস্মিতভাবে সব দেখে। রসবতী বলে, বলেছি না যে রুই কাতলার জন্য টোপ ফেলেছে।

কাজল সুবালার নিকট হইতে দুইটি টাকা চাহিয়া কুলিদের বকশিস দেয়।

ঝাড়ুদার ভাতুয়া এতক্ষণ ঠায় দাঁড়াইয়াছিল। কুলিরা বিদায় হইলে কাজলকে লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল, আভি যাচ্ছি, দিদিমণি।

সুবালা রসগোল্লার হাঁড়ি হইতে তার হাতে একমুঠা রসগোল্লা দিয়া বলিল, আশীর্বাদ কর, ও রাজরাণী হোক।

ভাতুয়া বলিল, রাণী ত জরুর হায়। লেকিন হামারা বকশিশ ?

সুবালা বলেন, পরে পাবি। এখন যা।

খাওয়ার পর তিন নম্বর আসিয়া ঘর সাজাইতে আরম্ভ করে, সিলিংয়ের ঝুল ঝাড়ে, মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে। দেয়ালে আয়না টাঙায়। আয়নার নিচে চেয়ার টেবিল সাজাইয়া রাখে, খাটের বিভিন্ন অংশ জুড়িয়া দেয়।

কাজল নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। হাঁড়িতে চাল নাই, ভাঁড়ে তেল নুন সবই বাড়ন্ত অথচ ঘর এমন সব আসবাবে ভরিয়া গেল যে রকম জিনিস সে কখনও চোখে দেখে নাই। কার এ খেয়াল ?

ছেলেরা যেমন খুশি মতন মাটির পুতুল তৈরি করে আবার হাতের এক পোঁচে নাক মুখ সব মুছিয়া দেয়, খেয়ালী বিধাতাও তাকে লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলাই খেলিতেছেন।

সাজানো সম্পর্ক সে একবার শুধু একটি মন্তব্য করিয়াছিল। তিন নম্বর অমনি বলিয়া উঠিল, দিদিমনি, তুমি বড় আক্কেলবাজ আছ।

বৈকালে সুবালা কহিল, ভাল করে চুল বাঁধ্, একটু সাজগোজ কর, ঘরে বড় মানুষ আসবে।

বড় মানুষ সম্পর্কে কাজলের যেমন ছিল ভয় তেমনই বিরক্তি। তার ঘর ছাড়ার মূল কারণ জমিদার ষোড়শীচরণ। সে বলিল, বয়ে গেছে আমার।

এই যে চোখ রাঙিয়ে বললি, পারবি ত এই রকম চোখ রাঙাতে?—কাজলের দিকে একটুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবালা মন্তব্য করে, হ্যাঁ, তুই পারবি।

শ্যামবর্ণ নতুন দূর্বার মতন চকচকে মাজা রং, কাজলের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ তার গড়ন আর চোখ। সর্বশরীর দিয়া লাবণ্য যেন উপচাইয়া পড়ে। কালো দু খণ্ড মণির মতন ঘন কৃষ্ণ চোখের তারা, উদাস চাহনি, অভিমান করিলে ভারী সুন্দর দেখায়।

প্রথম প্রণয়ের সময় একটু সে মান অভিমান করিলেই পাঁচু সুর ধরিত, আমার রাই রেগেছে রে।

তিন নম্বরের আনীত বাবুটির নাম রথীন। এই পথ দিয়া যাওয়ার সময় সে একদিন কাজলকে দেখে, দেখিয়াই মুগ্ধ হয়। বন্ধু সুরথ সঙ্গে ছিল, তাকে বলিল দেখেছ? হিয়ার ইজ এ বিউটি—

সুরথ ও রথীন সেই হইতে প্রায়ই কাজলের সম্পর্কে আলোচনা করে। সুরথ কবি, সে এই অপরিচিতার উদ্দেশে কবিতা লেখে, গান লেখে। সেই গান গায়। সুরথের এই গান ও কবিতা রথীনের মনকে প্রভাবিত করে। সে বন্ধুকে বলে, যেমন করে হোক, ওকে পেতেই হবে।

সুরথ বলে, অমন এক্সেলেণ্ট চেহারা ওঃ! ওকে পেলে তোমায় ভাগ্যবান মনে করব।

দুই বন্ধুতে নিজেদের মধ্যে তার নাম দেয়, হার এক্সেলেন্সী।

রথীনকে গলিতে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়া তিন নম্বর একদিন জিজ্ঞাসা করে আপনি কিস্‌কো খুঁজছেন?

রথীন বলে, সামনের বাড়ির কাউকে জান?

তিন নম্বর পাকা লোক, সে বুঝিল এই তরুণ কাহাকে চায়। তবু বলিল, সব কোইকে জানি, পিরমিল বাড়িউলী, হর্তুকী, বেদনা, রস্‌ওয়াতি।

রথীন বলিল, নাম জানি না, খাসা দেখতে, নরুন পেড়ে ধুতি পরে, হাতে দুগাছি নীল চুড়ি।

উ ত এ রাস্তা পর আসে নাই। লৌতুন এসেছে।

ওর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও। তোমাকে মোটা বকশিশ করব।

উ ত জরুর করবেন হামি জানি। লেকিন দেখা হোবে না। উস্কো বাবু বহুৎ বদমেজাজী। বাপ্‌ বোলতে শালা বলিয়ে বসে।

সেই হইতে রথীন মধ্যে মধ্যে আসে। মোড়ের কালী কেবিন নামক চায়ের দোকানে বসিয়া দোকানদার কালীবাবুকে দিয়া তিন নম্বরকে ডাকিয়া পাঠায়। কাজলের খবর জিজ্ঞাসা করে। তিন নম্বর মোটা বকশিশ পায়। কালীবাবুর দোকানেও এক টুকরা মাংস কিংবা একখানা কেক পড়িয়া থাকে না।

একদিন তিন নম্বর খবর দিল, রাস্তা সাফ ভৈলো বাবু।

রথীন বলিল, তার মানে?

পাঁচুবাবু হাজার ও চৈলে গেল।

বেশ, তুমি মেয়েটির সঙ্গে কবে দেখা করিয়ে দিচ্ছ?

কুছ সবুর করনে পড়েগা।

রথীন পাঁচ টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়া বলিল, সবুর কেন?

তিন নম্বর একটু হাসিয়া উঠিল, হাঁ-হাঁ! এই হাসির অর্থ সব সময় অমাবস্যার পরদিনই চাঁদ দেখা যায় না, অপেক্ষা করিতে হয়।

কত দেরি হবে বলতে পার?

দেরি কুছ হোবে। উস্কো বহুৎ দেমাক আছে।

কথাটা শুনিয়া রথীন কিছুটা খুশিও হইল। যাকে সে জয় করিতে চাহিতেছে সে সহজলভ্যা সাধারণ পতিতা নয়, গৃহস্থের মেয়ে, এই পল্লীতে নবাগতা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রথীন আজ কাজলকে পাইবে। তার মনে আনন্দ আর ধরে না। সে আপন মনে গুনগুন করিতে থাকে,

আজু মঝু শুভদিন ভেলা—

প্রসাধন নাই, কাজল চুলও ভাল করিয়া বাঁধে নাই, কপালে কাঁচপোকার টিপ, হাতে দুগাছা করিয়া কাচের নীল চুড়ি, পরনে আটপৌরে লাল পেড়ে শাড়ী আর আসমান রংয়ের ব্লাউজ, কিন্তু কী সুন্দরই না মানাইয়াছে, যেন বৈষ্ণব কবিতার বিরহিনী রাধা। রথীন মুগ্ধ নয়নে দেখে।

কাজল বলে, বসুন।

দুজনেই নীরব। কাজল একবারটি তার দিকে চাহিয়াই চোখ নিচু করে।

রথীন বলে, আজ আমার বড় সুদিন। অনেক ঘোরাঘুরি করে তোমার দেখা পেলুম।

কাজল কোন উত্তর করে না। রথীন চায়ের কাপের উপর চামচা দিয়া ঠুন-ঠুন শব্দ করিতে থাকে। সুন্দর পাতলা কাপ, গায়ে রঙিন সিনারি আঁকা, নদ নদী পাহাড়, জাপানী মন্দির।

সময় কাটিয়া যায়! রথীন কিছু বলার ভাষা খুঁজিয়া পায়না, কাজল ত নয়ই। খানিকটা পরে রথীন প্রশ্ন করে, কলকাতা লাগছে কেমন?

কলকাতার আমি ত কিছু দেখিনি।

কেন?

সুবিধে হয়নি।

রথীন কহিল, আমারও হয়নি পল্লীগ্রাম দেখার। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে খুবই।

মধ্যে মধ্যে এই রকম কাটা কাটা কথা হয়, অনভিজ্ঞের সঙ্কোচ মিশ্রিত আলাপ।

খানিকটা পরে কাজল পিরিচে করিয়া রথীনকে দুটি মিষ্টি দেয়।

ঘণ্টা দুই পরে রথীন উঠিল। বিদায়ের সময় কাজলকে কাছে টানিয়া তার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চোখের পাতায় দুটা চুমা খাইল। হাতে গুঁজিয়া দিল দশ টাকায় এক গোছা নোট।

একসঙ্গে এতগুলি নোট দেখিয়া কাজলের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্ন করে, এত টাকা দিয়ে কি হবে?

রথীন বলে, কেন, তুমিই ত চেয়েছ।

কাজল বলে, আমি খাট আয়না টেবিল কোন কিছুই চাইনি। টাকাও নয়।

ওঃ—আচ্ছা। আমি নয় আপনা থেকেই দিচ্ছি—বলিয়া আর একবার তাকে একটু আদর করিয়া রথীন বাহির হইয়া যায়।

কাজল খানিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ভাবে রথীনের কথা। নিজের চোখে দেখিয়া, প্রিয় সুবালার মুখে শুনিয়া এই পাড়ার বাবুদের সম্পর্কে তার যে ধারণা হইয়াছিল রথীন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বেশ শান্ত ভদ্র, সাধাসিধে ধরনের মানুষ।

কাজল নোটগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে। নতুন করকরে নোটের খসখস শব্দ বেশ লাগে। নোটগুলা বার দুই সে গালের উপর ঘসে।

ক্ষুধার জ্বালা ও পাওনাদারের তাগিদে ঘুম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেকদিন পরে সে আজ ভাল করিয়া ঘুমাইল। উঠিল পরদিন বেলা নয়টায়। উঠিয়াই দেখিল দরজায় তিন নম্বর দাঁড়াইয়া।

কাজলের ভাল লাগিল না। সে মনে মনে বলিল, শ্রীদুর্গা, শ্রীদুর্গা।

তিন নম্বর প্রশ্ন করে, বাবু পছন্ হইয়েছে দিদিমণি ?

কাজল একটু রুক্ষস্বরে বলে, তোমার কি চাই বল দেখি ?

আচ্ছা, তুমি হাত মুখ ধুইয়ে নেও। হামি থোড়া বাদ আসব।

বেলা এগারটা আন্দাজ তিন নম্বর আসিয়া দালালি চাহিলে কাজল জিজ্ঞাসা করে, কত চাই ?

পঁচিশ রুপেয়া।

খুচরা টাকা না থাকায় তাকে দশ টাকার তিনখানা নোট দিয়া কাজল বলিল, তুমি বাবুর কাছে আমার নাম করে অত সব জিনিসপত্র চেয়েছ কেন ?

উ আমীরকা লেড়কা। ইসি ঘরমে উঠ্ বোস করবে। কুর্সি টিবিল, খাট ই সব ত জরুর চাই।

কাজল বলে, টাকা ত চাইতে বলিনি।

রুপেয়াকো তুমহার জরুর দরকার আছে। উ হাম জানিয়েছিলাম,—বলিয়া তিন নম্বর একটু হাসে। তারপর কাজলের অলক্ষ্যে একটা ভেংচি কাটিয়া চলিয়া যায়।

বাড়িওয়ালীর ভাড়া ও লালার মুদীখানার দেনা চুকাইয়া কাজলের হাতে

সামান্যই রহিল। সে ধাঙড়ের মাহিনা ও কুলিদের বকশিশের দরুণ সুবালার টাকা শোধ করিতে গেলে সে বলিল, আমার বয়ে গেছে টাকা নিতে। আমায় বাইস্কোপ দেখাতে হবে। আমাকে আর প্রিয়কে। আর একদিন থিয়েটার।

প্রিয় বলিল, আমি দেখব ধর্মের বই যাতে রামলীলা কিংবা ঝুলন এই সব আছে।

সন্ধ্যার আগে সুবালা কাজলের সিঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া দেয়। কাজল বলে, আমায় সিঁদুর পরালে কেন, তোমরা ত পর না।

তুই হলি একজনের জিনিস, বাঁধা মেয়ে মানুষ। আমরা তো তা নই। এই বাবুর সঙ্গে তোর হল মাগ ভাতার সম্পর্ক।

সুবালা চলিয়া গেলে কাজল আয়নায় নিজের মুখ দেখে। মনে পড়ে বিদ্যাসাগরী মতে বিবাহের কথা। পাঁচু বিবাহ করিবে বলিয়া আনিল কিন্তু নিজ হাতে সিঁথিতে সিঁদুর পরাইবার বদলে গেলাস ছুঁড়িয়া তার কপালে দাগ আঁকিয়া দিল—সিঁথির প্রান্তে ছোট্ট একটি স্বস্তিকা। এই-ই তার শেষ দান। সে বলিত, এমন চিহ্ন এঁকে দিলুম যে আমায় আর কখনও ভুলতে পারবে না।

দাগটা আরও স্পষ্ট হইয়া আজ যেন তাকে বিদ্রূপ করিতেছিল অথচ সিঁদুরটুকু সে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। বাধ বাধ ঠেকিল। তার ভয় ছিল রথীন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই দাগ কিসের? কিন্তু এই সম্পর্কে সে কোন কৌতূহল প্রকাশ না করায় কাজল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুজনের সঙ্কোচ কাটিতেই কয়েকদিন লাগে। অথচ রথীন চলিয়া গেলে সুবালা রোজই আসিয়া প্রশ্ন করে, কি বলল রে তোকে আজ? কি বলে আদর করল?

কিছু বলেনি শুধু চুমু খেলে, তাও চোখের পাতায়।

নেকি! আমরা যেন কিছু দেখিনি—বলিয়া হাসে।

কাজল লজ্জায় রাঙা হইয়া যায়।

রথীনের সব চেয়ে ভাল লাগে তার এই সলজ্জ ভাব, তার পল্লীগ্রাম-সুলভ সারল্য। কাজলকে সে প্রায়ই গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করে।

কাজল বলে তাদের অঞ্চলের বড় বড় নদীর গল্প। তাদের কূল কিনারা নাই। তার মামা বাড়ির পথে এক একটা নদী এত বড় যে এপার-ওপার দেখা যায় না। আকাশ আর জলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। চাইলে মনে হয় আকাশ

উপর হইতে খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে আর নদী নীচ হইতে উঠিয়া আকাশ ছুঁইয়াছে।

তার এই বর্ণনায় রথীন ভারি খুশি হয়।

কাজল কখনও তাদের দেশের বড় বড় সাঁকো, ডিঙি নৌকা, গোসাপে ভরা জঙ্গল আর শুশুকে ভরা গাঙের গল্প করে।

শুশুক এমনি করে গড়িয়ে পড়ে—বলিয়া সে হাত নাড়িয়া শুশুকের গড়ান দেখায়। রথীন হাসিয়া ফেলে।

দেশের কথা বলিতে বলিতে কাজল আর সব ভুলিয়া যায়। তার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে ফুল্লশ্রীর ঘাট, ঘাটের পাশে টেলিগ্রাফের তার, নদীর বুকে জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে কচুরিপানার শোভাযাত্রা।

শুশুক ত দূরের কথা রথীন গোসাপও দেখে নাই। সে ইংরেজী বিদ্যার মারফৎ তাদের চিনিবার চেষ্টা করে। শুশুক বোধহয় ডল্‌ফিন্‌ আর গোসাপ ত মনিটর, গোসাপের চামড়ায় জুতা হয়।

একদিন সে বলিল, জান তোমায় আমরা—আমি আর সুরথ বলতাম—হার এক্সেলেন্সি ?

কাজল বলে, সে কি ?

রথীন বুঝাইয়া দিলে কাজল কহিল, আপনারা একটি অচেনা মেয়েকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন।

ঠাট্টা মোটেই নয়। যাক্ তুমি আমাকে আর আপনি বলবে কতদিন ?

'তুমি' ত ? সে হবে আস্তে আস্তে।

পুরুষ মানুষ সম্পর্কে কাজলের যে ভীতি ছিল রথীন তাহা ভাঙিয়া দেয়। কাজল একটু একটু করিয়া তার দিকে আগাইয়া আসে। নিজেকে সে পতিতা বলিয়া মনে করে না। নিজের অবস্থা ঠিক যে বোঝে তাও নয়। অন্য পাঁচ জন মেয়ের সঙ্গে বাবুদের যে সম্পর্ক তাদের সম্পর্ক সেরূপ নয়, শুধু এইটুকু লইয়া খুশি থাকে! তার ভীরু মন হিসাব নিকাশ করিতে চায় না, অতীত ও ভবিষ্যৎ কোন দিকেই তাকায় না। শশকের মতন চোখ বুজিয়া থাকিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

রথীন অভিজাত বংশের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ উপাধি লইয়া সদ্য বাহির হইয়াছে। এখনও সে আদর্শবাদী। কাজলের ইতিহাস শুনিয়া, তার সঙ্গে মিশিয়া দেখিল ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে সোনাবাগানে আসিয়া পড়িলেও

এই মেয়েটির মধ্যে ভাল হওয়ার উপাদান প্রচুর। সে মিথ্যা কথা বলে না, নেকামি করিতে জানে না। চেষ্টা করিলে এইরকম মেয়েকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলা যায় যাকে দিয়া সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

মানুষ মাত্রেই কিছু পরিমাণে শিল্পী—শিশু তাই পুতুল গড়ে, কিশোর কবিতা লেখে, যুবক গড়ে সংসার। আপিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেরানী টেবিলের উপর ছুরি দিয়া নিজের নাম খোদাই করিয়া রাখে। রথীনেরও গড়িবার সাধ হইল। কাজলকে সে গড়িয়া তুলিবে। সে সুরথকে বলিল, দেখ ওকে কি রকম গড়ে তুলি। আমার মনে কাজল সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট কল্পনা আছে।

সুরথ কবি। সে বন্ধুকে উৎসাহ দিল, ঐটেই বোধ হয় হবে তোমার লাইফের মিশন।

এই মিশন অর্থাৎ কাজলকে ভাল করিবার নেশা যেন রথীনকে পাইয়া বসে। সে মনে করে পতিতার উদ্ধার ব্রতে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়াছেন সেও সেই মহাপুরুষদের একজন, তাঁদেরই সমগোত্র।

কিন্তু এই বাটীতে থাকিয়া ভাল হওয়া অসম্ভব। ভাপসা গন্ধে ভরা স্বল্প পরিসর ঘরে মন স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হয়। তার উপর আছে হৈ হল্লা। দিনের বেলায় রসবতী তার টিয়াকে খালি পড়ায়, বল রাধাকেষ্ট, রাধা—কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি উঁচু।

টিয়া বুলি না পড়িলে এক এক সময় আগুন হইয়া ওঠে।

রথীন একদিন কাজলকে জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটি পাগল নাকি?

কাজল বলিল, ও ঐ রকম, ওর একটা কুকুর ছিল, সেটা ল্যাজ নাড়লে রসও পিছন দুলিয়ে সোহাগ করত।

সন্ধ্যার পর শুরু হয় মাতাল ও লম্পটের কলরব। এক একদিন গলিতে সোডার বোতল চলে। কাজল ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে যায়।

রথীন ঠিক করে কাজলকে ভাল পাড়ায় লইয়া যাইবে। ভাল বাড়িতে।

প্রমীলা প্রথম প্রথম রথীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করিয়াছে। রথীন আমল দেয় নাই। সে চলিয়া যাইবে শুনিয়া প্রমীলা একদিন এক গেলাস সরবৎ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, চলে যাবেন তাই ঠাণ্ডাই নিয়ে এলুম।

রথীন তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রমীলা বলে, ওঃ জানেন না বুঝি? ঠাণ্ডাই হ'ল বরফ মালাই আর পেস্তা বাদাম দিয়ে তৈরি সিদ্ধির সরবৎ। আপনি মাল খান না শুনে বানিয়ে নিয়ে এলুম।

আমি সিদ্ধিও খাই না।

এ ত বিলিতি মাল নয় বাবা! গণেশ নিজে হলেন সিদ্ধিদাতা, সেই সিদ্ধির সঙ্গেও অসৈযোগ—বলিয়া প্রমীলা ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া যায়।

প্রিয়বালা কাজলের কাছে দুঃখ করে, ছিলি তবু একটা বামুনের মেয়ে। অসময়ে অন্ততঃ এক গেলাস জলও পেতাম।

কাজল বলিল, আর কি বামুন আছি ভাই?

কেন, রথিনবাবু বামুন না?

কাজল জানিত রথীন ব্রাহ্মণ তবু বলিল, সে আমি জানি না।

আর পাঁচজন রূপজীবিনীর মতন প্রিয়ও নিজের পরিচয় গোপন করিয়া চলে। অতীতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় না। পিতৃদত্ত নামটাকেও সে জীর্ণ বস্ত্রের মতন পরিত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ সে আজ উচ্ছ্বাসভরে কাজলের কাছে নিজের গল্প শুরু করিয়া দেয়—জীবনের করুণ কাহিনী।

শৈশবে তার বাপ মা মারা যায়। মানুষ করে নিজের কাকা। কাকাটি নিঃসন্তান হইলেও ভাইপো ভাইঝিদের একান্তই গলগ্রহ মনে করিত। সে এক লম্পটের সঙ্গে প্রিয়বালার বিবাহ দেয়।

স্বামী মদ খাইয়া প্রায় রাত্রেই তাকে প্রহার করিত। শ্বশুর করিত কুপ্রস্তাব। শাশুরী আবার সেই জন্য গরম সেঁকা দিত। তার জীবন পথে এই সময় চক্কোত্তির আবির্ভাব। প্রৌঢ় বিপত্নীক এই ব্যক্তি তরুণীকে কুলের বাহির করিল—মিষ্টি কথায় আর ভুয়া সহানুভূতি দেখাইয়া।

প্রিয় দুনিয়ার কারও কাছে স্নেহ পায় নাই তাই কারও অভাব অনুভব করে নাই। কিন্তু কাজল যাইবে শুনিয়াই বলিল, তোর জন্যে কষ্ট হবে ভাই। আর হয়েছিল আমার গাঁয়ের জন্যে।

কী সুন্দর গাঁ আমাদের। বাড়ির কাছে ঘন গাছে ঘেরা দিঘি। কালো জল—কালো কিন্তু আয়নার মতন, তাতে নিজের মুখ দেখতাম। দিঘির পারে বসে পাখীর ডাক শুনতাম। খালি কুহু কুহু। আরও কত রকম মিষ্টি ডাক।

গ্রামের চার ধারে উঁচু নিচু ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে পাহাড়। আমাদের

পাহাড়টা নৈবেদ্যের চূড়ার মতন। তা আর দেখব না ভাই—বলিয়া প্রিয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

বাড়ি ছাড়ার দিন কাজল রসবতীর ঘরে গেল। রসবতী দাঁত-পড়া এক বাবুর জন্য পান ছেঁচিতেছিল। একবার মুখ তুলিয়া কাজলকে দেখিয়াই আবার নিজের কাজে মন দিল!

কাজল কহিল, যাবার আগে ক্ষমা চাইতে এলুম ভাই। সেদিন বড্ড কড়া কথা বলেছি।

ঘটনাটা এই, কিছুদিন আগে—রথীন তখনও আসে নাই—রসবতী তাকে পেটের সন্তান লইয়া খোঁটা দেয়, ভালবাসার বোঝা বইতে কেমন লাগছে?

কাজল তার আগের দিন উপবাসী ছিল। সেদিনও এগারটা পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নাই। সে উত্তর করে, ও তুমি বুঝবে না।

রসবতী বলে, তা বুঝব কেন? আমরা ত আর তোর মত সতী লক্ষ্মী নই।

কাজল দর্প করিয়া জ্বলে ওঠে, আলবৎ সতী। তোর মতন কখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকব না।

রসবতীর কণ্ঠ বরাবরই ধারাল। তার পরিচয়ও কাজলের জানা ছিল। কিন্তু সেদিন কেন যেন সে কোন জবাব করিল না।

কাজল লজ্জায় মরিয়া গেল। ভাবিল, ছিঃ এত ছোট আমি হলুম কি করে?

আজ কিন্তু কাজল বিদায় লইতে আসায় রসবতী দুকথা শুনাইয়া দেয়, যাচ্ছো যাও, অত নাটুকেপনা কিসের?

কাজল অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চায়। রসবতী বলে, এসব হচ্ছে বড় মানুষি ঢং। গরিবকে ছোট করার ফন্দি, ও আমি সইতে পারি না।

কাজল ধীরে ধীরে চলিয়া আসে। রসবতী আপনা আপনি বলিতে থাকে, ঢংএর আড়ত। আগে ছিল সতীপনার ঢং। এখন হয়েছে বড় মানুষির।

কথাগুলি কাজলের কানে গেল।

সুবালা কাজলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়া তার মুখে চুমা খাইয়া বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলে ভুলিস্‌নে ভাই। আমার বাবু বলেছে পাখা আনবে। লোকে খুব ফল খাচ্ছে কিনা। পাখা এলে তখন আসিস কিন্তু।

কাজল বলে, পাখা না হলেও আসতে পারব।

প্রমীলা উপস্থিত ছিল। সে বলিল, আসবে বৈকি। কাজলের আমার

যা স্বভাব। আমি বরাবরই বলেছি, ওর বরাত খুলবে, বিধেতা ওর ভাল করবে। কি ভাই আসবে না? বলিয়া—সে কাজলের চিবুক ধরিয়া আদর করে।

কাজল বলে, হ্যাঁ আসব।

প্রমীলা বলে, ঝপ্‌ ক'রে কি ভোলা যায়? লোকে তাই বলে, একবার চিনলে পিরমিল বাড়িউলিকে কেউ ভুলতে পারেনা। এই ত লক্ষেশ্বর কালোয়ার—কবে দশ বছর আগে আসত। আবার এখনও আসছে। সে বলে, পিরমিল বিবি তোমার পান বড় মিঠ্‌ঠি আছে। তাই ঘুমে ঘুমে আসছি। কি বল সুবালা, কথাটা সত্যি কি না?

সুবালা কিছুই জানিত না। তবুও ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ আমাদের সামনেই ত কত বার বলেছে।

ভদ্র পল্লী। কতকগুলি গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে দু তিন খানায় মাত্র রূপজীবিনীরা বাস করে। কাজলের বাড়িখানি বড় সুন্দর, পয়েন্টিং করা। সামনে চওড়া রাস্তা অথচ বেশী লোক চলাচল নাই, হৈ হল্লা নাই।

কাজলের ঘরে আলো বাতাস প্রচুর। ছবি সেলফ ঘড়ি কাচের আলমারি দিয়া রথীন ঘরখানাকে আগেই সাজাইয়া রাখিয়াছে। জানালা দরজায় টাঙাইয়াছে চকলেট রংয়ের পর্দা।

বাড়িতে আর তিনটি মেয়ে থাকে। তরুলতা চারুলতা দুই বোন আর মণিমালা। কাজলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় চারুলতার। বাড়িতে আসিয়া ঘর গুছাইয়া কাজল নিচে নামিতেছিল আর চারু উপরে উঠিতেছে। সিঁড়িতে দেখা। চারু কহিল, তোমার নাম বুঝি কাজল? শুনেছি তুমি ভাল মেয়ে। আমার সঙ্গে ভাব করবে? আমার নাম চারু,—বলিয়া সে কাজলের হাত ধরে।

কাজল বলে, হ্যাঁ করব। তুমি আমার কথা কার কাছে শুনলে?

দিদির কাছে। তরুলতা আমার দিদি। তোমার বাবুর সঙ্গে তার আলাপ আছে কিনা।

কাজল বলে, উনি এখানে আসেন বুঝি?

চারু হাসিয়া উত্তর করে, অমনি মুখ কালো হয়ে গেল? ভয় নেই। দিদি খুব ভাল গায়, তাই রথি বাবু রঘু উকিলের সঙ্গে দুদিন গান শুনতে এসেছিল। যাক, কলকাতা তোমার লাগছে কেমন?

কিছুই দেখি নি। ইষ্টিশান থেকে আট নম্বর বাড়িতে উঠেছি। সেখান থেকে আজ এখানে এলাম।

গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, হাওড়ার পুল কিছুই দেখায় নি?

কাজল মাথা নাড়াইয়া জানায়, না কিছুই দেখায় নাই।

রথীন বাবু [illegible]লো বাতাস থেকেও তোমায় আড়াল রাখতে চান বুঝি?—বলিয়া চারু হাসে।

রথীনের সঙ্গে তার পরিচয় যে অল্পদিনের কাজল সে কথা আর প্রকাশ করে না। চারুকে তার বেশ লাগে, সুন্দর চেহারা, ভাল স্বাস্থ্য, মিষ্টি মিষ্টি কথা।

সেই দিনই তরুর সঙ্গেও পরিচয় হয়। তরু বলে, তুমি চারুর বয়সী হবে, হয়ত আরও ছোট, তোমায় আমি তুমি বলব কিন্তু। তোমার কথা আগেও শুনেছি।

কাজল বলে, নিশ্চয় বলবেন।

দু'একদিন পরে প্রিয় ও সুবালাকে লইয়া কাজল সিনেমায় যায়। প্রিয় ও সুবালার জীবন যাত্রার ছাপ তাদের চোখে মুখে। প্রসাধন করিলে সেই কুশ্রীতা যেন আরও প্রকট হইয়া পড়ে। রথীনের তাই তাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাজলের অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না।

কাজল সিনেমা দেখিল এই প্রথম। শুরুতেই টপিক্যাল বাজেট। কোন এক রাজার মিছিল চলিয়াছে। পথের দুধারে বেয়নেট কাঁধে সৈন্যের দল দাঁড়াইয়া। রাজার আগমনে তোপ দাগা হয়, ঘন ঘন হর্ষধ্বনি হয়, করতালি বাজে।

তারপর মূল ছবি। আফ্রিকার জঙ্গলের দৃশ্য। সুন্দর প্রকৃতি, রঙিন পত্রপুষ্পে অপরূপ তার শোভা, বিহগের কল কাকলিতে, নদী ঝরণার কুলু কুলু তানে প্রাণবন্ত।

আবার মাঝে মাঝে শোনা যায় হিংস্র পশুর গর্জন। ঝরণার ধারে ভয়চকিত পিপাসাকাতর হরিণ দাঁড়াইয়া, অদূরে বিকট দর্শন শার্দুল তাকে আড়ি করে। ভীষণ ও মধুরের এ এক অপূর্ব সমাবেশ।

জঙ্গলে ছোট একদল মানুষ, বেঁটে বামনের জাত। তাদের লম্বা

দাড়ি দেখিলে হাসি পায়, উইর ঢিবির মতন ঘরে তারা বাস করে, হামাগুড়ি দিয়া ঢোকে।

জাতিতে জাতিতে তারা লড়াই করে, তীর ছুঁড়িয়া করে পশু শিকার, একটু আগুনে ঝলসাইয়া সেই মাংস খায়। দুর্জয় তাদের সাহস, হিংস্র প্রকৃতি—আমরা যাকে বলি বর্বর। কিন্তু তাদের বুকেও সন্তানস্নেহ আছে, তারাও প্রেম করে। উর্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া সৃষ্টির দেবতাকে প্রণাম জানায়। মাদল বাজাইয়া নাচে, গান গায়। কাজলের বেশ লাগে সেই নাচ, সেই বাজনা।

এই জঙ্গলে একটি শ্বেত নারী বার বার বিপদে পড়ে, অসভ্য মানুষের হাতে তার লাঞ্ছনার এক শেষ হয়। কখনও মনে হয় হিংস্র পশুর এই বারের আক্রমণ হইতে সে আর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু প্রতিবারই তার প্রেমিক তাকে রক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত জয় হয় প্রেমের। পশুর উপর মানুষের, বর্বরতার উপর সভ্যতার।

কামানের হুঙ্কারে কাজল আঁৎকাইয়া ওঠে, পশুর গর্জন শুনিয়া রথীনের হাত চাপিয়া ধরে। অসহায়ের মতন এদিক ওদিক চায়। যেন একটি ভয় চকিতা হরিণী।

রথীন লক্ষ্য করে বিপন্নের প্রতি তার সহানুভূতি, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ। কাজল একবার প্রশ্ন করিল, ছবিতে কালো মানুষের উপর সাদা মানুষ খালি জিতছে। এ কেন?

রথীন বলিল, এ যে সাদার তোলা ছবি।

তোমরা এমন ছবি তুলতে পার না যাতে কালো সাদাকে হারিয়ে দেয়? তুলো লক্ষ্মীটি।

রথীন উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল, তা হবে। আসবে এমন দিন যখন মানুষের মধ্যে কালো সাদার কোন তফাৎ থাকবে না। বামুন শুদ্দুর সব সমান হবে।

ছবি দেখিতে দেখিতে প্রিয় বলিয়া উঠিল, তা কখনও হবে না রথিবাবু। হাতের পাঁচটি আঙুল কি সমান হয়?

সে ও সুবালা ভাল ছবি দেখাইবার জন্য কাজলকে ধন্যবাদ জানায়। সুবালা বলে, রথীন বাবু দেখাচ্ছে, ভাল হবেই ত। বড় নোকের সবই ভাল।

দুইটা দিন সারাক্ষণ কাজলের চোখের উপর ছবিখানা যেন ভাসিতে

থাকে। সামনে চলে জিরাফ জেব্রা ও বানরের মিছিল। কানে আসে গরিলার গর্জন।

পর্দার উপর মানুষের দৌড়ঝাঁপ এক বিস্ময়, তার চেয়েও বিস্ময় ছবির শব্দ। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শোনা যায়, কানে আসে প্রেমিক প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জন, এমন কি চুম্বনের শব্দটি পর্যন্ত ধরা পড়ে। কাজল ভাবে ছবি দৌড়ায় কেমন করিয়া, তার মধ্যে শব্দ আসে কোথা হইতে? প্রশ্নের পর প্রশ্নে রথীনকে বিব্রত করিয়া তোলে।

তরুর ঘরে কাজলের গান শোনার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ করে তরুর শনিবারের বাবু রঘুনাথ। কাজলকে দেখিয়া রঘু বলে, আই কংগ্র্যাচুলেট ইউ, রথীন। তোমার সৌন্দর্য বোধ আছে বলতে হবে।

রথীন একটু হাসে, তার রূপের প্রশংসায় কাজল লজ্জিত হয়।

রথীনের চেয়ে বয়সে বড়, সুন্দর মুখশ্রী, রঘুনাথকে দেখিলেই মনে হয় ধনীর সন্তান, দুলালী ধরনের চেহারা।

পাশেই আর একটি যুবা, দেখিতে বাঙালী ঘরের আর পাঁচটি যুবার মতন, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চোয়ালের হাড় দুখানি উঁচু। সে বলিল, আমিও আপনাকে কংগ্র্যাচুলেট করছি রথীন বাবু। আমার নাম সাধন ভড়।

রঘু বলে, পরিচয় ওঁর অনেক, কবি সাহিত্যিক মোটা মোটা বই নিয়ে ঘোরেন।

সাধন বলিল, কেরানীটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন? বাঙালীর সেরা পরিচয়। ভ্যাগাবণ্ড নয়, আপিসে বেরোয়।

রঘুনাথ তরুর চাকর সখীয়াকে ডাকিয়া হুইস্কি সোডা আনিতে হুকুম করিল। সঙ্গে পান চুরুট ও ডালমোট। সে মনিব্যাগ খুলিয়া এক তাড়া নোটের মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিলে সখীয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাটলিশ?

রঘু বলিল, কবি কি বল? ওটা ত তোমার জুরিসডিকশন।

সাধন বলিল, হ্যাঁ আসুক।

রঘুনাথ তরুকে বলিল, ওদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিও।

রথীন বলিল, কাজল মাছ মাংস খায় না কিন্তু।

রঘুনাথ বলিয়া উঠিল, বোগাস্। এ যে খড়দার গোঁসাই দেখছি।

লোকটির এই ভোঁতা রসিকতা কাজলের ভাল লাগে না।

একটু পরে গান আরম্ভ হয়—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। রঘু ও সাধন তুইটা বর্মা চুরুট ধরাইয়া নেয়। চুরুটের ধোঁয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে ওঠে। রঘুনাথ সেই দিকে চাহিয়া থাকে। সাধন গানের তালে তালে তাকিয়ার উপর ঠেকা দেয়।

আট নম্বর বাড়িতে কাজল অনেক গান শুনিয়াছে। তখন মনে হইত কে যেন কানের উপর কথার ডেলা ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু তরুর গান একেবারে স্বতন্ত্র। রীডের উপর তার আঙুলগুলি ঢেউ খেলিয়া যায়। যন্ত্রের প্রাণ স্পন্দিত হইয়া ওঠে। তরু ঘরখানায় যেন সুর ছড়াইয়া দেয়। হাস্নুা হানার গন্ধে ভরা বাতাসের মতন মিঠা সুর। সে গায়—

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী

মনে হয় দিক্‌চক্রবালের ওপারে এক রাজপুরী। সেখানে বাঁশী বাজে। ইথারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই সুর ভাসিয়া আসে। শ্রোতারা তার স্পন্দন অনুভব করে।

সোডার বোতল খোলার শব্দে কাজল এখনও ভয় পায়। তার সেই চাহনি দেখিয়া সাধন বলে, স্যাইট্‌লি নারভাস্।

রঘুনাথ রথীনের দিকে একটা গেলাস আগাইয়া দিয়া বলে, আজকে অন্ততঃ খাও। ফর মাই সেক।

রথীন কহিল, এ আমার সহ্য হয় না দাদা।

রঘু বলে, কিন্তু সইয়ে নিতে হবে ত। নাবালক থাকবে আর কতকাল?

রথীন যতই আপত্তি করে রঘুর জিদ ততই বাড়িয়া যায়।

শেষটায় তরু বলিল—থাক। ওঁর শরীর যাতে খারাপ হয় তা নিয়ে জিদ করা কেন?

রঘু ও সাধন পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকাইয়া কাজলের দিকে চাহিয়া একসঙ্গেই বলিল, আপনার স্বাস্থ্যপান করছি।

স্বাস্থ্যপান! সে আবার কি? পাঁচুও মদ খাইত কিন্তু সে কখনও একথা বলে নাই। কাজল ভাবে, ইহা হয়ত কলিকাতার ভদ্রলোকের রীতি—যারা পাঁচুর চেয়েও বেশী লেখাপড়া জানা মানুষ—কবি, উকিল, প্রফেসর তাদের।

তরু তারপর গায় ভাটিয়ালি। কাজলের মনে পড়ে ধূপগঞ্জের কথা, সূর্য ডুবিয়াছে, নদীর ওপারে গাছের সারির উপর হইতে সূর্যের ছায়া নামিয়া আসে। সোনালী পাড় দেওয়া ধূসর রংয়ের কাশ্মীরী শালের মতন।

নদী দিয়া হাটুরিয়া ডিঙি বাহিয়া যায়। হালের মতন পায়ে করিয়া ঠেলা দিয়া জল কাটে। ছল ছল শব্দ করিয়া ঢেউগুলি তাল ধরে। হাটুরিয়া গায়—

পান দিয়া যাওগো বঁধু
পান দিয়া যাও
যদি না দাও দোহাই তোমার
আমার মাথা খাও
(বঁধু) পান দিয়া যাও—

কাজল তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ দিত, শাঁখ বাজাইত। আজ কে দীপ দেয়? শাঁখ বাজায় কে? বৌদি কি গোরাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে? না পারে না। তার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া গোরা শেষটায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ঘুমের মধ্যে এক একবার হেঁচকি তুলিয়া বলে, পিথি, পিথি—

কাজল ভাবে আরও কত কথা।

তরু ধরে নজরুলের গান। তরুণের প্রিয় কবি, চিরতরুণ নজরুল বাঙালী চিত্তে প্রেরণা যোগায়।

গান বন্ধ হইলে সাধন রথীনকে বলিল, আমার একটা কবিতা শুনবেন?

রঘু বলিয়া উঠিল, এখন কাব্যি শুরু করবি বুঝি?

সাধন কোন উত্তর করে না।

একটু পরে রথীন তার কাছে কবিতা শুনিতে চায়। রঘু বলিয়া ওঠে, বোগাস্।

সাধন দুইটি কবিতা পড়ে, একটি গদ্য কবিতা অপরটি ছন্দোবদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে গদ্য কবিতার তখনও চলন হয় নাই। দু' একজন লিখিতে শুরু করিয়াছেন মাত্র। কবিতা দুইটি ভাল না লাগিলেও রথীন ভদ্রতার খাতিরে বলিল, বেশ হয়েছে।

রঘু বলিল, ও রকম কবিতা আমিও লিখতে পারি—

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে
হাত দিলুম বাড়িয়ে—

তার কবিতা ও উচ্চারণ ভঙ্গীতে সবাই হাসিয়া উঠিল। সেই হাসিতে সাধনও যোগ দিল।

আবার গান শুরু হয়। চলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

রাত এগারটা আন্দাজ সাধন উঠিল। রথীনকে বলিল, একদিন এসে গোটা কয়েক লেখা আপনাদের শুনিয়ে যাব।

রঘু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ওঠে। কবিতা পড়ার কথা শুনিয়া হাসে, না স্বপ্ন দেখিয়া ঠিক বোঝা যায় না।

খানিকটা পরে রথীনরাও ওঠে। ঘরে আসিয়া রথীন কাজলকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল?

কাজল কহিল, গান খুব ভাল লাগল। তরুদি খাসা গায়।

রঘুকে?

ভাল লাগে নি, বিশেষতঃ সাধন কবির সঙ্গে ওর ব্যবহার। তবে লোকটার কোথায় যেন বেদনা আছে। গভীর বেদনা। মদ খাওয়া, কবির সঙ্গে ব্যবহার, সব তাতেই তার ছাপ।

রথীন কোন উত্তর করে না। তার মুখের দিকে চাহিয়া কাজলের মনে হয় সে এই বেদনার কথা জানে।

একটু পরে কাজল জিজ্ঞাসা করিল, উকীলের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কোথায়?

রঘুবাবু আমাদের এষ্টেটের উকিল, উনিই ত এই বাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন।

তুমি ওর সঙ্গে তরুর ঘরে আরও এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ এসেছি। তা বলে তোমার হিংসের কোন কারণ নেই।

হিংসে করতে আমার বয়ে গেছে—বলিয়া কাজল রথীনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার গায়ের উপর এলাইয়া পড়ে।

কাজলের এই 'বয়ে গেছে' রথীনকে নব বিবাহিত বন্ধুদের কথা মনে করাইয়া দেয়। তাদের কাছে শোনা দাম্পত্য জীবনের মধুর ছবি। সে কাজলের গালে টোকা দিতে দিতে বলে, ডার্লিং।

সে তাকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। তাকে নিজে পড়াইতে আরম্ভ করে। কাজল বাংলা লেখাপড়া কিছুটা জানিত। রথীন তাকে সদ্ভাব শতক এবং কথা ও কাহিনী পড়াইতে আরম্ভ করিল। আর শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। ইংরেজী প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক। তাকে গান শিখাইবার জন্য এক ওস্তাদ রাখিয়া দিল।

কাজল ভোরে গলা সাধে, তারপর বই পড়ে। দুপুরে খবরের কাগজ। রথীন রোজই সন্ধ্যায় আসে, তার পড়া নেয়, দরকার হইলে কাগজের খবরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

সেদিন পড়া ছিল কথা ও কাহিনীর 'পুরাতন ভৃত্য'। কাজল বলে, আজ পড়া হয়নি। তুমি বসে বসে কাগজ দেখ, আমি ততক্ষণে পড়াটা করে ফেলি।

রথীন বলিল, হয়নি কেন ?

সময় পাইনি। তা ছাড়া বুড়ো হয়েছি কিনা, পড়ে মনে রাখতে পারি না।

পড়া না হলে কিন্তু এই রকম শাস্তি পাবে, বলিয়া রথীন তার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া তার ঠোঁটে কয়েকটা চুমা খাইল।

কাজল বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া বলিল, এরকম শাস্তি দিলে আর পড়বই না।

সেদিন আর পড়া হইল না। পরের দিন রথীন আসিলে কাজল গড়গড় করিয়া খানিকটা মুখস্থ বলিয়া গেল।

রথীন কহিল, আমি সব চেয়ে খুশি হই তুমি পড়া করলে, রোজ রোজ এই রকম প'ড়।

হ্যাঁ প'ড়ব, তুমি আমায় পথ থেকে কুড়িয়ে আনলে, তোমায় খুশি করব না ?

ছিঃ, ও কি কথা ! নিজকে অত ছোট মনে করতে নেই।

আমরা কি ছোট নই ? আমরা মেয়েরা যে পরগাছা।

রথীন হাসিয়া বলিল, এমন পরগাছা আছে যার চাপে গাছ মারা যায়।

কাজল কহিল, তবু সে পরগাছাই।

লেখাপড়া গান বাজনায় কাজলের উৎসাহ খুবই। সে অল্পদিনেই বেশ খানিকটা আগাইয়া যায়, ইংরেজী রিডিং পড়িতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা মুখস্থ করিয়াছে।

তার এই উন্নতিতে চারু খুশি হয়। সুবালা মধ্যে মধ্যে আসে। কাজলকে ইংরিজী পড়িতে দেখিয়া সে যেমন আনন্দ লাভ করে, তেমনই বিস্মিত হয়। বলে তুই এত শিখলি কি করে ভাই ? এই ত ক' মাস, এর মধ্যে এক জাহাজ বিদ্যে পেটে পুরে ফেললি। তোর মাথা আছে বলতে হবে—বলিয়া কাজলের মাথা দুই হাতের মধ্যে ঝাঁকিয়া কতটা ঘি আছে দেখিবার চেষ্টা করে।

কাজলের আর এক শখ সেলাই। অবসর পাইলেই সেলাই লইয়া বসে, সুন্দর সুন্দর কাঁথার উপর নদী, পালের নৌকা, টেলিগ্রামের থাম কত কি

সব তোলে। তার অবচেতন মন তখন ধূপগঞ্জে চলিয়া যায়। তার সন্তান এই কাঁথায় শুইবে, কাঁথার উপর কাঁথা সাজাইয়া সে গদির মতন পুরু করিয়া দিবে, ছড়া গাহিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইবে এই সব ভাবিয়া সে আনন্দ পায়।

কাজল তার এক পিসির কাছে সেলাই শিখিয়াছে। সূচীশিল্পে এই মহিলার অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। তা ছাড়া তিনি চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন, ছড়া জানিতেন অসংখ্য। পিঠে বুড়ীর ছড়া, দুঃখিনী রাজকন্যার ছড়া এমন কত কি।

পিঠে বুড়ীর ছড়া শুনিতে শুনিতে কাজল ঘুমাইয়া পড়িত। স্বপ্নে জরির টুপি, পিঠার ঝুড়ি এবং আরও অনেক কিছুই দেখিত। হঠাৎ ঘুম ভাঙিলে চোখে পড়িত বাস্তব জীবনের ছবি। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ধারায় চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের উপর ময়লা কাপড় কাঁথাগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সেই মহিলা আর নাই। শুধু তাঁর ছড়াগুলি কাজলের স্মৃতিতে বাঁচিয়া আছে। আর আছে কাজলের কাঁথার উপর তাঁর নিপুণ শিল্প-শিক্ষার পরিচয়।

একদিন রথীন বলিল, সুরথ তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

কাজল কহিল, বেশ ত একদিন নিয়ে এস।

সে এখানে আসবে না।

কাজল বলিল, কেন ?

এখানে আসতে তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমার সঙ্গে আলাপ করতে আপত্তি নেই অথচ এখানে আসতে সঙ্কোচ, এ যেন কেমন !

তোমার কথা আলাদা কিন্তু এখানে যে আরও দু তিনটি মেয়ে থাকে, সেইজন্য আসতে চায় না। মরালিষ্ট ধরনের লোক।

কাজল হাসিয়া বলিল, মরালিষ্ট না বলে বল হাফ মরালিষ্ট। যাক, কোথায় আলাপ করবেন।

কোন হোটেলে কিংবা গড়ের মাঠে।

বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।

একদিন রথীন কাজলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। সুরথ কার্জন

পার্কের পশ্চিমে একটা গাছতলায় অপেক্ষা করিতেছিল। সেখান হইতে সে কাজলদের গাড়ীতে উঠিল। তখন রাত প্রায় আটটা।

প্রথমে তারা একটা চীনা হোটেলে যায়। সুরথ বয়কে ডাকিয়া ফাউল কাটলেট চাউচাউ ও একটা বড় পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলে কাজল বলিল, আমার জন্য শুধু একখানা টোষ্ট আনতে বলুন।

সুরথ বলিল, কেন, আপনি মাংস খান না ?

কাজল মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ডিম ?

কাজল বলিল, ডিম মাছ কিছুই নয়।

আপনাদের খাসা কমবিনেশন হয়েছে। যাকে বলে আইডিয়াল পেয়ার ; একজন ড্রিঙ্ক করে না আর একজন ভেজিটেরিয়ান।

রথীন কাজলের নামে বন্ধুর কাছে নালিশ করিল, দেখ এত বলি কিন্তু ও কিছুতেই মাছ খাবে না।

কাজল বলিল, আচ্ছা আপনিই বলুন নিরামিষ খাওয়া কি কিছু অন্যায় ?

সুরথ মদের গেলাসে একটা চুমুক দিয়া বলিল, ওটা আপনারাই মিটিয়ে ফেলুন। এর মধ্যে আবার থার্ড পার্টি কেন ?

সে একবার মদের গেলাসে চুমুক দেয় আর এক একটা বিষয় আলোচনা করে। বিলাত হইতে সদ্য ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। তার ধারণা যে সকল বিষয়েই বলার তার অধিকার আছে। সে এই সাহিত্য আলোচনা করে, পরক্ষণেই এনথ্রপলজি। এ দেশের প্রায় সমস্ত আলোচনার মত তার ভাসা-ভাসা আলোচনাও শেষটায় রাজনীতিতে গড়াইয়া যায়।

কাজল মধ্যে মধ্যে দু'একটা কথা বলে, মৃদু প্রতিবাদ জানায়। সুরথ বলিয়া ওঠে, বরাবর আমার ধারণা মেয়েদের কমনসেন্স পুরুষের চেয়ে বেশী। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'ল।

কাজল একটু হাসিয়া বলিল, মেয়ে মহলে আমায় কিন্তু বোকা বলে জানে। প্রমীলা, রসবতী—

তারা কারা ?

কলকাতায় এসে প্রথম প্রমীলার বাড়িতেই উঠি।

রথীন বলিল, সেই পিরমিল আমাকে একদিন ঠাণ্ডাই খাওয়াতে চেয়েছিল ?

হাঁ৷ মনে পড়েছে, আর কাজলকে দিয়ে কি যেন তুকতাকও করতে চেয়েছিল? বলিয়া সুরথ কাজলের দিকে চায়।

কাজল লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে।

সুরথ বলে, জিনিসটা যেন কি?

রথীন বলে, বাতাসার ভিতর মাকড়সার জাল পুরে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিল। সঙ্গে মন্তরও ছিল।

সুরথ বলিল, ডেঞ্জারাস। সেকসন থ্রি টোয়েন্টি এইট্, আই, পি, সি।

খাওয়ার পর তারা স্ট্র্যাণ্ডে বেড়াইতে যায়। গাড়ী হইতে নামিয়া নদীর দিকের ফুটপাথে বেড়ায়। দুইজন দুই পাশে, মধ্যখানে কাজল।

পাশেই পথের উপর মোটর ও ঘোড়ার গাড়ীর ভিড়, খোলা মোটরে ল্যাণ্ডো ফিটনে কলিকাতার অভিজাতরা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা সব বয়সের আনন্দ সন্ধানীর দল। অর্থ চিন্তা নাই, অভাবের তাড়না নাই—এ যেন এক নূতন জগৎ।

এক একবার তরুণ তরুণীদের কলহাস্য ভাসিয়া আসে, আসে গানের সুর। চলমান ফিটনে বসিয়া এক পাগড়িওয়ালা প্রৌঢ় গায়,

সাকি মেরি জাগো

কাজলের মনে হয় ইহাই জীবন।

সুরথ আরম্ভ করে পাশ্চাত্য জগতের গল্প, বিলাতের কথা। বলে, হাউ বিউটিফুল। তারা বীর, তারা ভোগী—ভোগী বলেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে ঘরে বাইরে জীবনের সব বিষয়ে বড়।

সুরথ সুকণ্ঠ, কথা দিয়া শ্রোতার চোখে রামধনুর চমক লাগাইতে পারে। কাজল মুগ্ধ হইয়া শোনে, ছেলেবেলা দূর্বা হাতে করিয়া যেমন ব্রত কথা শুনিত। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ওদের দেশে মেয়েরা ভুল করলে তার ক্ষমা আছে?

সুরথ বলিল, শাসনও কম নয়, তবে ক্ষমা করতে ওরা জানে। বলবানের নিয়মই এই।

পাশের নদীর উপর জেটি। জেটিটা রাস্তা সমান উঁচু। কথা বলিতে বলিতে তারা জেটিতে যাইয়া দাঁড়ায়। পায়ের তলায় নদীর জল কলকল করে। সামনে জাহাজের মাস্তলে মাস্তলে আলো, তারাগুলির নিচে মানুষ যেন আর এক তারার জগৎ গড়িয়াছে।

ঐ জাহাজে চড়িয়া কত দেশ দেশান্তরে যাওয়া যায়, সুরথের বর্ণিত দেশে—যেখানে সমাজ উদার, যেখানে যোড়শীচরণ নাই, পাঁচু নাই, মেয়েরা ভুল করিলে সমাজ ক্ষমা করে।

এই সময় সুরথ রথীনকে বলিল, তুমি একটু ওপাশে গিয়ে দাঁড়াও। হার এক্সেলেন্সির সঙ্গে আমি একটু প্রাইভেট আলাপ করি। আলাপ অবশ্য তোমার সম্পর্কে।

রথীন জেটির অপর প্রান্তে যাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া চুরুট টানিতে থাকে। সেও বোধ হয় বিলাতের কথাই ভাবে, বিলাতের জীবনের স্বপ্ন দেখে।

মিনিট কুড়ি পরে সে ডাকে, হ্যালো।

পরদিন কাজল রথীনকে বলিল, তোমার বন্ধুটি ত বেশ!

কেন, হয়েছে কি?

কাজল লজ্জায় বলিতে চায় না। অনেক অনুরোধ ও জেরার পর রথীন বুঝিতে পারে যে তার অনুপস্থিতির সুযোগে সুরথ কাজলের মুখে চুমা খাইয়াছে।

রথীন ধীরে ধীরে বলিল, রেচ্‌!

বাড়ির আর একটি ভাড়াটে মণিমালা। তার বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। মোটা সোটা গড়ন, রং ফরসা। মুখখানা চাকার মত গোল। তার ধারণা সে চন্দ্রাননী। তার ঘরে যারা আসে তাদের প্রায় সকলেই পুলিসের লোক। মণিমালা বলে, ঐ গোঁফওয়ালা বাবু, ও হচ্ছে কমিশনার সাহেবের চাইতে মাত্তর দুধাপ নিচে।

আর যে বেঁটে বাবু, ওর ছাপ না পেলে কলকাতায় গাড়ী চলার হুকুম নেই। বাড়ির গাড়ী, ফিটিন, টেক্সি সব গাড়ীর হর্তাকর্তা।

পুলিস তার হাতধরা, মণিমালার এইটাই সবচেয়ে বড় গর্ব। সে বলে, চোর বল, বাটপার বল, পকেটমার বল ইচ্ছে করলে সবাইকে আমি খালাস করে আনতে পারি।

তার নিজের একখানা ফিটন গাড়ি আছে। সুন্দর গাড়ি, ঘোড়াটা আরও সুন্দর, ধবধবে সাদা। মণিমালা রোজ সকালে উঠিয়া ঐ গাড়ি করিয়া গঙ্গাস্নানে যায়। বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসে। সে বলে, গঙ্গাচান করাটা আমাদের খুব দরকার। ওতে পাপ পেক্ষালন হয়।

সে প্রায়ই তরুকে গঙ্গায় লইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে কাজলও সঙ্গে থাকে। রথীন না আসিলে সে বৈকালে মণিমালার সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসে।

মণিমালা একদিন তাকে উপদেশ দিল, জজ ম্যাজেষ্টর পুলিস সাহেব তো হবি না। হবি বড় জোর বাড়িউলি। তা লেখাপড়ায় অত টাইম নষ্ট কর কেন? গান শিখছ, বেশ ভাল। এর সঙ্গে নাচও শেখ। নাম করা গাইয়ে নাচিয়ে হও, যাকে বলে ড্যান্সট্রেস্।

বাড়িউলি হইবার ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া কাজলের অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ওঠে। তার ভবিষ্যৎ ঐ প্রমীলা হওয়া। হায় ভগবান!

পরের দিন কাজল রথীনকে বলিল, মণিমালা আমায় ড্যান্সট্রেস্ হতে বলছে। সে বলে, লেখাপড়া বন্ধ করে দাও।

এই ড্যান্সট্রেস্ লইয়া তুজনে খুব হাসাহাসি করে। একটু পরে রথীন বলে, নাচ শিখবে নাকি?

কাজল উত্তর দেয়, আমার লজ্জা করে। শরীর তুলিয়ে তুলিয়ে নাচা, পুরুষগুলো হাঁ করে চেয়ে থাকে।

রথীন বলে, কিন্তু নাচ যে একটা আর্ট।

কাজল কহিল, তোমার তো বোন নেই। থাকলে তুমি কি তাকে নাচতে দিতে?

রথীন গম্ভীর হইয়া গেল। মনে হইল সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

তার পরদিন আসিয়া বলিল, তোমার কথাটা ভেবে দেখলুম। হ্যাঁ, আমার বোন থাকলে আমি তাকে নাচ শেখাতুম—অবশ্য যদি তার পার্টস থাকত।

বেশ, তাহলে আমিও শিখব। তবে এখন নয়, কিছুদিন পরে—বলিয়াই কাজল লজ্জায় জিভ কাটে।

এই লজ্জার কারণ তার গর্ভের সন্তান। ইহা লইয়া তার সঙ্কোচের সীমা নাই। সঙ্কোচ রথীনকেই বেশী। দেহে অপরের প্রেমের চিহ্ন বহন করিয়া রথীনের সামনে যাইয়া তাকে দাঁড়াইতে হয়। এতদিন কোন রকমে ঢাকিয়া চলিতে পারিত। দিন দিন তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এর জন্য তার নিজের উপর রাগ হয়। রাগ হয় গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর, পাঁচুর উপর।

রথীন কিন্তু এই সম্পর্কে সামান্য একটা ইঙ্গিতও করে না। বরং সন্তান সম্ভাবিতার যেরূপ যত্ন লওয়া উচিত ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজলের ঠিক সেইরূপ যত্ন করে। তার আদর যত্নে কাজল আরও সঙ্কুচিত হয়। ভাবে, বিধাতা এ কি শাস্তি তুমি আমাকে দিচ্ছ?

কয়েকদিন পরে। রথীন পড়াইতেছিল,

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠায়েছ বারে বারে—

এই সময় সদর দরজায় কে যেন ডাকিল, বাড়িতে কে আছেন ?

প্রথম ডাক কাজল শুনিতে পায় নাই। আবার ডাক আসে, কে আছেন ?

কাজল চমকিয়া ওঠে, ছুটিয়া গিয়া পোর্টিকো হইতে মানুষটিকে দেখিয়া আসিয়া রথীনকে বলে, যাও ছুটে গিয়ে ওঁকে বলে এস কাজল এখানে থাকে না, কখনও থাকত না।

তার চাঞ্চল্যে রথীন বিস্মিত হয়। বলে, কেন বল দেখি ?

তুমি যাও লক্ষীটি, আর দেরি ক'র না।

কাজলের এই ব্যাকুল আবেদনের পর রথীন আর কোন প্রশ্ন করে না। নিচে নামিয়া গিয়া দেখে দরজায় নামাবলী গায়ে এক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া। কপালে ও নাকে গঙ্গার ঘাটের ওড়িয়া ঠাকুরের দেওয়া চন্দনের ছাপ। তিনি কহিলেন, কাজলকে একটু ডেকে দেবেন ?

রথীন বলিল, ও নামে ত এখানে কেউ থাকে না।

কেন ? আমাকে যে আট নম্বর থেকে বলে দিলে কাজল এখানে উঠে এসেছে। এটা কি বার নম্বর চুনি বাঁড়ুয্যে ষ্ট্রীট নয় ?

কাজল আট নম্বর বাড়ি থেকে বড় দুঃখ করেই লিখেছিল আজ ক'মাস আগে। আমি এতদিন আসতে পারিনি। আপনি ঠিক জানেন সে এখানে থাকে না ?

রথীন বলিল, হ্যাঁ জানি।

বৃদ্ধ এবার আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন, এ আমার শাস্তি ! মেয়েটা বুঝল না যে আমি তার উপর রাগ করিনি, করতে পারি না।

এই মানুষটির নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া রথীনের নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছিল। সামনে থাকিলে আরও মিথ্যা বলিতে হইবে এই ভয়ে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

আগন্তুক ধীরে ধীরে অতি মৃদু পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। একটু যান আর পিছন ফিরিয়া তাকান, মোড় পর্যন্ত যাইয়া পানওয়ালা কাণ্ডয়াকে কি যেন জিজ্ঞাসা করেন।

কাজল পোর্টিকো হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া সব দেখিতেছিল। বৃদ্ধ অদৃশ্য হইয়া গেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবাগো!

রথীন বলিল, তোমার বাবা এসেছিলেন বুঝি? তা একবার দেখা করলে না কেন? অমন স্নেহময় মানুষ!

কাজল বলিল, না, না, সে তুমি বুঝবে না। যাক, আজ তুমি আমায় ছুটি দাও।

সারাদিন সে চুপ করিয়া থাকে। বিষাদ তার মনটাকে নিরন্ধ্র কালো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

সংসারে যার নিকট সর্বাধিক স্নেহ পাইয়াছে সেই পিতাকে দরজা হইতে এইভাবে বিদায় দিয়া অতীত জীবনের উপর সে যেন আর একটা পর্দা টাঙাইয়া দিল। যবনিকা আগেই পড়িয়াছিল, সেই বিচ্ছেদ আজ আরও দৃঢ় হইল।

তারপর মনে পড়ে ছোট ছোট কত ঘটনা, পিতার স্নেহের এক একটা অভিব্যক্তি। আজ তাঁর তিরস্কারগুলিও কতই না মিষ্টি মনে হয়। কিন্তু সেই তিরস্কার ত আর শুনিতে পাইবে না।

পিতার পর কাজল রথীনের নিকটেই সব চেয়ে বেশী স্নেহ পাইয়াছে। সে তাকে বড় মানুষের হালে রাখে। তার কোন বিষয়েই যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় সে সম্পর্কে রথীনের লক্ষ্য তীক্ষ্ণ।

তার এই উদারতায় কাজল মুগ্ধ হয়, অভিভূত হয়। সেও সর্বক্ষণ চেষ্টা করে তাকে খুশি করিবার। সে পড়াশুনা ভালবাসে, কাজল তাই মন দিয়া পড়ে, সে গান ভালবাসে তাই রোজ ভোরে উঠিয়া গলা সাধে।

কাঁথা সেলাই করিতে করিতে সে একদিন কাঁথার উপর রঙিন সুতা দিয়া তুলিল, শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিচে শ্রীমতী কাজল। নিজের অজ্ঞাতে তার অবচেতন মন আঙুল ও ছুঁচ সুতার মধ্য দিয়া এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

অক্ষরগুলি সে চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। দেখিতে লাগে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও বোধ হয়, নিজের কাছে ধরা পড়ার লজ্জা।

এই সময় রথীন পিছন হইতে বলিল, খাসা হয়েছে। শ্রীমতী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় লেখনি কেন?

কাজল তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসে, করুণ হাসি। সে হাসি যেন বলিয়া দেয়, সে কি সম্ভব? অতটা সুখ আমার সইবে না।

তার বোধ হয় মনে পড়ে পাঁচুকে, তার বিবাহের প্রতিশ্রুতি।

রথীন চলিয়া গেলে কাজল ঐ কথাই ভাবে। আপন মনে বার কয়েক আওড়ায় কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল বাঁড়ুয্যে।

রথীনের আশ্রয়ে আসার পর নিজের ভবিষ্যতের কথা সে আর এমন করিয়া কখনও ভাবে নাই। আজ ভাবে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই ভয় হয়। হিন্দু সমাজ নারীর প্রতি এমনিই কঠোর, বিশেষতঃ যে নারী একবার বিপথে গিয়াছে তার প্রতি। রথীন কি তাকে টানিয়া তুলিতে পারিবে? না না, সে অসম্ভব।

তার মুখে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় শোনার পর কাজলের বরং ভয় হয়, এই বুঝি হারাইলাম। এই হারাই হারাই ভাবের জন্য রথীনের প্রতি তার যত্ন আরও বাড়িয়া যায়।

চারু একদিন হাসিয়া বলিল, শুনেছি রাত্তিরে সোয়ামী শুতে এসে আদর করবে বলে কনেবউরা অনেক রকম ছল কলা করে। তুই দিন দিন যেন সেই কনেবউ হয়ে উঠছিস।

কাজল সলজ্জভাবে কহিল, আমার জন্য ও কত করেছে। আমি ভেসে যেতুম; ওই ত কুলে টেনে তুলল।

তুলেছে নিজের জন্য। ওরা যেমন শখ করে পশু পাখী পোষে এও তেমনি। আমরা হলাম পুরুষ মানুষের খেলার বস্তু।

কথাটা কাজলের মনঃপূত হয় না। সে বলে, তা হবে। কিন্তু—

চারু হাসিয়া বলিল, মেয়েদের মরণই ত ঐ কিন্তুতে। পিরিতের কিন্তু। তাই বলছিলাম অত ওথলানো ভাল নয়।

কাজল কহিল, আমায় ত বললি। নিজের বেলায় মনে থাকে না?

চারু উত্তর করিল, থাকে না বলেই ত সাবধান করে দেওয়া!

সে একটি বিলাত ফেরতকে ভালবাসে। ঘরে আর কাহাকেও বসায় না। এই লোকটির নাম কেহ জানে না। এমন কি চারুও নয়। তার বন্ধুরা ডাকে ভণ্ডুল। চাকর বামুন ও পানওয়ালারা—ভণ্ডুল সাব। চারু বলে সাহেব।

ভণ্ডুল বিলাতে যে কি করিত সে সম্বন্ধে এক এক জন এক এক কথা

বলে। কেহ বলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িত, কারও ধারণা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির ট্রেনিং কোর্স।

বেঁটে খাটো মানুষটি, শ্যামবর্ণ, কালো বলিলেই চলে। চোখ দুটি কাকচক্ষুর মত রহস্যময়।

ভণ্ডুল ট্যাক্সিতে ছাড়া আসে না। প্রায়ই নূতন নূতন স্যুট পরে। কৌটার পর কৌটা সিগারেট পোড়ায়। পোশাক পরিচ্ছদ ও ধরন ধারণ দিয়া লোকের চোখে নিজেকে বড় করিয়া তুলিবার শক্তি তার অদ্ভুত। সে কখনও বিড়লার গল্প করে, কোন দিন আসিয়া বলে, বেন্থলকে বিজনেস প্রপোজ্যাল দিলুম। বার্ডের বেন্থল।

বিশাল তার ব্যবসা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কারবার, তার উপর সাত সাতটা জমিদারী কাছারি, বাংলার পাঁচটা জেলায়।

সে প্রায়ই ইংরেজী মিশ্রিত খিচুড়ি বাংলায় কথা বলে। যতখানি প্রকাশ করে, তার চেয়ে বেশী করে আত্মগোপন। এমনি করিয়া মানুষের চোখে নিজেকে রহস্যময় করিয়া তোলে। সংসার অনভিজ্ঞ চারুর চোখে ধাঁধা লাগে। সে ভাবে মানুষটা সত্য সত্যই অসাধারণ।

মেয়েদের চোখের উপর চোখ রাখিয়া ভণ্ডুল তাদের যেন হিপনটাইজ করিয়া ফেলে। তরু তার চোখের দিকে চাহিয়া কথা বলে না। মণিমালা বলে, ভণ্ডুল সাহেব থানার বড় বাবু হলে আসামীদের মুশকিল হত। তার চোখের দিকে চেয়ে পেটের কথা কেউ চেপে রাখতে পারত না।

ভণ্ডুল একদিন বলিল, চল, একবার বড় বুডর ঘুরে আসি।

চারু তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ভণ্ডুল বলে, বড় বুডর হল ভারতীয় কুলটুর ও কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চারু ভাবে, এই কুলটুর বস্তুটি কি আর কলাই বা কেমন? প্রশ্ন করে, এ সব কোথায়?

ও ডিয়ার ডিয়ার! বুডর মানে বুড়ো। বড় বুড়ো অর্থাৎ শিবের মন্দির। বালিতে।

বেশ যাব, বালি ত কাছেই।

নো নো, সুম্যাট্রা বালি। প্লেনে করে যাব। উড়ো জাহাজে।

উড়ো জাহাজ চড়তে আমার ভয় করে।

স্থিলি গুজ। প্লেন জার্ণি ভেরী নাইস। প্রাহা থেকে স্টাটগার্ট আর কোলকাতা থেকে জোগজাকর্তা। আই স্থাল এভার রিমেম্বার।

চারু কাজলকে এই গল্প করিলে সে বলিল, বেশ ত বেড়িয়ে আয়। দেশ-বিদেশ দেখবি, কত আনন্দ পাবি।

চারু কহিল, কলকাতা ছাড়া কিছু দেখিনি ভাই, একবার শুধু হাওড়ায় গিছলুম। কদমতলায়। বাইরে যেতে আমার কেমন ভয় করে।

কয়েকদিন পরে সে নিজ হইতেই আসিয়া বলিল, বাঁচলাম! এখন উড়ো জাহাজ পাওয়া যাবে না। সরকার নাকি উড়ো জাহাজ ছাড়তে নারাজ।

সেইদিনই সকালে ভণ্ডুল চারুকে বলিয়াছে, গভ্‌মেণ্ট স্থিলি গ্যাণ্ডার, এখন প্লেন দিতে রাজী হচ্ছে না। সে তার পর মন্দিরের বিশালত্বের গল্প করে। বলে, দেখছ মন্দিরের সিঁড়িতে কে বসে আছেন?

চারু বলিল উনি কে?

টেগোর। গিয়েছিলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

ওঃ তাই বল, আমাদের রবি ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির। দিদি ওঁর অনেক গান জানে—বলিয়া চারু মুগ্ধ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সৌম্য সুন্দর মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকে।

ভণ্ডুল এক এক সময় অনেক দিন আসে না। আবার কখনও আসিয়া একটানা পাঁচ সাত দিন থাকে। খালি মদ খায় আর সিগারেট মুখে দিয়া পায়জামা পরিয়া বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে 'ওঃ ডিয়ার ডিয়ার' করে। কথায় কথায় চারুকে বলে, স্থিলি গুজ। সখিয়াকে, সিলি গ্যাণ্ডার! প্রায়ই ইংরাজীতে সুর ভাঁজে, আই লাভ ইউ। সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চারুর দিকে চাহিয়া 'ইউ'র উ-টাকে টানিয়া কি যেন মায়ার সৃষ্টি করে। এক একবার চারুর যে খটকা লাগে না এমন নয়। কিন্তু উহা নিতান্তই সাময়িক। পরক্ষণেই আবার ভাবে, অত বড় মানুষ উনি, ওঁকে চেনা কি সহজ?

একদিন সে কাজলকে বলিল, সাহেব তোকে নিয়ে টালিগঞ্জ যেতে চায়।

কাজল বলে, কেন রে?

চারু বলিল, আমরা জমি কিনব কিনা, তাই!

কে, তুই আর তরুদি?

চারু একটু হাসিয়া কহিল, না, সাহেব আর আমি। সাহেবই কিনবে আমার নামে। টালিগঞ্জে।

তা আমায় কেন ?

তোর পছন্দ নাকি খুব ভাল।

তোর সাহেব দেখছি গনৎকারও।

চারু বলিল, ও সব জানে। বিলেতে শিখেছে দুধ থেকে ছানা তোলা, কয়লা থেকে সেণ্ট তৈরি, কত কি।

কাজলের ইচ্ছা ছিল না যে ভণ্ডুলের সঙ্গে যায়। চারু আসিয়া আবার ধরিল, কিরে, কবে তোর সুবিধে হবে ?

তার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাজল শেষটায় রথীনের অনুমতি চায়। রথীন বলে, চারুর সঙ্গে যাবে, সে ত ভাল কথা। কিন্তু এই শরীরে যাওয়া কি উচিত হবে ?

তা পারব। না গেলে চারু দুথ্‌খু করবে। তুমি যাবে ত ?

আমার কথা আসছে কোত্থেকে ? ওরা ত বলে নি। তা তুমি একাই যাও না।

পরের দিনই টালিগঞ্জ যাওয়া হয়। ভণ্ডুল কাজলের হাত ধরিয়া ট্যাক্সিতে তোলে। চারু বলে, ড্রাইভারকে বল একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে।

ভণ্ডুল হাসিয়া বলিল, স্থিলি—এবার গু্যজ না বলিয়া কথাটা শেষ করিল স্যুইট দিয়া।

পথে মিউনিশিপ্যাল মার্কেটে নামিয়া সে চকোলেট আর প্যাষ্ট্রীজ কেনে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ট্যাক্সি আসিয়া রেড রোডে পড়ে। রেস কোর্সের পাশ দিয়া দক্ষিণ দিকে চলে। শীতকালের মিঠা বৈকালী আলোয় মাঠটাকে ভারী সুন্দর দেখায়। গাছের নিচে নিচে ছায়া, তার মধ্যে কত রহস্য লুকাইয়া আছে। ঐ ছায়া যেন প্রকৃতি, পাশেই রৌদ্র দাঁড়াইয়া, প্রকৃতির প্রেমলোভী অপেক্ষমান পুরুষ। তাদের শিশুতে শিশুতে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। মাটির গাছপালা, আকাশের পাখী তাদেরই প্রেমের ফল—ঐ আলো-ছায়ার।

পাখীরা গাছে গাছে কুলায় বাঁধিয়াছে, সেখানেও চলিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা।

ভণ্ডুল বলিল, পাখীতেও বাসা বাঁধার সময় মেয়ে পাখীর সাহায্য নেয়। মানুষ যে সুন্দরীর সাহায্য নেবে সে ত স্বাভাবিক—বলিয়াই সে একবার কাজলের দিকে চায় আবার চায় চারুর দিকে।

কাজলের প্রায় ভরা মাস। রথীন আজকাল আর তাকে লইয়া বেড়াইতে

বাহির হয় না। বহুদিন পরে গাছপালা নীল আকাশ আর মাটির মেদুর রূপ দেখিয়া কাজল যেন তার মধ্যে ডুবিয়া ছিল। কথাগুলি তার কানে পৌঁছিল না।

চারু চকলেট চুষিতেছিল। সে বলিল, খাসা চকলেট।

টালিগঞ্জে রিজেন্ট পার্কের কাছে চারুদের জমি, সামনে রাস্তার দক্ষিণে আদিগঙ্গা। নদীর ওপারে ফাঁকা মাঠ, মাঠের প্রান্তে দূরে একটা সবুজ রেখা। ডানদিকে কলা গাছে ঘেরা পুকুর, গাছগুলি পাঁচুদের ধুপগঞ্জের বাড়ির পুকুর পাড়ে কলাগাছের সারির মতন সাজানো।

তারা খানিকক্ষণ ঘোরে, নদীপাড়ে ঘাসের উপর দিয়া বেড়ায়। চারু গাছপালা লতা পাতা দেখে আর প্রশ্ন করে, এটা কি গাছ? ওটা কি ফুল? নিচু নিচু গাছের ফুল ছিঁড়িয়া গন্ধ শোঁকে। শিয়ালকাঁটা দেখিয়া বলে, ওঃ বাপ, দাঁত মুখ যেন খিঁচিয়ে আছে।

একটা উঁচু গাছের কাছে আসিয়া ভণ্ডুল বলিল, দেখি ক্লাইম্বিং ভুলে গেছি কি না।—বলিয়াই সরসর করিয়া গাছ বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। চারু কাজলের দিকে চাহিয়া বলে, দেখলি ত?

কিন্তু ভণ্ডুল আরও খানিকটা উঠিলেই সে ডাকিতে আরম্ভ করিল, নেমে এস, আর উঠো না লক্ষ্মীটি, হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যাবে।

ভণ্ডুল ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সুর ভাঁজে, আই লাভ ইউ।

কাজল চারুকে বলে, এখন ডাকিস নে। সাহেব অন্যমনস্ক হলেই বরং বিপদ।

একটু পরে ভণ্ডুল নামিয়া আসিলে চারু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

যাক্ জমিটা পছন্দ হল ত? এখানে বাড়ি করলে কেমন হয়?—বলিয়া ভণ্ডুল চারুর ঘাড়ের নিচে সুড়সুড়ি দেয়।

চারু ক্রোধের ভান করিয়া বলে, তুমি বড় ইয়ে।

ভণ্ডুল বলে, ইউ চকলেট গার্ল। তার পর কাজলকে প্রশ্ন করে, আপনার লাগল কেমন?

বেশ।

আপনারাও ওখানে বাড়ি করুন না। আপনি ও মিস্টার ব্যানার্জি।

চারু বলিল, তা হলে বেশ হয়। পাশাপাশি থাকতে পারি। বলিস কিন্তু রথিবাবুকে।

বেদুইন দস্যুর মতন সন্ধ্যার অন্ধকার ও শীত হঠাৎ নামিয়া আসে। চারুর গায়ে উলের একটা স্কার্ফ জড়াইতে জড়াইতে ভণ্ডুল কাজলকে বলে, আপনিও শালখানা জড়িয়ে নিন। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগবে।

ফেরার পথে সে তাদের বায়োস্কপ দেখায়, এক হোটেলে নামিয়া সে ও চারু ডিনার খায়। কাজল এক কাপ চা। ভণ্ডুল দুঃখ করে, আপনি ত কিছুই খেলেন না।

কাজল বলিল, কেন, এই যে খেলাম।

চারু বলিল, আজ তবু হোটেলে চা খেয়েছে, আগে এও খেত না।

ভণ্ডুল বলিল, ওঃ ডিয়ার ডিয়ার। মনে হইল যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতেছে।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে ভণ্ডুল তাদের দুইজনের মাঝখানে বসে। কাজল একটু সরিয়া যায় ভণ্ডুল তাদের বুঝাইয়া দেয় যে এইরূপ বসাই আর্টিষ্টিক। সভ্য শিক্ষিত ইউরোপে এইরূপই হয়।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, দুটি পুরুষ ও একটি মেয়ে থাকলে ?

মেয়েটি মাঝখানে বসতেন।

তাতে তার সোয়ামী রাগ করতেন না ?

হাউ সিলি। ওরা যে লিবরেল। ভেরী উদার।

চারু ধীরে ধীরে বলিল, রক্ষে কর।

ভণ্ডুলকে কাজলের ভাল লাগিত না। কিন্তু টালিগঞ্জ ঘুরিয়া আসিয়া সে মত বদলাইল। তার মনে হইল বিলাত ফেরতের ধরনই হয়ত ঐ রকম। সে এতদিন তার উপর শুধু শুধু অবিচার করিয়াছে।

পরদিন সে চারুকে বলিল, তোর সাহেব বেশ খাসা লোক।

চারু কহিল, ওঃ এতদিনে বুঝলি ? তা একটু দেরি হবে বৈ কি। এ ত আর দুয়ে দুয়ে চারের মতন সোজা নয়। অত বড় লোক।

কাজল একটু হাসিয়া উত্তর করিল, না তোর সাহেব হ'ল দু আর দুয়ে পৌনে পাঁচ।

পাছে প্রসবের সময় কাজলের কোন কষ্ট হয় এই জন্য রথীন যথেষ্ট তোড়জোড় করিল। আগে হইতেই ডাক্তার নার্স ঠিক করিয়া রাখিল। ঔষধ ইন্‌জেকশন, এ্যান্টিসেপ্টিক কোন কিছুরই ত্রুটি করিল না।

কাজল বলিল, এত করছ কেন? হাসপাতাল ত আছে।

রথীন বলিল, সেখানে তেমন যত্ন হয় না।

কিন্তু কাজলের প্রসব হইল অতি স্বচ্ছন্দে। সে নিজেও মাতৃগর্ভ হইতে এইরূপেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। শারদা গোবর দিয়া ঘর নিকাইতেছিলেন, এই সময় কাজল ভূমিষ্ঠ হয়। তার পিসি বলেন, এ যে পদ্মফুল ফুটেছে দেখছি। পদ্মের বেলা বুঝি এমনই হয়? পোয়াতির কেলেশ হয় না।

মেয়ে হওয়ায় কাজলের মন খুঁতখুঁত করে। একে ত মেয়ে, তার উপর আবার কালো। এই কালো রং পাঁচুর কথা মনে করাইয়া দেয়। কাজলের মন খারাপ হইয়া যায়। মেয়েকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে, একটু ফরসা হতে পারলি নে লক্ষ্মীছাড়ী?

মেয়েকে সবার আগে দেখিতে আসে প্রমীলা। সে নার্সকে বলে, কাজুকে বল পিরমিল এসেছে, পিরমিল বাড়িউলি।

অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজল প্রমীলার কাছে কাজু বনিয়া গিয়াছে। সে কখনও বলে কাজু, কখনও কাজরী।

নার্স বলিল, তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছে? বেশ আমি তাহলে অপিক্ষে করি। আমি তার দিদি হই।

পিরমিলের সঙ্গে কাজলের চেহারার কোন সাদৃশ্য না থাকায় নার্স তার দিকে চাহিয়া থাকে। প্রমীলা বলে, কাজু আমার মায়ের পেটের বোন নয় বটে কিন্তু তার চেয়েও বেশী। দিদি বলতে ও অজ্ঞান হয়, আজই নয় রথ আর রথী জুটেছে।

নার্স কহিল, একটু আস্তে কথা বলুন। ওর স্নায়ু এখনও দুর্বল।

সে আবার কি জিনিস? শুনলাম সহজে ছেলে হয়েছে। নাড়ীর আবার কি হল?

নাড়ীর নয়, নার্ভের।

প্রমীলা গম্ভীরভাবে বলিল, ওঃ, আমারও ওরকম হত। যাক্ আমি ততক্ষণ চারুনতার সঙ্গে কথা বলে আসি। ও উঠলে তুমি আমায় খবর দিও—বলিয়া নাকে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে সে চারুর ঘরের দিকে চলিয়া যায়।

খানিকক্ষণ পরে কাজলের ঘুম ভাঙ্গিলে তার ঘরে আসিয়া প্রমীলা বলিল, কি রে কাজরী, তোর নাকি অসুখ করেছে? নাড়ীর অসুখ?

কাজল বলিল, কে বললে?

ঐ ইঞ্জিরী দাই।

কাজল একদিন মাথা ঘুরিয়া বিছানায় পড়িয়া যায়। রথীন সেই দিনই ডাক্তার দেখায়, নার্স রাখে। কাজল মাথা ঘোরার কথা প্রমীলার কাছে আর প্রকাশ করে না। শুধু বলে, ওঁর খেয়াল তাই নার্স রেখেছেন। আমার এমন কিছু হয়নি।

এই জন্যেই ত বলেছে বড় নোক। তোকে ভাগ্যিমন্তি বলতে হবে। একে ত রথী জুটেছে তার উপর আবার মেয়ে পেটে ধরেছিস।

কাজল বলিল, মেয়ে পেটে ধরা কি ভাগ্যি?

আমাদের কথা বলছিলুম। আমাদের মেয়েই ভাল। মেয়ে হ'ল ব্যাঙ্কের টাকার মতন। বুড়ো বয়সে খাওয়ায় পরায়। ছেলে ত উড়ুক্কু পাখী। ডানা গজালেই দে ছুট্।

এই সৌভাগ্যের কথা শুনিলেই কাজলের ভয় হয়। কিন্তু চাকর ও পানওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমীলা ও মণিমালা এমনকি তরুলতা পর্যন্ত সে ভাগ্যের ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে না।

পরদিন প্রিয় আসিয়া বলিল, এ মেয়ে হবে পাঁচুর মতন। পোয়াতিরা যার কথা ভাবে পেটের বাচ্চা তার মতন হয়। অবিশ্যি রথীনবাবুর মতনও হতে পারত। কিন্তু সে আসার আগেই বিধাতা ওর রং গড়ন ঠিক করে ফেলেছিল।

কাজল বলিল, তোরা এতও জানিস।

প্রিয় বলিল, তা আর জানব না? মেয়েলি-শাস্তর সব জানি। কি করে পুরুষ বশ করতে হয়, কি করে গর্ভ নষ্ট করতে হয়, একটু আধটু সবই শিখেছি।

কাজল চুপ করিয়া যায়।

প্রমীলা তাকে চারটা কমলালেবু দিয়াছিল। প্রিয় দিল শিশুর জন্য একখানা পিতলের ঝিনুক। ঝিনুকখানি ভারী সুন্দর। সুবালার এক বাসনওয়ালা বাবুর দোকান হইতে কেনা।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, সুবালা এল না কেন? তার অসুখ করে নি ত?

অসুখ ত দেখি না বরং সুখেই আছে। রোজ নেশা করে। এক কবরেজ জুটেছে, সে মদক খাওয়ায়।

তার ফলওয়ালা বাবু কোথায়?

সে আর আসে না। সুবালা বলে, ফলওলাও হয়ত মশারিওলার মত গাড়ী চাপা পড়েছে।

এ্যাঁ, এই কথা বলে !

ওর মায়া দয়া একেবারে নেই। তোকে ছাড়া কাউকে কখনও ভালবাসেনি, শুধু তোর উপরই কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

কাজল হাসিয়া বলিল, আমার চেয়েও মোদকের উপরই টান দেখছি বেশী।

প্রিয় বলিল, ওঃ বাবা সে কি সোজা মদক ! আমি একদিন এক ডেলা খেয়ে গলা শুকিয়ে যাই আর কি। মনে হচ্ছিল তক্তপোশ সমেত বোঁ বোঁ করে আকাশে ঘুরছি, যেন নাগরদোলায় চড়েছি।

আগে গান ছিল, লেখাপড়া ছিল, রান্না ও ঘরকন্নার কাজও কাজল কিছু কিছু করিত। আজকাল রথীন তাকে কোন কাজই করিতে দেয় না। কাজল বড় জোর উপন্যাস বা সংবাদপত্র পড়িতে পায়। তা ছাড়া বসিয়া বসিয়া চারুর সঙ্গে গল্প করে। কলিকাতা ও দেশের গল্প। চারু নগরীর পতিতা সমাজের বহু দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনা গঞ্জনার ছবি যেন খুলিয়া দেখায়। দুর্ভাগ্য আর চোখের জলে গড়া সেই কাহিনী শুনিয়া কাজলের বুক বেদনায় টন টন করিয়া ওঠে।

চারু কখনও পতিতা পল্লীর কোন ডাকসাইটে বাবুর গল্প করে, কখনও বলে কোন মেয়ের প্রেমের কাহিনী। তাদের এই রাস্তায় এমন মেয়েরা আছে যারা পড়িয়া পড়িয়া প্রেমাস্পদের মার খায়। তবু তার পায়ের তলায়ই পড়িয়া থাকে।

কাজল কহিল, আট নম্বর বাড়ীর রসবতীও শুনেছি এই রকম। এমনি রাগী, বদমেজাজী কিন্তু ভালবাসার বেলায় একেবারে মাখনের দলা।

হঠাৎ সুর করিয়া চারু গাহিল,

পিরিতি জানত ঐছন রূপ
নাগর দেউলে জ্বালত ধূপ।

সে এমনি গান গায় না, সুরও ধরে না। কিন্তু আজ এই সুরের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত সত্তা যেন রণিয়া ওঠে, চোখে সেই সুরের আমেজ, ওষ্ঠে তার ভাষা, গণ্ডে তার লালিমা। কাজলের মনে হয় চারুর চেয়ে সে ছোট, অনেক ছোট। তার মতন প্রেমের অধিকারিণী সে কখনও হইতে পারিবে না।

সে জিজ্ঞাসা করিল, তুই এসব শুনলি কার কাছে ?

মালাদির কাছে। আগে যে বাড়িতে ছিলুম সেই বাড়ির ভাড়াটে। আন্নিতি আর চাটনির কাছে।

কাজল করে পল্লীগ্রামের গল্প, বলে ধুপগঞ্জের কথা, ফুল্লশ্রীর কথা।

চারু জানে না ধান হইতে কি ভাবে চাল হয়। কাজল ঢেঁকিতে ধান ভানার গল্প করে। বলে আগতোলা ও তাদের গ্রামের নবান্নের কথা। পয়লা অগ্রহায়ণে ঘরে প্রথম ধান আনাকে বলে আগতোলা। গৃহস্থ ধান্য লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া আনে। কলাপাতায় ধানের শিষের মোড়ক বাঁধিয়া তার উপর সিদুঁরের পুতুল আঁকিয়া দরজায় টাঙায়। কুলবধূরা তখন উলুধ্বনি দেয়।

নবান্নেই বা ঘটা কত। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া পাখীকে পর্যন্ত নূতন অন্ন খাওয়াইয়া তবে মানুষ সেই অন্ন গ্রহণ করে। পল্লীর এই জীবন কথা শুনিয়া চারু মুগ্ধ হইয়া যায়।

সে অবাক্ হইয়া শোনে পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ ও চাঁদের আলোয় ঝিলিমিলি, মেঘলা দিনে পল্লীর রূপ, খালে নদীতে, দিঘি পুকুরে চলমান মেঘের ছায়ার কথা। মেঘ কখনও জলের উপর শুঁড় বাড়াইয়া দেয়। কোনখানা বা রূপসী যুবতীর মত নিতম্বের ভারে যেন আর চলিতে পারে না।

চারু বলে, আমিও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তাই এসব শুনতে এত ভালবাসি।

কাজল কহিল, তোদের বাড়িও পাড়াগাঁয়ে? কোথায় ভাই?

চারু তখন কোনও জবাব করিল না। পরে একদিন আপনা হইতেই নিজেদের পরিচয় দিল। তারা জমিদারের মেয়ে। বাংলার কোন বিখ্যাত জমিদার বংশে তাদের বাবার জন্ম। তিনি বিবাহ করেন নাই। চারুদের মাকে লইয়াই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাদের জন্ম সোনাবাগানের আট নম্বর বাড়িতে।

শুনিয়া কাজলের মনে হয় চারু তার আরও বেশী আপন। এই সম্পর্কটা কেমন যেন রহস্যময়, এক গ্রামের এক জেলার লোকের নাড়ীর টানের মতন।

চারুরা ছিল চার বোন আর এক ভাই। পতিতার সন্তান বলিয়া সমাজ তাদের স্বীকার করিল না। দেশে স্থান হইল না। তাদের পিতা জমিদারি বিক্রয় করিয়া শেষটায় কলিকাতায় বসবাস করিতেন। প্রথম দুই মেয়ের তিনি ঘটা করিয়া বিবাহ দেন। ঘর বর উভয়ের-ই ভাল। জামাই দুজনেই পাশ দেওয়া। একজন চাকুরে আর একজন কারবারী। বিলাতের সঙ্গে তার লোহার কারবার।

চারু বলিল, তবে তারাও আমাদের মতন। সমাজের বাইরের লোক।

সমাজের বাহিরে জারজদের এই ধরনের একটা উপসমাজ আছে শুনিয়া

কাজলের মনেও আশার আলো ঝিলিক মারে। মনে হয়, তার মীনারও তাহা হইলে একটা গতি হইবে।

তরু ও চারু পিতামাতার শেষ দুই সন্তান। তরুর বয়স যখন আট, চারুর ছয় তখন তাদের বাবা মারা যান। তিনি নগদে গহনায় প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া যান। জুড়ন নামে তাঁর এক বাবু-চাকর ছিল। কর্তার মৃত্যুর পর সে তাঁর স্থান অধিকার করে। চারুদের মাকে ঠকাইয়া শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত লইয়া যায়। দেশে ঘর বাড়ি কেনে, জমি জমা কেনে, কলিকাতায় রেষ্টুরেণ্ট খোলে—জুড়ন কাফে।

টাকার শোকে চারুর মা অল্পদিন পরেই মারা যান, তাদের দাদা সুন্দর ছবি আঁকিতেন, শিল্পী হিসাবে তার খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। তারও অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।

চারু ভাইয়েরও নাম করে না। শুধু বলে, অনেকেই তাকে জানত। আমার ঘরে যে সাগরের ছবি দেখেছিস সেখানা তার আঁকা।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, আর ওখানা? ঐ যে দু'দুটো ছেলে মায়ের মাই চুষছে? চিমষে যাওয়া মাই, হাড়তোলা কানা মা, মা না যেন দুর্ভিক্ষ।

চারু বলে, ওখানাও দাদা এঁকেছে।

চারুর দিদিদের কথা ওঠে। কাজল বলে, কই তাদের ত দেখি না।

ওঃ বাবা, তারা আসবে এখানে? একজনের দাদাশ্বশুরের নামে কলকাতায় রাস্তা আছে। আর একজনের শ্বশুর বড় ডাক্তার। তার ভাসুর মেম বিয়ে করেছে।

কাজল বলে, দিদিদের ত বড় দুখ্‌খু। তোদের দেখতে পায় না।

চারু বলিল, বড়দি আমাদের স্বীকার করে না। দুখ্‌খু মেজদির। মাঝে মাঝে সে তাই চিঠি দেয়। চারু কাজলকে মেজদির একখানা চিঠি দেখায়। সে লিখিয়াছে,

ভাই তরু, ভাই চারু

অনেকদিন তোদের খবর পাই নাই। কিন্তু মন বলে দেয় তোরা কেমন আছিস। সেদিন স্বপ্নে দেখলুম তরু কাসছে। তোর কি কোন অসুখ করেছে, তরু ভাই? যদি করে থাকে তবে ডাক্তার দেখাবি। আমার নাম না করে শ্বশুর মশাইকে দেখাতে পারিস। কলকাতায় কাসি হাঁপানির উনিই সবচেয়ে বড় ডাক্তার।

তোদের জামাইবাবু ভাল আছে। মিণ্টু পিণ্টুও ভাল। মিণ্টুকে স্কুলে দিয়েছি, সে পড়তে চায় না। খালি পাশের বাড়ির খোকনের সঙ্গে খেলে বেড়ায়।

পিণ্টু হয়েছে ভারী লোভী। আজ সরুচাকলি হয়েছিল। তোদের জামাইবাবুর জন্য ঢেকে রেখেছিলুম। পিণ্টু সব খেয়ে ফেললে, এখন অসুখ না করে। শ্বশুরমশাই অবশ্য ওষুধ দিয়েছেন।

তোরা আমার সঙ্গে একবার দেখা করলে ভাল হয়। পরেশনাথের মন্দিরে আসছে বুধবার, বিকেল বেলা। ইতি

মেজদি।

সমাজের ভিতর আর এক সমাজ। গ্রন্থির মধ্যে গ্রন্থি। রসুনের খোসার মত কাজলের চোখের উপর একটার পর একটা পর্দা খুলিয়া যায়।

একটু পরে সে প্রশ্ন করে, আচ্ছা তরুদির কি তখন অসুখ করেছিল?

হ্যাঁ ভাই। ভারী আশ্চয্যি। আমাদের কিছু হলেই মেজদি টের পায়।

কাজলের মেয়ে হওয়ার মাসখানেক পরে একদিন বাদল-বৈকালে সুবালা আসিয়া উপস্থিত। তার গায়ে সুতির চাদর জড়ানো।

কাজল বলিল, কি রে এতদিনে মনে পড়ল?

সুবালা বলিল, মনে সব সময়ই আছিস। একেবারে রাজার মতন।

তবে এতদিন আসিস নি যে? আমার মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করে নি?

তা করেছে, তবে গরীবের ইচ্ছে। একটু থামিয়া সুবালা আবার বলিল, মা কালী এতদিনে ইচ্ছে পূরণ করেছেন তাই এসেছি।

সে ব্লাউজের ভিতর বুকের কাছে হাত দিয়া এক জোড়া বালা বাহির করিয়া কাজলের মেয়ে মীনার হাতে পরাইয়া দেয়।

কাজল বলে, এ আবার কেন?

এই সময় মণিমালা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে সুবালা তাড়াতাড়ি কাজলের মেয়েকে আড়াল করিয়া বসিল।

মণিমালার পয়সা আছে, পয়সার দেমাকও যথেষ্ট। সুবালাকে দেখিয়াই তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। সে কাজলকে জিজ্ঞাসা করে, মিনু আছে কেমন? সর্দিটা কমেছে?

কাজল বলে, হ্যাঁ দিদি।

মণিমালা বলিল, ভাগ্যিস ব্রঙ্কোর দিকে যায় নি

সুবালা না থাকিলে সে হয়ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাজলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিত, কিন্তু হঠাৎ তার জরুরী কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিল, ওঃ বাবা, মৈত্তির মশাই'র সঙ্গে যে আমার এপয়েণ্টো, সন্ধ্যে ছ'টায়।

কাজল বলিল, বেশ।

মণিমালা শুধু এইটুকুতেই খুশি হইতে পারে না। বলে, মৈত্তিরকে জান কাজল? পুলিসের সেজো সাহেব—তারপর আঙুলের পর্ব গুণিতে থাকে, বড়, মেজো, সেজো। হ্যাঁ, মৈত্তির হল সেজো।

সে চলিয়া গেলে সুবালা জিজ্ঞাসা করে, পুলিসের সঙ্গে ওর অত ভাব কিসের রে?

কাজল বলে, তা জানি না। দেখি ত পুলিসের অনেককে, থানার বড় বাবু, মদ অফিসের বাবু, গাড়ী চলার কর্তা, যার হুকুম না হলে রাস্তায় রিক্সা অবধি চলতে পারে না।

সুবালা কাজলের মেয়ের হাত দুখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে নাড়ে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বালা জোড়া দেখে। বলে, মীনা নাম রেখেছিস, বেশ নাম।

আরও পাঁচটা কথা হয়। ওঠে হর্তুকী, রসবতীর কথা। হর্তুকী ওস্তাদ রাখিয়া গান শেখে। রসবতী ভস্ম মাখা এক সাধুর কাছে যাতায়াত করে। তার ধুনচির ছাই আনিয়া কপালে টিপ পরে। আর কেহ চাহিলে দেয় না। বলে, তোদের সহ্য হবে না রে।

কাজল একটু হাসিয়া বলে, শেষটায় সাধু হয়ে যাবে নাকি?

সুবালা বলিল, তা হলেই হয়েছে!

রসি হবে সাধু
কে লুটবে মধু?

কাজল আট নম্বরের আরও পাঁচটা খবর জিজ্ঞাসা করিল। বলিল, ভাতুয়া কেমন আছে?

ভাতুয়া? সে ত মারা গেছে।

কাজল বলিল, এ্যাঁ, ভাতুয়া মারা গেল!

তাড়ি খেয়ে পেট ফুলে উঠল। এখন কাজ করে তার ভাই ছহুয়া।

কাজল সুবালাকে সন্দেশ আনিয়া খাওয়াইল। সঙ্গে দিল পেঁয়াজি ফুলুরি আর বাদাম ভাজা।

সুবালা বলিল, ভাগ্যিস ভাজাগুলো এনেছিলি। তোদের ওসব বড় খানকী

খাবার সন্দেশ রসগোল্লা আমার রোচে না। বাদাম ভাজার সঙ্গে একটা লঙ্কা হলে বেশ হত কিন্তু।

বিদায়ের মুহূর্তে মীনাকে তুলিয়া আদর করিতে করিতে সুবালা হঠাৎ কাজলের মুখে চুমা খায়।

কাজল বলে, তুই একটা আস্ত পাগল।

যাক্‌, তুই এসব কাউকে বলিস নে যেন। চুমো খাওয়ার কথা, গয়নার কথা। গয়না ভোরেই বাক্সে তুলে রাখবি, আজকাল চাকরদের বিশ্বাস নেই—বলিয়া সুবালা একটু ত্রস্তপদে বাহির হইয়া যায়।

মীনা বড় কাঁদে। কাজল মুখে স্তনের বোঁটা পুরিয়া না দিলে চুপ করে না। তাকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে কাজল পিসিমার কাছে শেখা পিঠা বুড়ীর ছড়া আওড়ায়:—

ঘুমো ঘুমো ঘুমো
পিঠে বুড়ী দেবে পিঠে
মুখে দেবে চুমো—
পাটিসাপটা চুসি পুলি
আসবে নিয়ে ভরে ঝুলি
কানের কাছে খেলনা বাজে
ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুমো।

শুনিতে শুনিতে মীনা ঘুমাইয়া পড়ে। মেয়েকে স্তন্য দিয়া কাজল অনির্বচনীয় আনন্দ পায়, সারা শরীরে যেন আমেজ লাগে, তার চোখ বুজিয়া আসে।

কিন্তু রথীনের সামনে কখনও সে স্তন্য দেয় না, তার লজ্জা করে। একদিন মীনাকে শান্ত করিবার জন্য সে বাহিরে যাইতেছিল, রথীন কহিল, যাচ্ছ কোথায়?

কাজল উত্তর করিল, এক্ষুণি আসছি।

এক্ষুণি আসার জন্য নয়, তুমি আমাকে অত লজ্জা কর কেন, বল দেখি?

কাজল ভাবে, এ কি প্রশ্ন? মেয়ে যখন পেটে ছিল তখনই তার লজ্জা করিত। এখন রথীনের সামনে বুক খুলিয়া মেয়েকে দুধ দিবে, সেও কি সম্ভব?

রথীন বলিল, লজ্জা কিসের ? মেয়েদের মাতৃরূপ আমার বড় ভাল লাগে। নারীর মাতৃরূপ খুবই সুন্দর। নিজের রক্ত মাংসে গড়া শিশুকে দয়িতার স্তন্য পান করিতে দেখিলে পুরুষ আনন্দ পায়, কাজল তাহা জানে। কিন্তু তার বুকের শিশু যে অপরের, তাই এত লজ্জা।

রথীন ক্রমে ক্রমে সেই লজ্জা ভাঙিয়া দেয়।

মণিমালা একদিন রথীনের সামনেই কাজলকে বলে, দুধ খাওয়াবার জন্য একটা বোতল কেন কাজল, নইলে যৌবন যে ক্ষয়ে যাবে।

রথীন তখন চুপ করিয়া ছিল। মণিমালা চলিয়া গেলে বলিল, তোমাদের মালাটি বড় ফাজিল। ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়ার চাইতে মায়ের দুধ খাওয়া ঢের ভাল। তাছাড়া তোমার অত দুধ।

কাজল বলিল, ভাগ্যিস মালাদির সামনে ও কথা বল নি, তা হলে ঠাট্টা করত।

রথীন শিশুর জন্য তোয়ালে বিছানা ও দোলনা কেনে, কেনে নানা রকমের পোশাক।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মীনার পশমের সোয়েটার রঙিন আলোয়ান ও টুপি হয়। তাকে আদর করিতে করিতে কাজল এক এক সময় বলে, তুই সত্যিই ভাগ্যমন্তী। আমার মেয়ে তুই, তোর এত পোশাক, এত সাজ সজ্জা।

কাজলের মনে পড়ে শৈশবের কথা। তাদের কারও কোন রকম শীতবস্ত্র ছিল না। শুধু তার বাবার একখানা আলোয়ান ছিল। পাশের গ্রামের কেদার দত্তের শ্রাদ্ধের দান।

মা শীতকালে তার ও তার মেজদা গণেশের গলায় পুরানো কাপড় বাঁধিয়া তাদের রোদে বসাইয়া রাখিতেন। তারা বুদ্ধুর বাবা গোপালের আশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। সে খেজুর গাছ কাটিয়া এই পথ দিয়া যায়। কাজলদের এক কৌটা করিয়া রস দেয়। বলে, রস বামুনের ভোগে লাগলে ভাল হয়, তাই দেই। আশীর্বাদ ক'র কিন্তু।

কাজল আর একটু বড় হইলে তার ছোটভাই খোকন আসিয়া পাশে বসে। তার পর আসে পল্টন।

এক একদিন রৌদ্র লইয়া ভাইবোনে ঝগড়া করিত। খোকন কাজলকে বলিত, তুই বেশী রদ্দুর নিয়েছিস।

কাজল উত্তর করিত, না তুই।

এর পর শুরু হয় বাগানে বাগানে ঘুরিয়া আম করমচা ও খেজুর খাওয়ার পালা। তার সঙ্গী ছিল পাশের বাড়ির অন্ন পিসি। অন্ন তার চেয়ে একটু বড়, ছুরি থাকিত তার হাতে। কাজল চাহিলে অন্ন বলিত, ওঃ বাবা, ছেলে মানুষের হাতে কি ছুরি দেয়? তারা কাঁচা আম পোড়াইয়া সরবৎ খাইত। অন্ন গম্ভীরভাবে বলিত, গ্রীষ্মকালে এ খেলে আর ফোঁড়া হয় না।

কাজল বলিত, তাহলে খোকন পণ্টনের জন্য একটু রাখ ভাই।

অন্ন বলিত, না ওদের সহ্য হবে না। ছোট ত, টক খেলে দাঁত খারাপ হয়ে যাবে।

খোকন পণ্টন আজ নাই। শারদার বহু সন্তান মারা গিয়াছে। কেহ কেহ বড় হইয়াছিল। গণেশের উপরে একজন ভাই ছিল, সে মরিল এগার বছরের হইয়া। খোকন আট বছরে। বহু সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় শারদা খিটখিটে হইয়া গিয়াছেন। বরাবর নাকি এমন ছিলেন না।

কাজলের সবচেয়ে ভাল লাগিত বেতফল। নারিকেলের মালায় খোসা ছাড়ানো বেতফল লইয়া তার উপর নুন ছড়াইয়া দিত। মালার উপর হাত চাপা দিয়া ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ফলগুলি ঘামিয়া উঠিলে সে ও অন্ন চুষিয়া খাইত। মনে হইত যেন অমৃত। আজ কোন জিনিসই তেমন ভাল লাগে না। মনে তখন কি যেন এক পরশ-পাথর ছিল যার ছোঁয়ায় সবই সোনা হইয়া উঠিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরখানি হারাইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন যাবৎ চারুকে বিষণ্ণ দেখাইতেছিল, কেমন যেন মলিন মুখশ্রী, অন্যমনস্কভাব। কাজলের ইচ্ছা হয়, তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে, কি হল ভাই? কিন্তু পাছে সে ক্ষুণ্ণ হয় সেই জন্য কোন প্রশ্ন করে না।

চারু একদিন আপনা হইতেই বলিল, তুই ত পণ্ডিত মানুষ, আমার একখানা চিঠি দেখে দিবি?

কাজল বলিল, হ্যাঁ পণ্ডিত খুবই। কার চিঠি বল্ দেখি?

আমি সাহেবের কাছে লিখেছি।

তাঁর খবর কি? আজ মাস দুই দেখা নেই।

আছে ভাল তবে কাজের বড্ড চাপ পড়েছে, আসতে সময় পায় না; দিল্লী দিল্লী করেই সারা হল।

তোদের জমি কেনার কি হল?

সেবারই কিনেছি, তুই যখন টালিগঞ্জে যাস। জমিটা হয়েছে আমার নামে। তোকে বললুম, তোরা ত নিলি না।

কাজল কহিল, ওঁকে বলতে আমার লজ্জা করে।

কথায় কথায় চারু বলিল, আঠার হাজার টাকার জমি, আমি কুল্লে তিন হাজার টাকা দিয়েছি।

তুই টাকা দিয়েছিস?

বেয়াজিল না কোথায় ওর মোটা টাকা আটকে গেছে। তাতে অবিশ্যি তিন হাজার টাকার জন্য ঠেকে থাকত না। তুই গম্ভীর হয়ে গেলি যে?

না, ও কিছু নয়। তোর দিদি টাকার কথা জানেন?

হ্যাঁ, জানে।

তিনি কি বললেন?

অবিশ্বাস করেছে, অত বড়লোককে বোঝা ত আর সোজা নয়। একটু থামিয়া চারু আবার বলিল, আচ্ছা তুইই কি ওঁকে চিনেছিস?

কি যে বলিবে কাজল ঠিক বুঝিতে পারে না। ভণ্ডুলকে পুরাপুরি অবিশ্বাস করে না অথচ টাকার কথা শুনিয়া কেমন যেন খটকা লাগে। প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের উদ্দেশ্যে সে বলে, টাকাটা দিদির কাছে ছিল বুঝি?

না, মরার সময় মা আমাদের দুজনকে তার গয়না ভাগ করে দিয়ে গেছে।

কাজল বলে, আচ্ছা তোর চিঠি পড়।

চারু পড়িয়া শোনায়—

শ্রীচরণেষু—

শতকোটি প্রণাম পূর্বক সেবিকার নিবেদন এই, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে না, কোন খবরও দিলে না। খবর না পাইলে আমি যে কতদূর চিন্তিতা হই তা তুমি জান না। জানিলে এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিতে না। অন্ততঃ দাসীকে একখানা পত্র দিতে। কলিকাতা হইতে বোম্বাই গেলে। আসিয়া আবার মাদ্রাজ। অথচ একবার দেখা দিলে না। ভয় হয় আমায় হয়ত ভুলিয়া গিয়াছ।

তুমি বড়লোক, সব সময়েই তোমার কাজ তা জানি; কিন্তু যে হতভাগিনী মেঘের আশায় চাতকের মতন তোমার আশায় গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া থাকে, একবার কি তাকে দেখা দেওয়া উচিত ছিল না? এই লিপি পাইয়াই

একবারটি যদি না আস তবে মনে করিব আমার কপাল মন্দ। হীরার খনি পাইয়াও আমি রাখিতে পারিলাম না।

আমার গায়ের গহনা না দেখিয়া দিদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাকে সব বলিয়াছি। সেই জন্য কিছু মনে করিও না। তুমিই বলিয়াছিলে, সদা সত্য কথা বলিবে, সত্য পথে থাকিবে। তোমার পথেই আমি আছি। জানি তুমি আমায় ক্ষমা করিবে, কেননা, ক্ষমাই মহতের লক্ষণ। আমরা ভাল আছি। শ্রীচরণের কুশল জানাইবে। ইতি—

প্রণতা সেবিকা
চারুলতা দাস্যা

চিঠি পড়িয়া চারু প্রশ্ন করে, কেমন হয়েছে ?

হয়েছে খাসা। কাব্যিও করেছিস্ দেখছি, চাতক যেমন মেঘের আশায়—

চারু বলে, কেন কাব্যি করায় দোষ কি ?

কাজল হাসিয়া বলিল, কিন্তু দাসী লিখেছিস কেন ? দাসী, দাস্যা ওগুলো যেন কেমন।

তুই বামুনের মেয়ে তাই তোর কানে বেজেছে। দাস্যা যে আমাদের অভ্যেস। তুই বলিস ত কেটে দি।

চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরে বেলা নটা আন্দাজ—'ট্রা লা লা, লা লা লা" সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ভণ্ডুল আসিয়া উপস্থিত। তার হাতে একটি সুটকেশ, পিছনে কুলির মাথায় হুইস্কি ও সোডার বোতলের কেস আর একজন মুটের ঝাঁকায় ল্যাংড়া আম ও খাবারের চাঙারি।

নিচেই কাজলের সঙ্গে দেখা। তার কোলে মীনা। তাদের দেখিয়া ভণ্ডুল বলিয়া ওঠে, ওঃ ডিয়ার ডিয়ার। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাঙারি হইতে লাল একটা বল ও গোটা দুই সন্দেশ বাহির করিয়া মীনার হাতে দেয়। মীনা তার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া বলটি চুষিতে আরম্ভ করে।

চারু ঘরে বসিয়াই ভণ্ডুলের গলার আওয়াজ শোনে। তার বুক ঢিব ঢিব করে কিন্তু সে বাহিরে আসে না। ভাবে অভিমান করিবে।

ঘরে ঢুকিয়াই ভণ্ডুল ডাকিল, হ্যালো চকলেট গার্ল, নীলাটা ল্যাকি ত ?

গতবার ভণ্ডুল চারুকে একটা নীলা বসানো আংটি দিয়া যায়, লোকের বিশ্বাস ধারণকারীর সহ্য হইলে নীলা তাকে রাজা করে, সহ্য না হইলে পথের ফকির।

নীলা কোন সৌভাগ্যই আনে নাই বরং চারুকে দুঃখ দিয়াছে। ভণ্ডুল দীর্ঘ দিন না আসায় চারু মনে করিয়াছিল আংটিটা খুলিয়া রাখিবে।

সে ফিরিয়া আসায় চারুর মত বদলাইল কিন্তু সে কোন জবাব দিল না।

ভণ্ডুল আবার বলিল, হ্যালো স্যুইট গ্যুজ।

চারু তথাপি নীরব।

ভণ্ডুল এইবার সুর ধরিল, আই লাভ ইউ—দীর্ঘ উর সেই মন ভোলান তান। এই সুর চারুর মনে একটা আমেজের সৃষ্টি করে। সে ত্রস্ত ফণিনীর মত তাকায়, বলে, নীলাটা বেশ ভাল।

ভণ্ডুল প্রথমে তাকে এক বাক্স চকলেট দেয়। তার পর এক টাকার নোটের কয়েকখানা বই। তার প্রত্যেকটিতে কড়কড়ে নূতন পঁচিশখানা করিয়া নোট।

দুপুরে তরু জিজ্ঞাসা করিল, চারুর জমির কি হল ?

ভণ্ডুল পকেটের মধ্যে হাত দিয়া বলে, হিয়ার ইট ইজ।

তরু বোঝে না, হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।

ভণ্ডুল বলে, ওঃ ডিয়ার ডিয়ার, আই মিন ডকুমেণ্ট। জমির দলিল পকেটেই আছে। এবার আপনার কাছে রেখে যাব ভাবছি। আজ ব্রজিল, কাল ডারবান এই ক'রে ক'রে কখন হারিয়ে যায়।

তরু খুশি হইয়া বলিল, ও চারুর কাছেই থাক, তার জিনিস।

এ্যাজ ইউ লাইক ইট,—বলিয়া ভণ্ডুল ঘাড় বাঁকাইয়া তরুর দিকে তাকায়।

তৃতীয় দিনে চারুর ঘরে সে এক পার্টি দিল। পার্টিতে সোনাবাগানের পটল আসিল, বিখ্যাত খ্যাঁদা পটলি। আর আট নম্বর বাড়ির হর্তুকি।

খোঁড়া মানুষ, পা টানিয়া হাঁটে কিন্তু হর্তুকির প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পায়—খোঁড়া হলেও আমি গাইয়ে। মুজরোয় আমার নেমন্তন্ন হয়।

পটল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ভণ্ডুলকে দেখিয়া বলিল, আমার জন্য সাম্পান আনাবেন কিন্তু। নিদেন সিরি। হুস্কি বেরাণ্ডি আমার সহ্য হয় না। তবে সর্দি হলে মাঝে মাঝে বেরাণ্ডি খাই।

ভণ্ডুল তার কাঁধে হাত রাখিয়া বলে, দ্যাটস ও কে, ওল্ড হাসি।

পটল কহিল, আমি হাসি নই, পটল। আমায় ওল্‌ডো বললেন যে ? সবে বত্রিশ পেরিয়ে—

অল রাইট, স্যুইট থার্টিথি। ডবল স্যুইট সিক্সটিন—বলিয়া ভণ্ডুল পটলের পিঠ চাপড়াইয়া দেয়।

পার্টিতে অনেকেই আসে। রঘু, বৃদ্ধ দীনদালাল আর রঘুর নূতন এক বন্ধু

মিষ্টার চৌড্রি বা চৌধুরী। চৌধুরীর বয়স খুব কম। একরূপ কিশোর বলিলেই চলে। সে জমিদারের ছেলে। রঘুর চাপে পড়িয়া নূতন মদ ধরিয়াছে।

বৈঠকে তরু ও হর্তুকি গান গায়। পটল নাচে। মদের মুখে হর্তুকির খেমটা গান শ্রোতাদের বেশী ভাল লাগে।

রগীন কলিকাতায় ছিল না। বাদায় জমিদারিতে গিয়াছিল। বৈঠক শুরু হওয়ায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাজল আসিল। কিছুক্ষণ থাকিয়া সে উঠিতে চাহিলে ভণ্ডুল বলিল, হোয়াই হারি? অন্ততঃ পটলের একখানা নাচ দেখে যান!

দীনদালাল বলিল, নিশ্চয় দেখবেন। পটল বিবি সোনাবাগানের ড্যান্সস্ট্রেস নম্বর ওয়ান, ওর নাচের সঙ্গে হর্তুকির গান একেবারে সোনায় সোহাগা।

হর্তুকি কাজলের দিকে তাকায়, সে যেন বলিতে চায়, দেখলি ত?

পটলের নাচের সঙ্গে সঙ্গে হর্তুকি গান গায়, দীন তাকিয়ায় ঠেকা দেয়, চৌধুরী দেয় শিস। সকলে এক সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া উঠে, হুররে।

নাচ শেষ হইলে কাজল উঠিয়া আসে। ঘরের বাহিরে আসিয়াই আমের খোসায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। সে চাপা গলায় বলিয়া ওঠে, বাবাগো।

শব্দটা ভণ্ডুলের কানে গিয়াছিল। সকলের আগে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখে, কাজল উঠিতে পারিতেছে না।

ভণ্ডুল জিজ্ঞাসা করিল, খুব লাগল, এঁ্যা? ওঃ মাই ডিয়ার।

কাজল বলিল, না এমন কিছু নয়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িয়া গেল যে আঘাতটা গুরুতর। চেষ্টা করিয়াও সে উঠিতে পারিল না।

ভণ্ডুল তাকে চ্যাং-দোলা করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তার দৃঢ় বাহু বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া কাজলের মনে হইল, বেঁটে খাটো হইলেও ভণ্ডুল মানুষটি যেমন শক্তিমান তেমনি তৎপর। সে চোখ বুজিয়া ছিল, চাহিয়া দেখিল ভণ্ডুল তার কপালের কাটা দাগের দিকে চাহিয়া আছে। ভারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কাজল আবার চোখ বুজিল।

এই আঘাতের ফলে সে আট-দশ দিন ভোগে। ডাক্তার ডাকিতে হয়, কয়েকদিন জ্বরও হয়।

ভণ্ডুল এবার লাল বল, খেলনা ও রেলগাড়ী দিয়া কয়েক দিনেই মীনাকে

আপন করিয়া ফেলে। তাকে দেখিলেই মীনা তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তরু এবং মণিমালা কি এক মন্ত্রবলে যেন বশীভূত হইয়া যায়।

যাওয়ার দিন ভণ্ডুল চারুকে দু'শ টাকা ও পাথর বসানো একটি আংটি দেয়। বলে, পাথরখানার নাম বেড়াল চোখ, ক্যাটস আই।

চারু জিজ্ঞাসা করে, এতে কি হয়?

এটা লভষ্টোন। ভালবাসা এতে দৃঢ় হয়।

চারু বলে, দু-জনেরই?

ইয়েস ডিয়ারি।

ভণ্ডুল জমির দলিলও দিতে চাহিল। চারু নিল না। বলিল, তোমার কাছে থাক।

বিদায়-মুহূর্তে ভণ্ডুল চারুর ঘাড়ের নিচে সুড়সুড়ি দেয়। তার ঘাড়ে চুমা খায়, মনে হয় যেন ক্লিপ দিয়া চামড়া আঁটিয়া ধরিয়াছে।

সে চলিয়া গেলে চারু কয়েকটা দিন স্বপ্নাবিষ্টের মত কাটাইল। কাজলকে বলিল, জানিস, সাহেব এবার ক্যাটস আই দিয়ে গেছে?

না ভাই, সে আবার কি?

ভালবাসার পাথর।

শয্যাশায়ী কাজল তার হাত ধরিয়া বলিল, তোর এই ভালবাসা অক্ষয় হোক, ভাই।

কয়েক মাস পরের কথা। মীনা ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি দিতে শেখে, হামা দিয়া জানালার কাছে আসে। জানালার ভিতর দিয়া রোদ পড়ে, সে হাত বাড়াইয়া মুঠায় মুঠায় রোদ ধরিতে চায়। রোদের মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতন বালুকণার দিকে চাহিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে চড়ুই পাখী উড়িয়া আসে। মীনা ডানার মতন করিয়া হাত দুখানা নাড়ে।

কাজল ও রথীন এই খেলা দেখে, লক্ষ্য করে শিশুমনের ক্রমবিকাশ। রথীন বলে, মীনু খুব বুদ্ধিমতী হবে।

মীনা থির দিয়া দাঁড়ায়। তার পর হাঁটি হাঁটি পা-পা। কথা ফুটিলে কাজলকে সে হাম্‌মা বলিয়া ডাকে। রথীনকে বলে, বাব্‌বা।

রথীন বিব্রত বোধ করে। বলে, বল্‌ কাক্‌কা।

মীনা হাসিয়া বলে, বাব্বা।

সে 'ক' বলিতে পারে না।

একদিন কাজল তাকে এই 'ক' বলা শিখাইতেছিল এই সময় চাকর লখিয়া আসিয়া বলিল, একঠো আদমী তুমহার সাথ দেখা করতে চায়, দিদিমণি।

কাজল বলিল, তাকে বলনি যে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না?

হামি ত কইলাম। লেকিন উ শুনবে না। উ বাভন আছে। তুম্‌হার দেশোয়ালি বাভন।

দেশের লোক! কে সে? তাকে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? কাজল কহিল, না না, বলে দাও দিদিমণি কারও সঙ্গে দেখা করে না।

তোর গলা শুনে নিজেই উপরে উঠে এলাম—বলিতে বলিতে গণেশ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। গলায় কাছা, চুল উস্কখুস্ক, হাঁটুর উপর পর্যন্ত ধূলায় ঢাকা।

আকস্মিকতার প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে কাজল বলিল, বাবা, না মা?

বাবা।

বাবা!—রেলিং ধরিয়া কাজল গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গণেশ চোখের পলকে ভগ্নীর ঘরের মূল্যবান আসবাবপত্র দেখিয়া লয়। তার সচ্ছলতা দেখিয়া খুশি হয়।

কাজল দাদাকে ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে গেলেন? কি হয়েছিল, শেষ অবধি জ্ঞান ছিল ত? আমার কথা—

গণেশ বলে, তুই যে কথার ঝড় বইয়ে দিচ্ছিস। বাবা গেছেন আজ সাত দিন। পরশুর পর দিনই ঘাট। বামুনের শ্রাদ্ধ, ছেলেরা একটু দম ফেলারও সময় পায় না।

কাজল বলে, কি হয়েছিল?

কব্‌রেজ বলেছে যক্ষ্মা। যক্ষ্মা না হাতী!

বাবার যক্ষ্মা হয়েছিল!

যে অসুখ-ই হক্ কলকাতা থেকে গিয়ে তার সূত্রপাত। এখানে তোর খোঁজ করতে এসেছিলেন। তুই বোধ হয় জানিস না। ফিরে গিয়ে জ্বর কাশি। প্রথমে কাউকে বলেন নি, সব সময় একটা বিরক্ত ভাব। কুক্-কুক্ থক্ থক্ করে কাসতেন আর বলতেন, মা তারা ব্রহ্মময়ী। শেষের দিকে বড্ড ভুল হত, ভোলেন নি শুধু তোকে।

শুনিতে শুনিতে কাজলের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। সে জিজ্ঞাসা করে, চিকিৎসা হয়েছিল ত?

হ্যাঁ হয়েছিল। দূর্বা বাসক পাতা বিশল্যকরণী ও ইন্‌জেকশন কিছুই বাদ যায়নি। ক্যাল্‌সিয়াম ইন্‌জেকশন। তবে জানিস ত অবস্থা, ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।

কাজল জানে সবই। বোঝে যে দুই-একটা ক্যাল্‌শিয়াম ইন্‌জেকশন ও দূর্বা বাসকের রস ছাড়া কোন চিকিৎসাই হয় নাই। তার মনে পড়ে পিতার দীর্ঘ ঋজু মূর্তি, মনে পড়ে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ বৃদ্ধের কাতর চাহনি। সে বলে, তিনিই বোধ হয় টাকা পাঠিয়েছিলেন?

গণেশ বলিল, টাকা! টাকা কিসের?

সে কিছু নয়। যাক, বাড়ির আর সবাই আছে কেমন? মা, গোরা—

আছে ভাল। টাকাটা কিসের বল্ দেখি?

আমি চিঠি লিখেছিলাম। বাবা তার জবাব দেন নি। জবাব দিলেন মা। তার পর ডাকে ত্রিশটা টাকা পেলাম। এখন বুঝলাম বাবাই পাঠিয়েছিলেন। ঐ টাকাটা না পেলে আমি বাঁচতুম না।

গণেশ বলিল, জমি বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছিলেন। টাকাটা হারিয়ে যায়। এখন ব্যাপারখানা বুঝতে পারছি।

কাজল কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, গোরা কি আমায় মনে করে?

নিশ্চয়ই। তোকে কি সে ভুলতে পারে? তোর নাম ক'রে ঘুমের মধ্যে কাঁদে।

কাজল বলে, কাঁদবেই ত। কী ভালই না বাসত!

আগমনের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে না পারিয়া গণেশ কেমন যেন উসখুস করিতেছিল। কাজল উহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ। শ্রাদ্ধের টাকার জন্য মা ও তোর বৌদি আমায় তোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পাঠালেন আমার কাছে?

হ্যাঁ।

হুঁ! তা বৌদি কি বললেন?

সে তোকে বড্ড ভালবাসে কিনা। বললে, কাজল যুগ্যি ভাই'র মতন। তার কাছে যাও।

তার যোগ্যতার খবর ধূপগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছিল কি করিয়া কাজল তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই খবর পাইয়া বৌদি টাকার জন্য পাঠাইয়াছে। অথচ এই বধূটিই তার ঘর ছাড়ার প্রত্যক্ষ কারণ। ধূপগঞ্জের পাশের গ্রাম শোভনায় তার পিত্রালয়। একদিন পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া সে বলিল, মা আর আমাকে এখানে পাঠাতে চান না।

শারদা বলেন, কি দোষে শুনি?

ঠাকুরঝির নামে পাঁচটা কথা উঠেছে। এজন্য আমার বাপের বাড়ির ওদেরও হয়ত এক ঘরে হতে হবে।

জলন্ত তেলে যেন ফোড়ন পড়ে। শারদা গর্জন করিয়া ওঠেন, ওরে আমার সোহাগ রে! তোর মা মাসীর গুণের কথা দেশশুদ্ধ কারও অজানা নেই।

বধূও সমানে জবাব দেয়, শুধু শুধু মা-মাসী তুলবেন না বলছি। মা-মাসী আপনারও আছে।

তবে রে ছোট লোকের মেয়ে। আমারও মা আর তোরও মা—বলিয়া শারদা বধূকে তাড়া করিয়া যাইতেই গণেশ আসিয়া মাঝখানে পড়ে।

শারদা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এঁ্যা, তুই আমায় মারলি। বৌ'র পক্ষ হয়ে মারলি! তার পরেই, ওরে আমার কি হবে রে? কি ছেলে পেটে ধরেছিলুম রে—বলিয়া কাঁদিতে শুরু করেন।

শাশুড়ী ও বধূ দুজনেরই সেদিন খাওয়া হয় না। গণেশ পাঁচুর বাড়ি খাইয়া আসে। রাত্রে সাধ্য সাধনা করিয়া স্ত্রীকে ভিজা মুগ ও নারিকেল খাওয়ায়। বেড়ার ফাঁক হইতে উহা দেখিয়া বিগত যৌবনের জন্য শারদার দুঃখ হয়। যৌবন থাকিলে গণেশের বাবাও কি না খাওয়াইয়া পারিত?

মেয়ের পক্ষ হইয়া শারদা বধূর সঙ্গে কলহ করিলেন বটে কিন্তু ঐ ঘটনার দু' একদিন পরেই কাজলকে বলিলেন, তোর জন্য ছেলে-বৌ, জ্ঞাত-কুটুম সব হারাতে হবে দেখছি।

কাজলের আজ মনে পড়ে সেই সব কথা। সে দাদাকে বলে, আমি কি করব বল দেখি? টাকা ত আমার কাছে নেই।

গণেশ যেন আকাশ হইতে পড়িল এঁ্যা, তোর কাছে টাকা নেই! সে কী?

কাজলের মনে মনে রাগ হয়। গণেশ আপনা আপনিই বলিতে থাকে, এমন দুর্ভাগা হয়ে জন্মেছি যে বাপের কাজটাও করতে পারব না।

একটু ভাবিয়া কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কত লাগবে?

এই ধর্ শ দুই টাকা।

ঠিক তোমায় কথা দিতে পারি না। তবে একবার কাল এস, আমি চেয়ে দেখব। আর এই পাঁচটা টাকা নাও, হবিষ্যের জন্য—বলিয়া কাজল ভাইয়ের হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দেয়।

গণেশ কিছুটা আশ্বস্ত হইয়া বলে, ফর্দটা তোকে একবার দেখিয়ে যাব।

কাজল বলে, তার দরকার নেই।

গণেশ চলিয়া গেলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ভাবে, দাদা এতটা কাঙাল বনিয়া গেল কেমন করিয়া? তাদের বাবা গরিব ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে ত কোন কাঙালপনা ছিল না।

বৈকালে রথীন আসিয়া দেখে যে কাজল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। শুষ্ক মুখ, চোখের পাতা বৃষ্টির পরের ভিজা ফুলের পাপড়ির মত ভারী, মাথার চুল বিস্রস্ত। রথীন তার পিঠে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

কাজল একটু সরিয়া গিয়া কহিল, এঁ্যা, ছুঁয়ে দিলে! আমার যে অশৌচ। বাবা মারা গেছেন।

কবে? কি হয়েছিল তাঁর?

গেছেন আজ সাত দিন। আমার শোকে। আমি ঘোর পাপী কিনা।

দু'জনেই নীরব। খানিকটা পরে কাজল আপন মনে বলিতে থাকে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। তিনি অভিমান করে চলে গেছেন।

রথীন বলিল, ভারী ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। একটি বার মাত্র দেখেছি কিন্তু আমার মনে তিনি ছাপ রেখে গেছেন। অমন সরল চাহনি, সাদাসিধে এক্সপ্রেশন আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

কাজলকে সে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়। সে খায় নাই শুনিয়া ফল মিষ্টি দুধ আনাইয়া যত্ন করিয়া খাওয়ায়।

তরুর ঘরে কোন লোক ছিল না। রথীন তাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, সেই গানটা একবার গাও ত তরুদি,

হে মহাজীবন, হে মহামরণ।

তরু গায়। রথীন বলে, এটা শুনলে মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

গান হয় আরও তিন চারটা। সবই শোকের গান, আত্মনিবেদনের গান।

গান শেষ হইলে তরু বলিল, জানেন ত, আমার গানের রেট আজকাল ঘন্টায় দশ টাকা ক'রে?

রথীন চলিয়া গেলে কাজলের মনে হইল টাকার কথা ত বলা হয় নাই। শেষটায় তার মনে ছিল না। মনে থাকিলেও বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। প্রথমটায় মনে ছিল। কিন্তু কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিয়াছে। রথীনের আদর যত্নে সেই সঙ্কোচ আরও বাড়িয়া যায়। যে এতটা যত্ন করে তার কাছে ভিক্ষা চাওয়ার অর্থ যত্নের অমর্যাদা করা।

এদিকে দাদাকে কাল আসিতে বলিয়াছে। সে আসিয়া ঘ্যানর ঘ্যানর করিবে।

শোকে দুঃখে দুর্ভাবনায় কাজলের মনটা তোলপাড় করিতে থাকে। সারা রাত ঘুম হয় না। ভাবে, ছেলে হইলে যে রকমে হোক পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারিত। জন্মিয়াছে মেয়ে হইয়া, বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ে। তাও কলঙ্কিনী।

পরের দিন সকালে উঠিয়া সে কালীঘাটে যায়। আবক্ষ গঙ্গায় দাঁড়াইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া পিতার মূর্তি স্মরণ করিয়া ডুব দেয়। স্নানান্তে মন্দিরে মাতৃমূর্তি দর্শন করে। তারপর নকুলেশ্বর মহাদেবকে। পথের দুই ধারের হিন্দু মুসলমান ভিখারীকে দেয় এক একটি করিয়া দু'আনি।

তারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করে।

ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য কয়েকটি টাকা পূর্ব দিন রাত্রেই সে হারাধনের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল। কাজল ঘাট হইতে ফিরিলে মণিমালা বলিল, বামুন ডেকে মন্তর পড়েছিস ত ?

না।

কেন ? গঙ্গার ঘাটে অনেক বামুন থাকে, মন্তর পড়ে, অস্থি দেয়।

ভয় হল, আমি মন্তর পড়লে পাছে বাবার অকল্যাণ হয়।

মণিমালা বলিল, অকল্যাণ কেন ? আমরাও মানুষ। তোর দাদা যেমন, তুইও তেমনি তোর বাবার সন্তান।

বেলা তিনটা। কাজল ভাতে ভাত চড়াইয়া দিয়াছে, হবিষ্য করিবে। এই সময় গণেশ আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, বেশ, বেশ, বামুনের মেয়ের এই ত কর্তব্য। ভাত ফুটুক, তুই ততক্ষণ ফর্দটা শোন্।

দরকার নেই, কালই বলেছি।

তোর টাকায় কাজ, তুই ফর্দ শুনবি না, সে কি হয় ?

আমার টাকা হলেও শুনতাম না। তাছাড়া টাকা আমি দিতে পারছি না।

কেন, কেন ?

তার আশ্রয়দাতার কাছে টাকা চাইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে, দাদার নিকট সেটুকু বলিতেও কাজলের বাধ বাধ ঠেকে। তাকে নীরব দেখিয়া গণেশ বলে, এখন উপায় !

আমার টাকায় বাবার শ্রাদ্ধ না করাই উচিত।

গণেশ বলিল, টাকায় কোন দোষ স্পর্শে না। সোনা হলেন অপাপবিদ্ধ। গীতায় আছে, অচ্ছেদ্যোহয়ং, অদাহ্যোঽহং—শ্রীকৃষ্ণ সোনার সম্বন্ধে বলেছেন।

বেশ, তাহলে সোনাই নিয়ে যাও—বলিয়া কাজল রথীনের দেওয়া দু'গাছা আর্মলেট খুলিয়া দেয়। বলে, এতে কুলুবে ত ?

তা কুলুবে'খন—বলিয়া গণেশ গহনা জোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে। নাড়িয়া চাড়িয়া ওজন অনুমান করিয়া লয়।

সাধন অনেকদিন আসে নাই। প্রায় দুই মাস পরে একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার চোয়ালের হাড় আরও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। গায়ের রং আগের চেয়ে ফ্যাকাশে।

রথীন বলিল, কি খবর, একেবারে ডুব মেরেছিলেন যে ?

সাধনের প্লুরিসি হইয়াছিল, ড্রাই প্লুরিসি। সে কথা জানাইল না। শুধু বলিল, শরীরটা ভাল ছিল না।

আগে সে প্রায়ই রঘুর সঙ্গে তরুর গান শুনিতে আসিত। তাছাড়া কখনো কখনো নিজে একা আসিয়া রথীন ও কাজলকে কবিতা শুনাইয়া যাইত। কোনটা গদ্য, কোনটা বা ছান্দোবদ্ধ। একদিন রথীন তাকে বলে, এটা বোধ হয় আপনার লাইন নয়, মিঃ ভড়।

সাধনের মুখ একেবারে কালো হইয়া যায়। এঁ্যা, কবিতা, আমার লাইন নয় ?—বলিয়া সে রথীনের দিকে চাহিয়া থাকে।

সেই হইতে সে আর আসে না, রঘুর সঙ্গেও নয়।

চৌধুরীর মদ খাওয়া লইয়া রঘুর সঙ্গে সাধনের মন কষাকষি হয়। চৌধুরীর মদ সহ্য হয় না। দু' চারদিন মদ খাওয়ার পরই তার স্নায়ুদৌর্বল্যের লক্ষণ

প্রকাশ পায়। হাত কাঁপিতে আরম্ভ করে। অনেক সময় চায়ের কাপ ধরিয়াও ঠিক মতন চুমুক দিতে পারে না। এক একবার চা চলকাইয়া পড়ে। হাতের সই বাঁকা হইয়া যায়।

একদিন সাধন রঘুকে বলে, বিভূতি চৌধুরীকে আর মদ খাইও না।

রঘু উত্তর করে, বোগাস, মদ কি শুধু তোকেই খাওয়াতে হবে নাকি?

তার কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকায় পায়। সাধন এই উষ্মার কারণ বুঝিতে পারে না। বলে, ছেলেমানুষ, মদ ওর সহ্য হয় না। তাই বলছিলুম।

মদের আবার বয়েস আছে নাকি? হেঃ হেঃ, ও চলে সবার।

সাধন বলিল, ডাক্তার নাকি ওকে নিষেধ করেছে।

তা ত করেছে। কিন্তু ওকে খাওয়ালে তবু রিটার্ণ পাওয়ার আশা আছে। পালটা খাওয়াতে পারবে। তোকে খাইয়ে লাভ? ভেবেছিলুম নাম করা একটা কবি হবি। বোগাস—

এই বোগাসের মধ্যে রাজ্যের বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। রঘু যে তাকে এতটা ছোট মনে করে সাধন তাহা জানিত না। সেই হইতে সে আর তার সঙ্গে মেশে না।

আগে সে আসিলেই রথীন প্রশ্ন করিত, নতুন কিছু লিখলেন নাকি সাধন বাবু? আজ সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তার বাধ বাধ ঠেকে।

পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই সাধনই আপনা হইতে বলে, রথিবাবু, আজও একটা কবিতা আছে কিন্তু—বলিয়াই প্রাণ খোলা হাসি হাসে। রথীনের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া যায়। সে বলে, কবিতা আপনার হয় না এটা বলা আমার ভুল হয়েছিল। আপনার কাজল একটা হাই ক্লাশ কবিতা।

সাধন বলিল, সেটা ত ভাল হবেই। ওঁর মতন সুন্দরীর উদ্দেশে লেখা, তাতে সিন্‌সিয়ার টোন ছিল।

কাজলের মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া গেল। এই সময় পাশের বাড়িতে সান্ধ্য শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে সে বলিল, আমার একটু ছুটি চাই। সাধন বলে, সে ত জানি। এ আপনার পুজো আহ্নিকের সময়।

কাজল কহিল, পুজো আহ্নিক আর কোথায়? ঠাকুরের সামনে শুধু দুটো ফুল দেই।

সেও ত পুজো, ভক্তির সঙ্গে যা করা হয় তাই পুজো।

কিছুক্ষণ পরে গা ধুইয়া লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়া কাজল আবার ঘরে ঢোকে, তার হাতে একখানা রেকাবিতে কিছু ফুল, ফল ও মিষ্টি।

ঘরের কোণে লক্ষ্মী নারায়ণের আসন। সোনাবাগানের বাড়িতেও এইরূপ আসন ছিল। কাজল আসনের সামনে বসিয়া ধূপ ধুনা দেয়। বলে,

'পাপ তাপ দুঃখ নাশন হে
জয় সত্য সনাতন সুন্দর হে।'

ধুনার গন্ধ ও কাজলের মিঠা সুরে ঘরখানা ভরিয়া যায়। সাধনও মনে মনে আওড়ায়,— 'জয় সত্য সনাতন সুন্দর হে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কাজল সাধন ও রথীনের হাতে ফুল ও প্রসাদ দেয়। প্রসাদ মুখে দিয়া রথীন বলে, ভগবানে কিন্তু আমার বিশ্বাস নেই। তবে কাজলের প্রসাদগুলো ভাল।

কাজল কহিল, ছিঃ, ঠাকুরকে অবিশ্বাস!

রথীন বলে, বিশ্বাস আমার নেই হয়ত এ যুগের ছেলে বলে।

কাজল বলিল, ভগবানেরও আবার যুগ!

রথীন বলিল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমন যুগ আসা বিচিত্র নয় যখন ভগবানও অচল হয়ে যাবেন।

সাধন বলে, এ কথাটা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না রথীনবাবু যে পুজো করতে বসলে ওঁকে ভারী সুন্দর দেখায়। দেখলে ভগবানে বিশ্বাস যেন আপনা আপনিই এসে পড়ে।

রথীন হাসিয়া বলিল, আই অ্যাম গ্রোইং জেলাস, সাধনবাবু।

সাধনের প্রশংসা কাজলের কানে বিদ্রূপের মত বাজে। সে মনে মনে ঠাকুরকে বলে, আমার এটুকু অন্ততঃ বজায় রেখ। এই অবস্থা।

সাধনের কথায় বেশী খুশি হয় রথীন। তার মনের গোপন কোণে নারী সম্বন্ধে একটা কল্পনা ছিল। নারী হইবে ধীর শান্ত মহিমময়ী যার স্নিগ্ধ বুকে যাইয়া মানুষ শান্তি লাভ করিতে পারে। রথীন কাজলের মধ্যে সেই আদর্শ নারীর সন্ধান পাইয়াছিল।

ঠাকুরের ফুল মাথায় ছোঁয়াইয়া, আলগোছে একটু প্রসাদ মুখে দিয়া কাজল সাধন ও রথীনের জন্য চা ও খাবার লইয়া আসে।

তার রান্না করে এক বামুন ঠাকরুন, তবে কাজল রোজই নিজের হাতে রথীনের জন্য কিছু না কিছু খাবার তৈরি করে। আজ করিয়াছিল কড়াই

শুঁটির কচুরি ও ছোলার হালুয়া। খাইয়া সাধন বলিল, দু'টোই খাসা হয়েছে। এ বরফিটা কি দিয়ে করেছেন ?

ওটা ছোলার ডালের হালুয়া।

ডালের আবার হালুয়া হয় নাকি ? এ ত জানতুম না।

কাজল বলিল, আপনি বাড়িতে তৈরি ক'রে নিতে পারেন। তৈরির নিয়ম লিখে দেব ?

পুঁথির বিদ্যেয় রান্না হয় না। মাসীমার একবার শখ হল মাছপাতুরি রাঁধবেন। তিনি বই পড়ে যা রাঁধলেন তা মাছপাতুরি হল না, হল মাছ পাথরি। একেবারে অখাদ্য।

কাজল বলিল, আমি পরিষ্কার করে লিখে দেব'খন। আপনি এখন লেখা পড়ে শোনান।

সাধন পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিতে করিতে বলে, এ কবিতাটা আপনার বাবার উদ্দেশে লেখা।

কাজলের চোখ দুটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সে বলে, বাবার উদ্দেশে ? কিন্তু তাঁকে ত আপনি দেখেন নি।

দেখিনি, কিন্তু শুনেছি ত রথিবাবুর কাছে। ওঁর ভিতর একটা কবি প্রাণ আছে, সেই দরদ দিয়ে উনি আপনার বাবাকে আমার চোখের উপর উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন।

কাজল কহিল, উনিও দেখেছেন মাত্র একদিন। যাক্‌, আপনি পড়ুন।

সাধন কবিতা পড়িতে আরম্ভ করে। কবিতাটির নাম ব্রাহ্মণ।

কাজল ও রথীনের কাছে রামলোচন সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু শুনিয়াছিল তার উপর রং চড়াইয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নিজের আদর্শের ছাঁচে ঢালিয়া সাধন এই কবিতাটি লিখিয়াছে। খাড়া করিয়াছে স্নেহময় কর্তব্যনিষ্ঠ তেজস্বী অথচ ক্ষমাশীল সত্যসন্ধ এক মূর্তি।

কাজলের পিতা রামলোচন স্নেহময় ও ক্ষমাশীল ছিলেন। সাধনের কবিতার সঙ্গে তার সেইটুকুই মিল। তাছাড়া আর কোন সাদৃশ্য নাই।

কবিতাটা শুনিয়া রথীনের চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে কাজলের পিতার দীর্ঘ ঋজু মূর্তি। সরল চাহনি। মনে পড়ে বৃদ্ধের সেই প্রশ্ন, আপনি কি ঠিক জানেন যে কাজল এখানে থাকে না ?

কন্তার শোকে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কাছে মিথ্যা বলার জন্ম রথীনের অনুশোচনা হইতে লাগিল।

শুনুন আর একটা কবিতা—বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই সাধন আবার পড়িতে আরম্ভ করে। কবিতাটির নাম রাজার বানর। মানুষের উপাধি প্রিয়তা লইয়া স্যাটায়ার।

কাজল বলিল, আমি ত শুনি নি।

সাধন লেখা লইয়া আসে, আগ্রহ করিয়া শুনাইতে চায় আর কাজল তাহা কানেও তোলে না। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! সে মুখ কালো করিয়া রথীনকে প্রশ্ন করিল, আপনি শুনেছেন?

রথীন উত্তর করে, হ্যাঁ, বেশ লেগেছে।

কিন্তু তার উত্তরের ধরনে সাধনের মনে হয়, সে শুধু ভদ্রতার খাতিরে উহা বলিতেছে।

কাজল বলিল, আপনি আমায় মাফ করুন সাধনবাবু। আমি আপনার ব্রাহ্মণের কথা ভাবছিলুম।

সাধন একটু খুশি হইয়া বলিল, তা হলে ব্রাহ্মণ আপনার ভাল লেগেছে! কি ভাবছিলেন?

সে পরে বলব।

সেদিন বৈঠক আর জমে না। খানিকটা পরে সাধন উঠিতে চাহিলে কাজল বলিল, আজকে এখানে খেয়ে যান।

সাধন বলিল, তা পারব না। মাসীমা রেঁধে রেখেছেন। বাইরে খেলে রাগ করবেন।

এই মাসী ও মাসতুত বোন ছাড়া তার কেহ নাই। তাদের লইয়াই সাধনের সংসার। সেই তাদের খরচা চালায়। অথচ বোনপোর সামান্য ত্রুটিও মাসী বরদাস্ত করেন না। পান হইতে চুন খসিলেই খিট্‌মিট্ করেন। তাই ইচ্ছা থাকিলেও সাধন খাইয়া যাইতে ভরসা করিল না। তবে উঠিল একটু দেরিতে। রথীন নিজের গাড়িতে তাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল।

পরের দিন রথীন আসিয়া দেখে কাজল জানালার ধরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিতেছে। রথীনের পায়ের শব্দ সে শুনিতে পায় নাই।

রথীন গানের কথা ধরিতে পারিল না, দরজায় দাঁড়াইয়া সুর শুনিতে

লাগিল। ভারী মিঠা করুণ সুর। একটি তরুণীর অন্তরের গভীর বেদনা যেন মুক্তি খুঁজিতেছে।

সুর থামার একটু পরে রথীন ডাকিল, কাজল।

কাজল বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, কে?

একমনে কি ভাবছিলে বল দেখি? আমি এসেছি, তাও টের পাও নি।

ভাবছিলুম? বাবার কথা। কাল সাধনবাবুর কবিতা শোনার পর থেকে খালি বাবাকে মনে পড়ছে।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা বাবা যদি কবিতার ঐ বামুনের মতন তেজী হতেন তা হলে আমার কি এ দশা হত?

রথীন কোন জবাব করিল না। একটু পরে কাজলই আপনা হইতে বলিল, না, তা হত না।

কথাটা রথীনের কানে বাজে। কাজলের বাবা তেজস্বী ছিলেন না, ছিলেন দুর্বল কিন্তু স্নেহময়, ক্ষমাশীল। সে বলিল, দুর্বল শুধু তিনি নন, আমিও।

কাজল কহিল, হ্যাঁ তোমার কথাও ভেবেছি। তোমার এত দয়া, তুমি এত করছ কিন্তু—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। শেষ করিল রথীন। সে বলিল, কিন্তু সমাজের ভয়ে আমি তোমায় কোন মর্যাদা দেই নি।

কাজল অনুনয়ের সুরে বলল, তুমি রাগ ক'র না লক্ষ্মীটি।

রথীন কহিল, রাগ করব কেন? তুমি ভীরু, আমি ভীরু, ভীরু আমরা সবাই।

কথাটা সত্য। কাজলকে ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব। অথচ কি যে তার ব্যবস্থা করিবে, ভবিষ্যতে তাদের কি সম্পর্ক হইবে সে সম্বন্ধেও তার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। কাজলকে বিবাহ করার কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মায়ের কথা। তিনি দুঃখ পাইবেন। মনে পড়ে মাতুলের কথা, সমাজের কথা। তারা ক্ষমা করিবে না, রাগ করিবে।

কাজলও ভরসা করিয়া কোন প্রশ্ন করে না। ভাবে পীড়াপীড়ি করিলেই তার সুখের এই নীড় হয়ত ভাঙিয়া যাইবে। এই ভাবেই দিনের পর দিন গত হইতেছিল।

সাধনের ব্রাহ্মণ কবিতাটি রথীনের মনও তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ কি যেন এক প্রেরণার বশে সে বলিয়া উঠিল, এই দুর্বলতা আমি ঝেড়ে ফেলব। কালই আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

কাজল তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

রথীন বলে, আমি তোমায় বিয়ে করব।

তার বিবাহের প্রতিশ্রুতি এই প্রথম। পরিষ্কার ভাবে একথা সে আগে কখনও বলে নাই।

কাজল যেন নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তার চোখ জলে ভরিয়া যায়। এত বড় আনন্দ বহুদিন ধরিয়া সে পায় নাই, জীবনে কখনও পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

উভয়েই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। অত্যন্ত বেদনার মত অতিশয় আনন্দ তাদের নির্বাক করিয়া দেয়। কিছুটা পরে কাজল বলিল, কিন্তু তোমার মা—তিনি যে কষ্ট পাবেন।

রথীন কহিল, সেই জন্যই এতদিন ইতস্ততঃ করেছি। কিন্তু আমি জোর করে বললে তিনি না বলতে পারবেন না। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে।

দুজনে আবার চুপ করিয়া থাকে। তারপর রথীন প্রস্তাব করে, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কাজল বলিল, বেশ, তার আগে আমি তোমার জন্যে একটু চা করে আনি।

না, চায়ের দরকার নেই। অবেলায় খেয়েছি।

সন্ধ্যার কিছু পরে তারা বেড়াইতে বাহির হয়।

রথীন কাজলকে লইয়া প্রায়ই এইরূপ বেড়াইতে যায়। যায় শহরের উপকণ্ঠে। চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন এভিনিউর সৌধমালা ও আলোক উজ্জ্বল তকতকে ঝকঝকে রাস্তার চেয়ে শহরতলির কাঁচা রাস্তা কাজলের অনেক বেশী ভাল লাগে। রাস্তা করিবে বলিয়া কেহ তৈরি করে নাই, মানুষের পায়ে পায়ে জমির উপর দাগ পড়িয়াছে। ঘাসের মাঝখানে আঁকাবাঁকা সরু আলপনা। এ ধারে ঘাসের ফুল, ওধারে হয়ত বাসকের জঙ্গল। বাঁশ ঝোপ শিউলি ঝোপের চিরসাথী এই পথ।

পল্লীর এই স্নিগ্ধ রূপ আজকাল রথীনেরও ভাল লাগে। সে কাজলকে বলে, এরই নাম সঙ্গদোষ। আগে গেঁয়ো পথঘাটের নাম শুনলে আমার ভয় করত।

কিসের ভয়?

সাপ, ম্যালেরিয়া।

কাজল হাসিয়া বলে, সঙ্গদোষে আমারও এখন শহর ভাল লাগছে।

দক্ষিণ শহরতলির প্রশস্ত রাজপথ, মাঝখানে কিছুটা ম্যাকাডাম করা। দু'ধারে ধূলা বালি, তারপর ঘাস আর মাটি। রাস্তার দুই প্রান্তে সমান্তরাল দুইটা খোলা নর্দমা।

ডাইনে বাঁয়ে ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি, কোঠা বাড়ির পাশেই খড়ের চালা। দেশীয় শিল্পপতিদের কারখানা, ষ্টুডিও, বাজার। রাস্তার উপর হইতেই লাউ কুমড়ার মাচা দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু'দিকে ছোট ছোট গলি বাহির হইয়াছে।

এইরূপ একটা গলি পার হইয়া কাজল বলিল, ড্রাইভারকে গাড়ী বাঁধতে বল।

রথীনের গাড়ী থামাইবার ইচ্ছা ছিল না। সে বলিল, থাক না, মেঘ করেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

কাজল বলিল, চল না লক্ষীটি একটু বেড়িয়ে আসি।

এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রথীনের আপত্তি টেঁকে না। কাজলের জয় হয়।

দক্ষিণমুখো ছোট গলি। গলিতে ঢুকিয়াই বাঁয়ে কাঁচা রাস্তা, ডাইনে পুকুর। রাস্তাটি তারকাঁটার বেড়া ঘেঁষিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পুব দিকে চলিয়া গিয়াছে।

পুকুরটা শেওলায় ঢাকা। বড় বড় শেওলাগুলি ফুলের মতন ফুটিয়া রহিয়াছে। তার উপর ইলেক্‌ট্রিকের আলো পড়ায় মনে হয় সবুজ ফুল তোলা নরম একখানা গালিচা।

শুধু পুব দিকে পারের ধারে খানিকটা জল। তিনটি বাঁশ দিয়া ঘাটের সামনে শেওলাগুলিকে দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। রাস্তা ও গলির দিকে ঘন ঘন বাঁশ পোঁতা। ঘাটের ঢালু পথে কয়েকখানি মাত্র জীর্ণ ইট অবশিষ্ট আছে।

অপর পারে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে লাউমাচার তলায় ঘাটে বসিয়া একটি বধূ বাসন মাজিতেছিল, দুই হাতে ছাই কাদা মাখা।

গাড়ী থামার শব্দে বধূটি গলির মোড়ের দিকে চায়। রথীন নামিয়া গলি দিয়া একটু অগ্রসর হইলে সে বাঁ হাতের পিঠ দিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া নামাইয়া দেয়।

কাজল তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রথীনকে বলিল, দেখছ, বউটির কি লজ্জা!

রথীন বলে, লজ্জা কাকে?

তোমায়।

কেন, এখান থেকে ত ওর মুখ দেখা যায় না।

কাজল একটু হাসিয়া বলিল, তা হলে কি হয়? ও যে এইটেই দেখেছে। মা থেকে মেয়ে, মেয়ে থেকে নাতনি লজ্জা আর ঘোমটা এই ভাবেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে।

পুকুরের দক্ষিণ পারে খোড়ো বাড়ি, তার পর বাঁশ ঝাড়। কতকগুলি বাঁশ গাছ রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সে জায়গাটা অন্ধকার, ঐ অন্ধকারের বুক চিরিয়া গলিটা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। তারপর আবার আলো, সেখানে গাছের গোড়া দেখা যায়। দুটো বাঁশের গোড়ায় হাঁড়ি উপুড় করা। কাজল জিজ্ঞাসা করিল, হাঁড়ি কেন বল দেখি?

রথীন বলিল, জানি না ত।

কাজল কহিল, হাঁড়ির নিচের পাতাগুলি বাঁধা কপির মতন গোল হয়ে উঠবে। হবে ধবধবে শাদা। ছেলে বেলায় কত খেয়েছি।

বাঁশ পাতাও খায় নাকি?

কপির পাতা লাউ কুমড়োর পাতা খেতে পারলে বাঁশ পাতারই বা দোষ কি? খেতে বেশ লাগে।

আঁকা বাঁকা গলি। কোথায়ও পথের পাশে বাড়ি, কোথায়ও একটু দূরে। এর মধ্যেই অনেক বাড়ির আলো নিভিয়াছে। একটা বৈঠকখানায় বিভিন্ন বয়সের একদল বাঙালী ভদ্রলোক গানের মহড়া দিতেছিল! দোলের প্রশেসনের গান—যেমন বেসুরো তেমনি কর্কশ।

ঠিক তার পাশের বাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া একটি তরুণী চেঁচাইতেছিল—আই য়্যাম্ দি মনার্ক অফ অল্ আই সার্ভে।

আকাশে পাতলা পাতলা মেঘ ওড়ে। মনে হয় অদূরে কোথায়ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কয়দিন বসন্তের হাওয়া দিয়াছিল, আজ আবার শীত শীত করে। রথীন বলে, চল এখন ফেরা যাক।

এপথে ওপথে ঘুরিয়া আরও খানিকটা পরে তারা ফিরিল। বাড়ি পৌছিল রাত প্রায় দশটায়।

মীনা তখনও জাগিয়া। মাকে দেখিয়াই সে তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ঘুমের আগে অন্ততঃ একটুক্ষণের জন্য তার মায়ের কোলে যাওয়া চাইই। কোলে যাইয়া মায়ের স্তন লইয়া খেলা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রথীন বলিল, আমি এখন উঠি।

কাজল তার কাছে আসিয়া বলিল, আমায় একটা চুমু দাও।

সে নিজ হইতে চুমা চায় এই প্রথম। শুধু তাই নয় রথীন চুম্বন করিলে বলে আর একটু জোরে।

রথীন হাসিয়া বলে, তুমি ত বড্ড লোভী।

কাজল নিচু গলায় বলে, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পরে রথীন চলিয়া যায়। বাহিরে তখন ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টি পড়ে। ঘুম পাড়ানি গানের মতন শব্দ। শুইয়া শুইয়া কাজল সেই শব্দ শোনে। নানা কথা ভাবে। রথীনের আজকের প্রতিশ্রুতির কথাই বেশী। তার বুক এক-একবার নাচিয়া উঠে। ভীরু মনের আনন্দের স্বাদের মতন সেই অনুভূতি।

একবার মনে পড়িল শহরের উপকণ্ঠের সেই তরুণীর—'আই য়্যাম্ দি মনার্ক অফ অল্ আই সার্ভে।'

বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে কিন্তু কাজলের ঘুম আসে না। শৈশবে বিবাহের ক্ষীণতম স্মৃতি হইতে আজ পর্যন্ত জীবনের যত কিছু ঘটনা মনটাকে তোলপাড় করিয়া তোলে।

হঠাৎ একবার পাঁচুর স্মৃতি উঁকি মারায় তার শরীর যেন বিষাইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতেই সে সিঁথির পাশের দাগের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। কি রুক্ষ কণ্ঠেই না পাঁচু সেদিন ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিল, এমন দাগ এঁকে দিলুম জীবনে যা কখনও মুছবে না। সেই বাণী দাগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

ঢং ঢং করিয়া এগারটা, বারটা, একটা বাজে। নীড় বাঁধিবার নিশ্চিত সম্ভাবনায় কাজল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করে, কত প্ল্যান। শুধু নিজের নয়, মেয়ের ভাবী জীবনেরও একটা ছক কাটিয়া ফেলে।

সে এবার উঠিয়া টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়া বাহিরের দিকে চায়। মেঘে ঢাকা আকাশ, উড়ন্ত মেঘের আড়াল হইতে এক একবার জ্যোছনার ক্ষীণ আভাস আসে। কাজল আলো আঁধারের ঐ খেলা দেখে।

রাত দু'টার পর ড্রয়ার হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া সে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিল,

শ্রীচরণেষু,

দাদা অনেকদিন চিঠি পাইনি। আশা করি ভাল আছ। বাবার একখানা ছবি যোগাড় করে পাঠিয়ে দিতে পারিলে ভাল হয়। বাড়িতে তাঁর ছবি

নেই জানি। কলকাতার শরৎ কবিরাজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যে গ্রুপ ছবি তুলেছিলেন তার মধ্যে বাবার ছবিও আছে। বাবা সেই সময় কি এক কাজে কলকাতায় গিয়ে কবরেজ মশাই'র বাড়িতে ওঠেন।

শরৎবাবু নেই। তাঁর ছেলের কেউ দিল্লী, কেউ লক্ষ্ণৌ-এ থাকেন। একজন শুনেছি কলকাতায় আছেন। তাঁদের কাছে চিঠি লিখে ফটোর খোঁজ ক'র। এর জন্য যা খরচা লাগে আমি দেব। তুমি বাড়িতেও একখানা রেখ। বাড়ির ছেলেরা ভোরে উঠে তাঁর ছবিকে প্রণাম করছে, এ ভাবতেও আমার ভাল লাগে।

গোরা কেমন আছে? বাড়ির সবাই কেমন? মাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি এবং বৌদিও নিও।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া সে আবার জানালার দিকে চায়। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। সবুজ শার্সির উপর দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। কাঁচের উপর ময়লা জমিয়াছিল সেগুলি ধুইয়া যাওয়ায় কাঁচ কয়খানা ঝলমল করিতে লাগিল।

কাজল পরদিন সারাটা দুপুর বসিয়া রথীনের জন্য নানারকম খাবার করিল, তাদের দেশী ধরনের রান্না তরকারি, ধূপগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েক রকম মিষ্টি। এসব তার পিসির কাছে শেখা।

এগুলি রথীনের বড় পছন্দ। সে বলে, হাতের রান্না খাইয়েই তোমরা পুরুষকে যাদু করে রাখতে পার।

কাজল আশা করিয়াছিল রথীন সেদিন একটু আগেই আসিবে। কিন্তু পাঁচটা বাজিয়া গেল। ছয়টা। সন্ধ্যা হইল। সে আসিল না। কাজলের মনে হইল সারাটা দুপুর কী পণ্ডশ্রমই না করিয়াছে।

তার একটু রাগ হইল। তার চেয়ে বেশী হইল অভিমান। মনে মনে ভাবিল, আচ্ছা, আমিও—

কিন্তু রথীন পর পর চারদিন না আসায় অভিমানের বদলে ভয় হয়। সে ত এরূপ কখনও করে না। না আসিতে পারিলে খবর দেয়।

কাজলের আশঙ্কা নানা রকম। হয়ত রথীনের অসুখ করিয়াছে। হয়ত বা তার মত বলাইয়াছে। তার উপর রাগ করাও কিছু বিচিত্র নয়। তার যে পোড়া কপাল। কি হইল কে জানে!

এদিকে লোক পাঠাইয়া খবর লইবারও উপায় নাই।

রথীন পর পর কয়েকদিন না আসায় কাজল একবার সখিয়াকে তার বাড়িতে পাঠাইয়া দেয়। পরদিনই রথীন আসিয়া বলে, আমার ওখানে কাউকে পাঠিও না। জানতে পারলে মা দুঃখ পাবেন।

তাকে গম্ভীর দেখিয়া মণিমালা জিজ্ঞাসা করে, কি হল, মুখ গুমরে আছিস যে বড়? আবার ছেলেপুলে হবে বুঝি?

কাছেই ছিল চারু। সে হাসিয়া বলিল, তা জানি না। তবে দেখছ ত রথিবাবু কদিন অ্যাবসেণ্টো আছে।

মণিমালা কহিল, তোরা খালি মিষ্টি ঢালবি, মিন্‌সেদের ওতে অরুচি ধরে যায়। মাঝে মধ্যে তেতো ঢালতে পারিস না? তেতো, ঝাল।

কাজল কহিল, তুমি একটু শিখিয়ে দাও না, মালাদি।

বাঃ রে কাজু। মুখ ফুটেছে দেখছি। বল রাধাকেষ্ট, রাধা। সুর টানিয়া সে আরও বার দুই বলিল, রাধাকেষ্ট···রা···ধা।

সন্ধ্যা রাত্রে এই ঘটনা। রাত্রি শেষে আর এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

আকাশ তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। পশ্চিমে মহাদেববাবুর দেওয়াল চোখের উপর সবে স্পষ্ট হইতে শুরু হইয়াছে। কাজল বাথরুমে গিয়াছিল। সেখান হইতে পুলিস দেখিয়া সে মণিমালাকে বলিল, বাড়ির পিছনের গলিটা যে পাহারাওয়ালায় ছেয়ে গেছে। একেবারে লালে লাল।

মণিমালা গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কাঁধে গামছা, হাতে বাথগেটের ক্যাস্টর অয়েলের শিশি। তার গাড়ী তখনও আসে নাই। সে বলিল, এ বাড়িতে লাল পাগড়ি আসবে কোত্থেকে? তাদের সাহস কি?

মুখে এই কথা বলিলেও সে সঙ্গে সঙ্গেই ত্রস্ত পদে ভিতরে চলিয়া গেল। গামছাখানা যে দরজার পেরেকে আটকাইয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিল না।

এই সময় দরজায় শব্দ হয়, একসঙ্গে কড়ানাড়া ও দরজায় ধাক্কার শব্দ। কাজলের ভয় করে।

সখিয়া দরজা খুলিয়া দিলে দলবল সহ আবগারী পুলিসের একজন অফিসার বাড়িতে ঢোকেন। সঙ্গে কলিকাতা পুলিসের কয়েকটি কনস্টেবল। তাদের মধ্যে বন্দুকধারী দু'জন।

অফিসার সখিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, এ বাড়িতে মণিমালা থাকে ?

একটা সেলাম করিয়া সখিয়া বলে, হ্যাঁ হুজুর।

তখন শেমিজ পরার সময় ছিল না। মণিমালা পেরেকে আটকান গামছা-খানিকে তাড়াতাড়ি বুকে পিঠে জড়াইয়া লইল।

অফিসার তল্লাশি পরোয়ানা দেখাইলে সে বলিল, আপনাদের কোন ভুল হয়নি ত ?

অফিসার হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ত একটু পরেই ধরা পড়বে।

পুলিস তল্লাসি আরম্ভ করিলে মণিমালা টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া ডাকে, হ্যালো।

অফিসার বলেন, ওটা রেখে দাও।

আমি লাউরিকে ফোন করব। পুলিসের সেজ সাহেব লাউরি।

তোমায় ত এখন ফোন করতে দেওয়া হবে না।

কেন ? তারাও সরকারের লোক। আমি তাদের ফোন করতে পারব না ? লাউরি সাহেব, ফাজিল সাহেব এরা যে আমার ঘরে ওঠ্-বোস্ করে।

অফিসার তার সহকর্মীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। গতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া মণিমালা আর উচ্চবাচ্য করে না।

পুলিস বাক্স পেটরা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজে, প্রত্যেকখানি কাপড়ের ভাঁজ খোলে, যেখানে পুরু সেলাই সেখানে একবারের জায়গায় পাঁচবার টানিয়া দেখে।

একবার মণিমালা বলিয়া উঠিল, এ কী, আমার ফার কোটটার সেলাই খুলে ফেললেন যে ?

অফিসার কহিলেন, এই আমাদের নিয়ম, তুমিও বেশ জানো যে এ না করলে মাল বেরোয় না।

মণিমালা হতাশ ভাবে বলিল, বেশ যা ইচ্ছে করুন।

প্রায় এক ঘণ্টা সার্চের পর একটি কনস্টেবল ডাকিল, হুজুর।

অফিসার বলিলেন, কি মাখন ?

মাখন এই বাড়ি ও মহাদেববাবুর বাড়ির মধ্যের দেওয়ালের উপর একটা প্যাকেট দেখাইয়া বলিল, এই প্যাকেটে নিশ্চয়ই আছে। এ ফেলে দিয়েছে।

উপরওয়ালার হুকুমে মাখন দেওয়াল বাহিয়া কাগজের প্যাকেটটা নামাইয়া আনে। তার মধ্যে প্রায় এক আউন্স কোকেন পাওয়া যায়।

অফিসার সার্চলিষ্টে কি যেন টুকিয়া নিয়া বলেন, তাড়াতাড়িতে পুঁটলিটা তাক্ করে ফেলতে পার নি দেখছি। দেওয়ালে আটকে গেছে। যাক্ বাকি মাল কোথায় লুকিয়েছ, বল। শুধু শুধু আমাদের হয়রানি করে লাভ কি ?

মণিমালা বলিল, এসব কি বলছেন আপনি ? প্যাকেটটা ওখানে কি করে এল আমি জানি না।

অফিসারের হুকুমে পুলিস এবার ছুরি দিয়া লেপ তোশক গদি বালিশ কাটিতে আরম্ভ করে, কাঠের ফার্ণিচার ও আয়নার ফ্রেমের জোড় খুলিয়া ফেলে। কোন মায়াই করে না। কোনটা ভাঙে, কোনটা বা ছিঁড়িয়া যায়। ঘরে কাঁচ কাঠ লেপ তোষক তুলার স্তূপ জমিয়া ওঠে। মনে হয় ভূতের নৃত্য চলিতেছে।

একটা ইজি চেয়ারের গদির ভিতর সাত প্যাকেট কোকেন পাওয়া যায়। প্যাকেটগুলি নারিকেলের ছোবড়ার মধ্যে লুকানো ছিল।

মণিমালার ঘরে কোকেন পাওয়া না গেলে হয়ত অন্য ঘরে সার্চ হইত না। এবার তরু, চারু এবং কাজলের ঘরেও তল্লাশি হয়।

পুলিস তাদের লেপ তোশক গদি বালিশ ছিঁড়িল না, ফার্ণিচারের জোড়ও খুলিল না। কিন্তু মাখনের হাত হইতে পড়িয়া রথীনের দেওয়া আয়নাখানা গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গেল।

কাজলের মুখের ভাব দেখিয়া অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, এর মধ্যেও কিছু লুকানো ছিল নাকি ?

কাজল মাথা নাড়িয়া জানায়—না।

পুলিসের হুমকির চেয়েও আয়না ভাঙার জন্য তার বেশী ভয় করে। মনে হয়, এ এক মস্ত বড় অলক্ষুণে ব্যাপার।

পুলিস পানওয়ালা ফাগুয়া ও আর একটি লোককে সাক্ষী হিসাবে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই লোকটি তল্লাশি তালিকায় স্বাক্ষর করিল। ফাগুয়া দিল টিপ সই।

অফিসার মণিমালাকে বলিলেন, তোমাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

মণিমালা বলিল, আমার ফিটন তৈরি আছে, চলুন তাইতে।

সে নূতন একটি আবলুক ঘোড়া কিনিয়াছে। ঘোড়াটি ভারী সুন্দর, রাস্তা কাঁপাইয়া চলে। তার ঘাড়ের চুল তখন দুলিতে থাকে। দেখিয়া মণিমালা যেমন আনন্দ পায়, তেমনই গর্ব বোধ করে।

অফিসার তাকে সঙ্গে করিয়া তার গাড়ীতেই চলিয়া গেলেন। গাড়ীতে ওঠার সময় মণিমালা তরুকে বলিল, লাউরি বাবুকে খপর দিও যেন জামিন দিয়ে আমায় খালাস করে আনে। তার কাছে এখনও আমার হাজার টাকার গহনা আছে। পরিবার কুটুম বাড়ি যাবে বলে চেয়ে নিয়ে গেছে আজ ছ মাস।

পুলিস মণিমালাকে লইয়া চলিয়া গেলে ফাগুয়া তরুদের কাছে দুঃখ করিতে লাগিল, হামি কি বখত খবর দিয়ে যাই। আজ কুছু জানতে পারলাম না। উসিসে গড়বড় হৈয়ে গেলো।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সঙ্গে আর একজন এসেছিল, ও কে?

ফাগুয়া বলিল, ব্রেঞ্চি বাবু। হামার দুকানমে শুইয়ে ছিল। উস্কো বাপ আমীর থা। ব্রেঞ্চি বহুত কুকীন খাতা। হামরা দুকানমে পান ঔর চুনা। চুনা বহুৎ জাস্তি।

কাজল চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, এর আগেও খানাতল্লাশি হয়েছে না কি?

হ্যাঁ, হয়েছে বার দুই। আমরা ভাবতুম পুলিস মদের খোঁজে এসেছে। অনেকের ঘরেই মদ লুকোনো থাকে। রাত্রে চড়া দামে বেচে। তা পুলিস এর আগে কিছু পায় নি।

দুই দিন হাজতে থাকার পর মণিমালা জামিনে খালাস হইয়া আসে। সে বলে, বেটারা কি নিমকহারাম! মাস মাস টাকা খায় অথচ ধরে নিয়ে গেল। খালাস অবিশ্যি হব কিন্তু শুধু শুধু হয়রানি হতে হবে। যাক্ লাউরি আমার খোঁজ করেছিল?

কাজল কহিল, না আসেনি ত।

হারামজাদা! কাল কাছারিতে আমায় দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। ভাবলুম চেঁচিয়ে বলি, ও রসের নাগর, আমার গয়নাগুলো কি হজম হয়ে গেল নাকি?

তার চোখে ফুটিয়া উঠিল একটি হিংস্রভাব। একটু পরে সে আবার বলিল, পুরুষ জাতটাই বেইমান বেহায়া। আমাদের সঙ্গে ফুর্তি লুটবে অথচ আমরা মরলে কাঁধ দেবে না। মারো চাবুক।

কয়দিনেই সব ওলট পালট হইয়া গেল। রথীনের অসুখ, পুলিসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর হইতে মণিমালার অনেকখানি পরিবর্তন হইয়াছে। কাজলের

সঙ্গী একমাত্র চারু, তারও মন ভাল নয়। ভণ্ডুলের ব্যবহারে দিন দিন সেও বিশ্বাস হারাইতেছে।

থানাতল্লাশির দিনই দুপুর বেলা একটি চাকর আসিয়া রথীনের অসুখের খবর দেয়, দাদাবাবুকো কাওলা হইছে।

বাবু কালা হয়েছে কি রে? কানে শুনতে পায় না—বলিয়া কাজল নিজের কানে হাত দিয়া বলে, ইসমে শুনতে পাতা নেই?

চাকর বলিল, না মাইজি, হরদি জান, ডাল তরকারিমে যো হরদি দেতা হ্যায়?

হ্যাঁ জানি, হলুদ।

আখ, ন, সব হরদি হইয়া গেল, পিসাব টাট্টি, বদন বিলকুল।

সব শরীর হলদে হয়ে গেছে? তাহলে ন্যাবা হয়েছে বল্।

নাভা হাম জানতা নেই। হরদি।

তার পর আর কোন খবর আসে নাই। কাজল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সব সময়ই সে রথীনের কথা ভাবে, অমন চেহারা, সোনার মত রং, তার কিনা চোখ মুখ সব হলদে হইয়া গেল।

কখনও চারুর সঙ্গে রথীনের অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করে, কখনও মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করে, ন্যাবা কি শক্ত অসুখ? ওতে কোন ভয় আছে?

মণিমালা উত্তর করিল, দোয়ানির মা ত ওতেই মরল। ন্যাবা হ'ল আবার কার?

হয়েছে তোমাদের রথীবাবুর। শুধু ত হলদে হওয়া, সেকি খুব শক্ত?

মণিমালা বলিল, রথির হয়েছে? তা সারেও অনেকের, বেশীর ভাগই সারে। আমি ন্যাবার ওষুধ জানি।

বেশ ত, আমায় বলে দাও না।

পাঁজিতে পড়েছি। তোকে দেব'খন।

মণিমালা তাকে একখানি ছোট পঞ্জিকা দেখায়। তার প্রতিটি পৃষ্ঠার মাথায় ও নিচে টোটকা ঔষধের তালিকা। ছড়ায় লেখা।

কাজল পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীর মতন টোটকার তালিকা ও ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়ে। এক একটা ঔষধ মনে ধরে আর মণিমালাকে বলে, এটা কি রকম মালাদি?

চারটি ছত্র উভয়েরই মনে ধরিল,—

হলুদ খাবে দই দিয়ে
গায়ের হলুদ যাবে ক্ষয়ে।
হিঞ্চে পলতা কুলেখাড়া
ন্যাবার ওষুধ জানবে সেরা।

লাইন কয়টি কাজল মুখস্থ করিয়া ফেলে। তার ইচ্ছা রথীনকে এই মূল্যবান জ্ঞানের সন্ধান দেয়। চিঠি লিখিয়া জানায়।

চারু বলে, কলকাতার বড় বড় ডাক্তার বদ্যি তাদের ঘরে বাঁধা আর তুই কিনা টোটকা মুখস্থ করে লিখে পাঠাবি ?

কাজল বলে, জানিস ত ভাই !

এই তিনটি শব্দের মধ্য দিয়া তার সমস্ত বুকখানা যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। শুধু কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা নয়, প্রকাশ পায় তার ভীতি, তার অসহায় অবস্থা।

এই সময় একদিন রঘুর সাম্প্রতিক সহচর দীন দালাল অন্য এক ভদ্রলোককে লইয়া তরুর ঘরে গান শুনিতে আসে। সে মধ্যে মধ্যে এইরূপ লোক লইয়া আসে, তাদের খরচায় মদ খায়, হৈ হল্লা করে। কাজল তাকে বলিল, আপনি দয়া করে ওর খবর এনে দেবেন ? আমি পাঠিয়েছি তা যেন জানতে না পায়।

তা কি আর বুঝি না ? এ পাড়ায় ঘুরছি কোয়ার্টার অব্ এ সেঞ্চুরীর উপর। রথিবাবুর কি হয়েছে বল দেখি ? অমন জেণ্টেলম্যান।

ক'দিন আগে শুনেছি চোখ মুখ সব হলদে হয়ে গেছে। তার পর আর কোন খবর পাইনি।

এ ত ভাবনার কথা। যাক্ আমি তার খবর এনে দেব। তবে বাতে ক' দিন বড় কষ্ট পাচ্ছি। রথিবাবুর ঠিকানাটা যেন কি ?

ভবানীপুর জজ সাহেবের বাড়ি, মুলুক রাজ ষ্ট্রীট।

কি মুশকিলই না হয়েছে বাত নিয়ে। তা যাব'খন। কালই তুমি রথিবাবুর খবর পাবে।

আপনার রাহা খরচটা নিন—বলিয়া কাজল দীনের হাতে পাঁচটা টাকা দিল।

দীন বলিল, আমার বাত না হলে তোমার এই টাকা লাগত না। যাক্, শুভস্য শীঘ্রং, কালই খবর দেব।

আর এই কাগজ খানিও দেবেন—বলিয়া কাজল দীনের হাতে একখানি চিরকুট দিল, তাতে লেখা—

হলুদ খাবে দই দিয়ে
গায়ের হলুদ যাবে ক্ষয়ে—

ছত্র কয়টি পড়িয়া দীন একটু হাসিল।

তার পর দিনই সে আসিয়া খবর দিল, রথীন প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে। তার এখানে আসিতে আরও দু চারদিন দেরি হইবে।

কাজল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, তা হ'ক। সেরেছে এই মঙ্গল। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ত?

না, তা হয়নি। লোক লস্করের মুখে শুনলুম।

কাজল বলিল, খুব রোগা হয়েছে বুঝি?

দেখিনি ত। কি করে বলব? তবে রোগা হলেও একাদশীর চাঁদ। অমন চেহারা। তা তোমাদের দুটিতে যা মিলেছ? সোনায় সোহাগা, গোল্ড আর ওর নাম যেন কি, বোরিক?

সেই দিনই রথীনের পুরাতন চাকর ফরাস আসিয়া উপস্থিত। তার মুখ দেখিয়া কাজলের ভয় করে।

এই লোকটির পিতৃদত্ত নাম যে কি ছিল কেহ জানে না। রথীনের বাবার সময় হইতে সে বৈঠকখানার ফরাসের কাজ করে বলিয়া সকলেই ডাকে ফরাস। সখিয়ার ভাই লখিয়া আসার আগে সে প্রায়ই কাজলের বাজার করিয়া দিত। এখনও মধ্যে মধ্যে সংবাদবাহকরূপে আসে।

কাজল প্রশ্ন করিল, কি খবর ফরাস?

আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। কর্তা-মা পাঠিয়েছেন।

রথীনের মা তাকে নিতে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কাজলের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সে বলে, কেন বল্ দেখি? অসুখ খুব বেড়েছে বুঝি?

ভয়ের কিছু নেই, আপনি চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নিন।

মীনাকে চারুর কোলে দিয়া কাজল বলে, মাসীর কাছে থাকবে, কেঁদ না!

মীনা আব্‌দার করে, আমি যাব।

কাজল তার চিবুক ধরিয়া বলে, এসে সন্দেশ দেব। পকেট থেকে সন্দেশ। রথীন রোজই মীনাকে সন্দেশ দেয়। সে আসিলেই মীনা 'পকেট থেকে সন্দেশ' চায়।

কাজল আবার বলিল, দেখিস ভাগ্যমন্তি, খবর যেন ভাল হয়। সেরে উঠুক, তোকে টায়রা গড়িয়ে দেব।

মেয়েকে ঠাণ্ডা করিয়া কাজল ফরাসকে বলিল, চল এবার।

তার পরনে পরিষ্কার একখানা শাড়ী, গায়ে শুধু একটা সাদা শেমিজ। শ্যাণ্ডালের মধ্যে আঙুল ঢুকাইয়া সে আবার পা বাহির করিয়া আনে। তার মনে পড়ে কর্তা মা গোঁড়া হিন্দু ঘরনী। মেয়েদের জুতা পরা তিনি হয়ত পছন্দ করিবেন না।

দরজায় আট-সিলিণ্ডার বিরাট লিমুসিন, কুচকুচে কালো বডির গায়ে সাদা একটা সরু রেখা—রূপার পোঁচের মতন। এই গাড়িখানা কাজল কখনও দেখে নাই।

রাজপথে ট্যাক্সি গাড়ী রিক্শার ভিড়। মানুষ চলে হাজার হাজার। রথীনের গাড়ি সেই ভিড় কাটাইয়া নিঃশব্দে চলে, কোন ঝাঁকুনি দেয় না।

নদীতে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, মানুষের চোখে এক রকম লাগে। এও তেমনি। কাজলের চোখে একজন মানুষ হইতে আর একজন মানুষের, একটা গাড়ি হইতে আর একটা গাড়ির কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না।

ল্যানের পর গাড়িবারান্দা। গাড়ি হইতে নামিয়া বারান্দা দিয়া যাওয়ার সময় তার কানে যায়, ওঃ ডিয়ার, ডিয়ার। সে চাহিয়া দেখে পাশের ঘরে একটা টেবিলের কোণে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে ভণ্ডুল সিগারেট টানিতেছে।

কাজল জানিত ভণ্ডুল ব্যবসায় উপলক্ষে টিউটিকোরিন গিয়াছে। তাকে এই বাড়িতে দেখিয়া সে বেশ একটু বিস্মিত হইল।

রোগীর ঘরের দরজায় সুন্দরী একটি প্রৌঢ়া তার হাত ধরিয়া কহিলেন, এস, মা এস।

কাজলের পারিপাট্যহীন বেশ যেমন তাঁকে বিস্মিত করিল, কাজলকে তেমনি অভিভূত করিল কর্তামার এই সহৃদয় আহ্বান।

হলের মতন বড় ঘর, দেয়াল পেন্টিং করা, সিলিং হইতে তিনটা ঝাড় ঝুলিতেছে, মাঝেরটা ডোমের মতন।

মার্বেলের মেঝে। মাঝখানে ঝকঝকে বার্ণিশ করা খাটে রথীন শুইয়া। তার সর্বাঙ্গ সাদা খদ্দরে ঢাকা। শুধু মুখখানি দেখা যায়। মুখে সাত আট দিনের দাড়ি গোঁফ, ঠোঁট দুখানা ফুলা, চোখ বোজা। চোখের নিমীলিত পাতার দিকে চাহিলে মনে হয় প্রাণশক্তি নিঃশেষে উজাড় হইয়া গিয়াছে। মাথায় আইসব্যাগ, একটি মেম-নার্স ব্যাগ ধরিয়া বসিয়া আছে।

রথীনের উরুতে রবারের নল বসানো, সেই নলপথে একটা তরল পদার্থ ধীরে ধীরে শরীরে ঢুকিতেছে। নলের অপর দিক দেয়ালে কাঁচের ডুসের সঙ্গে ঝুলিতেছে। একটি বাঙালী মেয়ে-নার্স সেই দিকে চাহিয়া।

খাটের পাশে টেবিলের উপর ঔষধের শিশি কৌটা ও খালি কয়েকটা বোতল। মেজের এক কোণে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। কাজল কখনও অক্সিজেন সিলিণ্ডার দেখে নাই, দেখিয়া তার মনে পড়ে যমরাজের গদার কথা।

দরজায় দাঁড়াইয়া সে এক নিমেষে সব দেখিয়া লয়। প্রথমেই চোখে পড়ে একখানি তৈলচিত্র। ঠিক যেন রথীন বসিয়া—সেই দীপ্ত ললাট, টিকলো নাক, শান্ত সুন্দর মুখশ্রী তবে মুখখানা আর একটু পরিণত, আরও একটু ভরাট।

কর্তা মা কাজলকে লক্ষ্য করেন, মেয়েটির ভাবভঙ্গী তাঁর বড় ভাল লাগে। তিনি বলেন, দেখ ওকে সারিয়ে তুলতে পার কি না। আমি ত মা হিমশিম খেয়ে গেছি।

তাঁর এই নির্ভরতার উত্তরে কাজল মাথা নিচু করে। তারপর হঠাৎ তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া বলে, আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কর্তা মা বলেন, ভুল ত হবেই, সে আমি জানি। তার পর তিনি রোগের ইতিহাস ও রোগীর অবস্থা বর্ণনা করেন।

অসুখ আজ আঠার দিন, তিনদিন গলা দিয়া জলটুকুও তল হয় না। পেটে কিছু পড়িলেই বমি হয়। কাল হইতে জ্ঞান নাই। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রথীন মধ্যে মধ্যে মায়ের নাম করে। তবে কাজলের নামই করে বেশী।

প্রৌঢ়ার গলা এবার আটকাইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, যিনি চলে গেছেন তাঁর কথাও দুবার বলেছে। আগে ও বাপ মা ছাড়া কিছু জানত না—বলিয়া তিনি স্বামীর তৈলচিত্রের দিকে তাকান।

তাঁর কাছে কাজলের নিজেকে অপরাধী মনে হয়, সে কর্তামার পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। তার চোখে পড়ে কর্তামার পায়ের নখ। নখগুলি বড় কুৎসিত। তাঁর মতন সুন্দরীর পায়ের সঙ্গে, ঘরের আর সব জিনিসের সঙ্গে যেন বেমানান।

তিনি কাজলকে ছেলের শয্যার কাছে লইয়া গিয়া ডাকেন, রথি চেয়ে দেখ কে এসেছে। কাজল। —কা—জ—ল।

রথীন সাড়া দেয় না। প্রৌঢ়া বলেন, শুনতে পাচ্ছ না? এ যে কাজল।

কাজলের নাম ধরিয়া ছেলের চেতনা ফিরাইয়া আনার মধ্যে যে লজ্জা আছে প্রৌঢ়ার কণ্ঠে সেই লজ্জা প্রকাশ পায়। তবুও তিনি বার দুই তিন ডাকেন।

বাঙ্গালী নার্স বলে, ওঁকে ডাকবেন না।

কর্তামা বলেন, বেশ।

খানিকটা পরে তিনি কাজলকে বলেন, তুমি ডেকে দেখবে ?

কাজলের লজ্জা করে। সে বলে, আপনিই ত ডেকেছেন।

কর্তামা এবার অসহিষ্ণুভাবে বলেন, একবার দেখই না।

কাজল রথীনের শয্যার কাছে যাইয়া ডাকে, শুনছ।

বার কয়েক ডাকিবার পর একটা শব্দ হয়। ঘড়ঘড় করিয়া রথীন বমি করিয়া দেয়। হলদে রংয়ের খানিকটা জল ও শ্লেষ্মা। কাজলের হাতে লাগিয়া যায়।

ধনীর বাড়ি। ডাক্তারে ওষুধে, পথ্যে সরঞ্জামে কোথায়ও ত্রুটি নাই, ফাঁক নাই। অন্য বাড়িতে আত্মীয় স্বজনরা সলা পরামর্শ করে, কোমর বাঁধিয়া সেবা করে, রাত জাগে। কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছোটে। এই বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুদের কোন কিছু করার অবকাশ নাই। ফোনে ডাক্তার ডাকা হয়, সরকার মোটর করিয়া ওষুধ আনিতে ছোটে। সেবা করে নার্স।

রোগীর কোনও কাজে লাগিতে না পারিয়া কাজলের অস্বস্তি বোধ হয়। সে একবার রথীনের দিকে চায় আবার চায় কর্তামার দিকে।

বৈকালের দিকে টাকওয়ালা একটি লোক ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কে দিদি ?

প্রশ্নের মধ্যে তাচ্ছিল্য ফুটিয়া বাহির হয়।

কাজল রথীনের কাছে তার মামার কথা শুনিয়াছিল। মনে হইল এইই তিনি। লোকটিকে তার ভাল লাগিল না।

কর্তামা ভ্রাতার প্রশ্নের উত্তরে ধীরে কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, কাজল।

ভগ্নীর উত্তরে লোকটি খুশি হইতে পারিল না। বলিল, ওঃ।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বড় ডাক্তার আসিয়া দু'বার দেখিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিটি যেমন বিশালকায় তেমনই দাম্ভিক, জুনিয়রদের মানুষ মনে করেন কি না সন্দেহ।

তিনি জুনিয়রকে দুইটি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্ন, স্যালাইন ক বোতল গেল, অ্যারুণ ?

খর্বকায় অ্যারুণ বা অরুণ ডাক্তার বলে, থি. বটল্‌স্‌ স্যার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, টেম্পারেচার ?

দ্বিতীয়বার প্রশ্নের আর অবকাশ ছিল না। রথীনের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁচবে ত ডাক্তারবাবু ? আপনি শুনেছি মড়া বাঁচিয়ে তোলেন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া যান। রোগীর মা ধরিয়া নেন, ছেলে তাঁর সারিয়া উঠিবে।

বাহিরে আত্মীয় স্বজন শুভার্থীর ভিড়। তারা জটলা করে, দু'একজন ভিতরেও আসেন। একজন রোগীকে মাদুলি দিয়া বলিলেন, ভিখারীদাস বাবাজীর দেওয়া এ মাদুলি কথা কয়।

লোকটি রথীনদের গুরু বংশীর, বর্তমানে কলিকাতার কোন দেশলাই ফ্যাক্টরিতে দিনমজুরের কাজ করেন। কর্তামা তার পায়ের সামনে রূপার গেলাসে এক গেলাস জল রাখিয়া দিলে তিনি বুড়া আঙুল ডুবাইয়া পাদোদক করিয়া দেন। মাদুলি ও পাদোদকের বিনিময়ে পান দশ টাকার একখানি নোট।

টিক টিক করিয়া ঘড়ি বাজে। সময় গড়াইয়া যায়। সকলের মুখেই হতাশার ভাব। শুধু কর্তামা এখনও বড় ডাক্তারের মাথা নাড়াটুকু সম্বল করিয়া আছেন।

সন্ধ্যার একটু আগে জানালার শার্সির ভিতর দিয়া রথীনের পায়ের কাছে বেগুনি রংয়ের এক ফালি আলো আসিয়া পড়িয়াছে। শিয়রে একটি নার্স বসিয়া। আর একজন ডুসে স্যালাইন ঢালিতেছিল !

রথীনের পাশে বসিয়া কর্তামা, পায়ের কাছে কাজল। সে ধীরে ধীরে পায়ে হাতবুলায়।

রথীনের মুখে একটু হাসি দেখিয়া কর্তামা বলিলেন, বাঃ বাঃ হাসছে।

কাজল চাহিয়া দেখে ক্ষীণ একটু হাসি, শরতের রোদের মতন মিঠা উজ্জ্বল। কর্তামা একবার কাজলের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া নার্সকে কহিলেন, নলটা খুলে ফেল। হাসির সঙ্গে ও বড় বেমানান।

কিন্তু আশ্চর্য। হাসিটুকু আর মিলায় না। নার্স নল খুলিয়া ফেলে।

কর্তামা বলেন, এ কী এ্যাঁ ! তিনি ছেলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপে, নাকের গর্ত এক একবার বড় হয়। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কাজলের দিকে চাহিয়া তিনি চিৎকার করিয়া ওঠেন, খেলি রাক্ষুসী ? খেলি আমার ছেলেকে ? যা এক্ষুণি, বেশ্যা কোথাকার, কুঠে।

তাঁর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়, চোখে আগুন জ্বলে।

নার্স দুইটি ত অবাক। মেমটি বলিয়া উঠিল, ডোণ্ট, ডোণ্ট প্লিজ।

সে ভাবিয়াছিল গৃহকর্ত্রী হয়ত এই তরুণীকে মারিয়া বসিবেন।

কাজল ভয়ত্রস্ত শশকের মতন বাহিরে ছুটিয়া যায়। এদিক ওদিক চাহিয়া ফরাসকে খোঁজে, খোঁজে ভণ্ডুলকে। কিন্তু গলা ছাড়িয়া ডাকিতে ভরসা করে না। চেষ্টা করিলেও সে গলা ছাড়িয়া ডাকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বেচারীর গলা শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়াছিল।

বারান্দার সামনে দিয়া যাওয়ার সময় তার কানে আসিল নানা টিপ্পনী।

কোন রকমে সে ফটক পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। রাস্তা দিয়া একখানা মোটর যাইতেছিল। সে হাত দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, টেক্সি।

ড্রাইভার মুখ বাড়াইয়া হাত নাড়াইয়া জানাইয়া দিল, গাড়িখানা ট্যাক্সি নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিল। সুন্দর মুখ দেখিয়া হাসিল, না একটি সুন্দরী বেয়াকুব বনিয়াছে মনে করিয়া হাসিল, কে জানে?

ভণ্ডুল কাজলকে কোলে করিয়া ট্যাক্সি হইতে নামায়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই তরুর সঙ্গে দেখা। সে বলে, কাজলকে আপনি নিয়ে এলেন কোত্থেকে?

ভণ্ডুল কোন উত্তর করে না।

তরুর পাশে ছিল চারু। সে ভণ্ডুলের পিছন পিছন আসিয়া কাজলের বিছানা পাতিয়া ঝাড়িয়া দেয়। সে কোন কথা বলে না বটে, কিন্তু তার চোখ মুখ সকল অঙ্গই যেন প্রশ্ন করে, এ কী! তুমি, কাজল—তোমরা এ অবস্থায়? কাজলকে তুমি কোথায় পেলে?

এই নীরব প্রশ্নে ভণ্ডুলও কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। কাজলকে বিছানায় শোয়াইয়া বলে, রথি পুওর চ্যাপি। তারি বাড়ি থেকে নিয়ে এলুম।

কেমন আছেন তিনি?

গ্যন।

চারু বলিয়া ওঠে, রথিবাবু মারা গেলেন!

ভণ্ডুল বলিল, পুওর চ্যাপি।

কাজলের মাথায় ও চোখে মুখে জল দিয়া কিছু সময় বাতাস করার পর সে চোখ মেলিয়া চায়। ঘরের এদিকে ওদিকে তাকায়। সবই যেন নূতন মনে

হয়, অচেনা। চোখ পড়ে ভণ্ডুলের উপর, সে কাছে বসিয়া, একেবারে গা ঘেঁষিয়া। কাজল বলে, তুমি! আপনি?

ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। ভণ্ডুল বলিল, তুমিই বল, সুইটি। হোয়াই আপনি?

কথাটা কাজল শুনিতে পায় কি না সন্দেহ।

সে যখন রথীনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে তখন তার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। সারাদিন উপবাসী, একটু জলও মুখে দেয় নাই। তার উপর আঘাত, অপমান। চারদিক সে অন্ধকার দেখে, অমাবস্যার চেয়েও গাঢ় অন্ধকার। তার পা টলিতেছিল। ফটকে আসিয়া সে ট্যাক্সি ডাকিল। ড্রাইভার গাড়ি থামাইল না। এই সময় 'হাউ নার্ভাস হাসি' (Hussy) বলিয়া পিছন হইতে ভণ্ডুল আসিয়া তাকে ধরিয়া না ফেলিলে রেলিংএর উপর পড়িয়া কাজলের মাথা কাটিয়া যাইত।

ট্যাক্সি ডাকিয়া ভণ্ডুল যখন তাকে গাড়িতে তোলে কাজল তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

চারু ও ভণ্ডুলের সেবাযত্নে বৈকালের দিকে কাজল একটু ভাল বোধ করে।

ডাক্তার আসিয়া বলেন, স্নায়বিক দৌর্বল্য।

চারু জিজ্ঞাসা করে, ভয় নেই ত?

তা নেই। তবে একটু সময় নেবে।

সমস্তটা দিন মীনা চারুকে জ্বালাইয়াছে। 'পাকিট থেকে সান্দেশ দাও।' 'বেলুন দাও।' বায়না তার কত। কাজল ফিরিলে সে জিদ ধরিল, মার কাছে যাব।

চারু তাকে কোলে করিয়া ছাদে ঘোরে, চকলেট দেয়, চাঁদ দেখায় কিন্তু কিছুতেই মীনাকে ঠাণ্ডা করিতে পারে না। শেষটায় সে শেমিজের বোতাম খুলিয়া বলে, নে পোড়ারমুখী, খা। খাবি কি? এ যে কাঠ।

মাসীর পরিপুষ্ট স্তন লইয়া খেলা করিতে করিতে মীনা ঘুমাইয়া পড়ে।

পরদিন সকালে তাকে আর রাখা যায় না। চারু নিজেই তাকে কাজলের কাছে লইয়া আসে। মেয়েকে দেখিয়াই কাজল চেঁচাইয়া উঠিল, বেরো হতভাগী, যা, যা আমার সামনে থেকে।

মায়ের মূর্তি দেখিয়া মীনা ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। চারুও ভয় পাইল। কাজলের এমন রুক্ষ রূপ সে কখনও দেখে নাই।

কাজল বলিল, জানিস আমি কুঠে ? কুঠ হয়েছে হাতে পায়ে। সর্ব অঙ্গে—বলিয়া সে হাতের আঙুলগুলি নিজের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, বেশ্যা, কুঠে।

চারু দ্রুত বাহির হইয়া যায়। মণিমালাকে ডাকিয়া আনে। দুজনে আসিয়া দেখে কাজলের চোখ বোজা। দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। মণিমালা বলিল, ওঁকে কাঁদতে দে, যত পারে কাঁদুক। আমাদের জীবনটাই ত কান্নার।

রথীনের মৃত্যু কাজলের জীবনের সব ওলট পালট করিয়া দিল। তার মনে হয় একটা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। রথীনের সাজানো ঘর, দামী আসবাব সব যেন তাকে বিদ্রূপ করে। চোখের উপর ভাসে রথীনের মার তীব্র চাহনি, চোখ না যেন দুটা টর্চ জ্বলে। কানে বাজে, খেলি রাক্ষুসী, খেলি আমার ছেলেকে ?

শুধু সন্তান-শোকাতুরা জননী নন, বাড়ির আর পাঁচটা লোকেও তাকে শুনাইয়া বলিল, ঐ বেশ্যাটার জন্যই সর্বনাশ হল।

সে বেশ্যা ! সে সর্বনাশ করিল ! কাজল বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি তার অপরাধ, এই সর্বনাশের জন্য সে দায়ী হইল কেমন করিয়া।

এক একবার রথীনের ছবির দিকে চাহিয়া সে প্রশ্ন করে, আমি কি তোমায় মেরেছি ? বল, বল !

ছবি কোন জবাব দেয় না।

কাজল কখনও বা মেয়েকে বলে, তুই ভাগ্যমন্তি বটে। আমার মেয়ে ত।

চারু মধ্যে মধ্যে আসিয়া প্রবোধ দেয়। কাজল বলে, তুই ত বোঝাস কিন্তু মন যে মানে না।

মানসিক অবস্থা চারুরও ভাল নয়। কাজলের দুর্ভাগ্য, নিজের দারিদ্র্য এ সব ত আছেই। তার উপর ভণ্ডুলের পরিবর্তনে সে ভয় পাইয়া গিয়াছে।

ভণ্ডুল এবার ছিল মাত্র চার পাঁচ দিন। কিন্তু এই ক'দিনেই দেখা গেল আগের সে মানুষ আর নাই। চারুর মনে হইল এটা তার ভাগ্যফল। হীরার খনি পাইয়াও সে রাখিতে পারিল না।

একদিন সে ভণ্ডুলকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি হয়েছে বল দেখি ?

ভণ্ডুল জবাব দেয়, এন্ট্যাঙ্গলমেণ্ট ভি. এস।

সে বলিতে চাহিয়াছিল, ভেরি সিরিয়াস এনট্যাঙ্গলমেণ্ট (খুব জড়িয়ে পড়েছি)। চারু ত দূরের কথা, তার এই কোডের মর্ম ভাল ইংরেজী জানা লোকেও সব সময় ধরিতে পারে না। চারু বলে, বাংলা করে বল লক্ষীটি।

ডিফিকাল্টি ভেরি গ্রেট। রথীন প্রমিস করেছিল আই. এইচ. এন-এ টাকা ঢালবে। কিন্তু হি ইজ ডেড্। পুওর চ্যাপি।

চারু প্রশ্ন করিল, আই. এইচ. এন. কি ?

ইণ্ডো হামবুর্গ নেব্রাস্কা। আমাদের কোম্পানি।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চারু যেন আলোকের সন্ধান পায়। বলে, মস্ত বড় কোম্পানি ত, তোমার কোম্পানি বুঝি! তুমিই কোম্পানি ?

ভণ্ডুল তার গালে টোকা দিয়া বলে, হাউ ইগনোর‍্যাণ্ট হাসি।

খ্যাঁদা পটলি, খোঁড়া হতু‍ঁকির সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডুল তাকেও হাসি বানাইয়া দেওয়ায় চারু মনে মনে রাগ করে। তার মুখ কালো হইয়া যায়। ভণ্ডুল ইহা লক্ষ্য করিয়া বলে, স্যুইট গুজ।

চারু বলে, বরং তাই বল, গুজ মানে ত রাজহাঁস ?

ভণ্ডুল হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ওঠে। তার এত প্রাণখোলা হাসি এবারে এইই প্রথম।

চারুর মনের মেঘ কাটিয়া যায়। তার খুবই টানাটানি চলিতেছিল। সে খায় তরুর ঘরে, বিনিময়ে রান্না করিয়া দেয়। ছোট বোনকে খাইতে দিতে হয় বলিয়া তরু বামুন তুলিয়া দিয়াছে।

চারু আশা করিয়াছিল ভণ্ডুল যাওয়ার সময় অন্ততঃ অন্য বারের মতন কিছু টাকা দিয়া যাইবে। কিন্তু সে না বলিয়া চলিয়া গেল।

চারু কাজলের কাছে দুঃখ করে। বলে, এখন উপায় ? দিদি ত আর আস্ত রাখবে না। সাহেবও ক'দিন খেয়েছে।

কাজল বলিল, তোর সাহেব আমার ড্রয়ারে একখানা খাম রেখে গেছে। বলেছে দিদিকে কিংবা তোকে দিতে।

চারু বলিল, তোর ড্রয়ারে কেন ?

কি করে জানব ভাই ?

ড্রয়ার খুলিয়া চারু ভণ্ডুলের লেখা একখানি কাগজ বাহির করিল। তরুর

নামে লেখা একখানা আই. ও. ইউ। চারুর খরচার বাবদ ভণ্ডুল তরুর নামে আড়াইশ' টাকার একখানি আই. ও. ইউ দিয়া গিয়াছে।

চারু ও কাজল ঠিক বুঝিতে পারিল না। চারু মণিমালার কাছে লইয়া গেলে সে হাসিয়া বলিল, মুখপোড়া মিনসে আবার হ্যাণ্ডনোট দিয়ে গেছেন।

কাজলের অসুখ একটু একটু একটু করিয়া কমে। ঘরে অন্য কেহ না থাকিলে সে ভাবে রথীনের কথা। তার স্নেহ যত্নের কথা। বুক বেদনায় টনটন করিয়া ওঠে। বেশ লাগে এই ব্যথায় ভরা অনুভূতি। সে তখন মানুষ চায় না। একা থাকিতে চায়। চায় ঐ অনুভূতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে।

রথীনের মৃত্যু এবং কাজলের অসুখের খবর পাইয়া একদিন প্রমীলা আসিল। তাকে অনেক সান্ত্বনা দিল, কি করবি? সবই ললাটের লেখন।

কাজল বলিল, হ্যাঁ, দিদি, একখানা বরাত করে এসেছিলুম বটে।

প্রমীলা বলিল, মনে কর আবার বিধবা হয়েছিস। জজ ম্যাজেষ্টর সোয়ামী মরে যায়, মেয়েরা তাও সহ্য করে থাকে। কথায় বলে, বাঙালীর মেয়ে হল পাষাণ পিতিমা।

প্রথমটা তবু একরূপ চলিতেছিল। একটু থামিয়া সে আবার বলিল, তবে তোর এই দুখ্‌খু ত বেশী দিনের জন্য নয়।

কাজল বলে, কেন?

নাকে সশব্দে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে প্রমীলা কথা ঘুরাইয়া নেয়। বলে, এরূপ দুখ্‌খু আমারও হয়েছিল। দু'দুবার। আমি পাথারে ভেসে গেনু।

কাজল নীরব।

খানিকক্ষণ উসখুস করিয়া প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাড়াটে পিয় একদিন এসেছিল না?

হ্যাঁ এসেছিলু দু'দিন।

দেখেছিস ত তুলসীর মালা আর রসকলির বাহার? শুনেছি এক বোষ্টমের আখড়ায় ও নাকি যাচ্ছে।

কাজল কহিল, সে ত ভালই। তবু ধর্ম কর্ম করছে।

ধম্ম না ছাই, শাস্তরে বলেছে বিরিঞ্চি বেশ্যা তপস্বী—এও তাই। রসি ছাই মাখছে, পিয় ফোঁটা কাটছে। রূপ নেই, নদীপারের মত যৈবন ক্ষয়ে যাচ্ছে। তাই ভোল বদলানো।

কাজল বলিল, তুমি একটু চুপ কর পিরমিলদি, আমার মাথা ঘুরছে।

তা ঘোরা আর বৈচিত্তির কি? অমন সোনার রথ পেয়েছিলি, মনের সুখে ত আর চড়তে পারলি না। যাই বল আমি কিন্তু বাবা ভেক নিতে পারলুম না। একেই বলে বনেদী। তা এপাড়ায় হলও ত আজ ছেচল্লিশ বছর, দেখতে দেখতে বাবিউলি হলুম।

প্রমীলা চলিয়া গেলে কাজল সেদিন খুব খানিকটা কাঁদিল। কাঁদিল যে কেন তাহা নিজেও বুঝিতে পারিল না।

কান্নার পর মাথা ঘোরে, গা ঝিম ঝিম করে, অবশ মনে হয়। মনে হয় চারিদিক অন্ধকার। সে এখনও সারিয়া উঠিতে পারে নাই। ওষুধে উপকার হইয়াছিল কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা চালাইতে পারিল না।

রথীনের অসুখের সঙ্গে সঙ্গেই তার এই অভাব শুরু হয়। রথীন মাসহারা দিতে চাহিয়াছিল, টাকা জমাইতে বলিত। কাজল প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সা নিত না। বলিত, জমাতে আমার বয়ে গেছে। তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি?

শুনিয়া একদিন মণিমালা বলে, উখো দিয়ে ঘষলেও যদি তোর বুদ্ধি হয়।

কাজল উত্তর করে, এক একজনের কিছুতেই বুদ্ধি হয় না, মালাদি। আমি সেই দলের।

সে হারাধন ডাক্তারকে খবর দিল। ডাক্তার আসিয়া বলিল, আগে ডাকনি কেন?

সামনে ছিল মণিমালা। বলিল, আগে ডাক্তারি হচ্ছিল।

আমাদের হোমিও কি ডাক্তারি নয়? এলোপ্যাথি হচ্ছিল বুঝি? হালে পানি না পেয়ে এখন ডক্টর হ্যারিডেন।

কাজলকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া হারাধন বলিল, নো ফিয়ার, দিচ্ছি ঠুকে এক ফোঁটা হাই ডাইলিউশন। হাতে তোমার মতন পেসেণ্ট আছেন দুজন। একটি কালী কেটকেটিয়ার ভাই নলিন কেটকেটিয়া। তারও এই অসুখ। বিরাট মারোয়াড়ী। বিড়লা ডালমিয়া কেলাস।

হারাধন কথা বলে আর পুরিয়া বাঁধে। কাজলের হাতে পুরিয়া দিয়া বলে, এইটে খাও, তারপর দশ দিন নো মেডিসিন।

একটু পরে সে আবার বলিল, আমার সামনেই খাও, ভক্তিভরে খেয়ো কিন্তু।

কাজল পুরিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া মুখে ঢালিয়া দেয়। হারাধন বলে, জয় গুরুদেব। জয় হ্যানিমান। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। বাহিরে কলকল শব্দে হাসি শোনা যায়। মণিমালা ও চারু দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তারের ভক্তি ও ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা আড়ালে যাইয়া হাসিতে লাগিল।

হারাধন কাজলের কাছে ফি চায়। আবার চারুর ডাক পড়ে। সে ডাক্তারকে জল পান ও চুন দেয়। হারাধন চারুকে বলে, চুন একটু বেশী করে দেবেন। এই আমার ফি, অবশ্য এই ফি শুধু কাজলের কাছে। এর পর তোমায় হাতে হাতে ফি দিতে হবে কিন্তু কাজল।

চারু বলে, ওকে সারিয়ে তুলুন, তখন দেবে বৈ কি।

হারাধন বলিল, আপনিও বেশ পান সাজেন দেখছি।

চারু হাসিয়া ফেলিল।

রথীনের মৃত্যুর পরই কাজল ওস্তাদজীকে তুলিয়া দেয়। তার পর চাকর বামুন। লখিয়াকে তুলিয়া দেওয়ার সময় সে বলে, তুমার কাম হাম মুফৎ করিয়ে দেব, দো দফে খাইতে দিও।

কাজল বলে, আমি ত তাও পারব না, বাবা।

তুমি রাণী আছ মা, রাজরাণী।

দুদিন পরে তোর এই রাণীমাকেও উপোস করতে হবে, লখিয়া।

লোকের কাজ করিয়া দিলে নিজেরও মঙ্গল হয় এই বিশ্বাসে তার পরও লখিয়া কাজলের হাট বাজার করিয়া দিত। নিষেধ শুনিত না। চাকরি পাইয়া কোতরং যাওয়ার সময় বলিয়া গেল, দরকার হোনেশে চিঠ্‌টি ভেজ দেও। হাম ফিন তুমহার পাশ নোকরি করবে।

কাজল অনেকের কাছেই অযাচিত স্নেহ পায়। তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের—

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু

পরকে করিলে ভাই।

হারাধন তার কেহ নয়। প্রিয়র পরিচিত ডাক্তার হিসাবে প্রথম আলাপ, সেও নানাভাবে সাহায্য করে। বিনা ফিতে দেখে, ওষুধের দাম নেয় না। কিন্তু কাজল তার ব্যবস্থা মত পথ্যের যোগাড় করিতে পারে না। নিজের হাতে তাকে রান্না করিতে হয়।

হারাধন বলে, বিশ্রামে থাকলে, ঠিক মতন পথ্যি পড়লে আমার ওষুধে কথা কইত।

কাজলের নিজের অবস্থা একরূপ অচল। এদিকে গণেশ ঘন ঘন পত্র লিখিয়া টাকা চাহিয়া পাঠায়। মাস দেড়েকের মধ্যে সে চারখানা চিঠি দিয়াছে। কাজলের অপরাধ সে পিতার ফটোর কথা লিখিয়াছিল।

গণেশ চতুর্থ পত্রে লিখিল,—

কল্যাণীয়াসু, স্নেহের কাজল, তোকে পর পর তিনখানি লিপি দিয়াছি। উত্তর না পাইয়া চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। তোর বৌদিও চিন্তাকুলা হইয়াছে। ভাল আছিস ? তোর মেয়েটি ভাল আছে ত ?

তুই বাবার ফটকের কথা লিখেছিলি। তারপর আর কোন উচ্চবাচ্য করিস নি। ৺শরৎ বদ্দির পুত্রেরা কেউ লাখনো থাকে, কেউ ডিব্রুগড়, কেউবা ড়িগবয়। তাদের কাছে চিঠি দিয়েছিলুম, জবাব পাইনি। আমার নিজেরই যেতে হবে দেখছি। কি করব ? তুই মায়ের পেটের বোন, তুই যখন লিখেছিস। তবে আমার অবস্থা ত জানিস। দক্ষিণে আনিতে বামে কুলায় না। যাতায়াতের খরচা আছে, ফটকের মূল্য আছে। বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিস। তুই ত বিচারক ভাল।

আমার ধারণা সর্বসাকুল্যে একশত টাকাতেই হইবেক। কি বলিস ? তোর অর্থ আমি হিসাব পূর্বকই ব্যয় করিব।

চিঠিখানি ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখা। কাটাকুটি অনেক। এই চিঠিখানায় ভিটা বন্ধকের কথাও ছিল। রামলোচনের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর ভিটা বন্ধক পড়িয়াছে। গণেশ এতদিন লজ্জায় জানায় নাই। চিঠিতে এইরূপ ইঙ্গিতও ছিল যে পৈতৃক ভিটা খালাসের জন্য সে যোগ্য ভাইয়ের মতন ভগ্নীর উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে !

আগের চিঠিগুলি কাজল রাখিয়া দিয়াছিল। এইখানা পড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তার মুখ দিয়া বাহির হইল, হতভাগা।

দুর্বল দেহ মন লইয়া দিন কাটে, দিনের পর দিন। মাথা ঘুরিয়া যায়। দুখের বোঝা হালকা করার জন্য কখনও বা গান গায়, গানগুলি বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের। কখনও রবীন্দ্রকাব্য পড়ে, পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যায়।

সাধন আসিলে কোন কোন দিন তার সঙ্গে রবীন্দ্র কাব্যের আলোচনা করে।

সাধন একদিন একটি কবিতা শুনাইল—'রথীন।' লেখাটি রথীন ও কাজলের প্রশংসায় ভরা। কাজল কহিল, এ কী করেছেন? যে সত্যিকার বড় তাকে বড় বলার সঙ্গে সঙ্গে আমায় এতটা বাড়িয়াছেন কেন?

সাধন কহিল, আপনিও বড়। কত যে বড় তা নিজেও জানেন না।

কাজল বলে, এরই নাম কবির চোখ।

কবির চোখে আজ সে এক নূতন চাহনি দেখে। এই দৃষ্টি মেয়েদের বিশেষতঃ সুন্দরীর খুবই চেনা। পুরুষের যে চাহনি দেখিলে তাদের রাগ হয় এ সে চাহনি নয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বেশী—কামনার চেয়ে আত্মনিবেদনের।

রথীনের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই তার দেওয়া গহনাগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল। রথীন কাজলকে গহনা দিয়াছিল খুবই কম। দয়িতাকে পোশাক-পরিচ্ছদে সাজাইতেই সে বেশী ভালবাসত।

কাজলের সম্বল এখন কাঠের কতকগুলি ফার্ণিচার, খাট টেবিল আলমারি।

তক্ক ভাড়ার জোর তাগাদা করায় সে একদিন তিন নম্বরকে ডাকাইয়া আনিল। এই ক' বছরে লোকটির পরিবর্তন হইয়াছে অনেক, কাঁচাপাকা গোঁফ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে—যেন দাঁত মাজার ছোট একজোড়া বুরুশ। সে হাঁটু ধরিয়া হাঁটে। প্রায় প্রতিপদক্ষেপেই ডানপা ঘুরিয়া যায়। কিছু দিন আগে সোনাবাগানে ছোট খাটো এক দাঙ্গা হয়—এই খঞ্জত্ব তারই ফল।

সে বলিল, কি খপর, দিদিমণি?

আমার কিছু কাঠের জিনিস আছে। বেচে দিতে পার?

তিন নম্বর বলিল, জরুর। লেকিন—

কাজল তার মুখের দিকে তাকায়।

তিন নম্বর বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিল, তুমহার জন্যে হামার পাশ বহুত বাবু ঘুমে যাচ্ছে।

শুধু তিন নম্বর নয় ফাগুয়াও আগে এক প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল। কোন্ এক বালতির রাজা নাকি কাজলের কাছে আসিতে চায়।

কাজল কহিল, ওসব থাক। তুমি একটি খদ্দের নিয়ে এস।

তিন নম্বর বলে জরুর।

দুদিন পরেই সে একটি খরিদ্দার লইয়া আসে, কাজলকে বলে, হামার্ দেশোয়ালী আদমী, ফকির শাউ। পুরানা কাঠ ঔর লোহালক্কড়কা আমির।

সঙ্গে সঙ্গে ফকিরকেও কহিল, ই সব বড়িয়া চিজ। এক আমির থা। উনকো বাপ্ বাঙ্ক্‌মে বহুত রুপেয়া রাখ্ গেইলো। ঔর জিম্‌দারি।

ফকির শাউ একটু হাসিয়া জিনিসগুলির উপর চোখ বুলাইয়া বলিল, হাম লাটকে লাট মাংতা।

কাজল ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে না। তিন নম্বর ব্যাখ্যা করে, লাট হায় লার্ড। বিলকুল চিজ।

কাজলের সমস্ত জিনিস বেচিতে ইচ্ছা ছিল না। সে বলিল, কিছু কিছু করে নিন।

ফকির শাউ বলিল, উস্‌মে কুছ নাফা নেই। স্রেফ তকলিফ।

উভয়েই ইতস্ততঃ করে। ফকির শাউ জানে, কাজল দুর্বল পক্ষ। সে তিন নম্বরকে বলে, চলো রামচরণ।

কাজলের আজই টাকার দরকার। দু মাসের ঘরভাড়া বাকী। তরু প্রমীলার মতন ঝাঁজালো কণ্ঠে তাগাদা করে না বটে কিন্তু তার মিষ্টি মিষ্টি কথায় হুল থাকে আরও বেশী। কাজলকে সে কাল বলিয়াছে, আর কেন? এবার রোজগারের চেষ্টা দেখ।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, কি করব দিদি?

তরু বলিল, তার মানে? তুমি কিছু মনে ক'র না। তুমি আর চারু তোমরা দুটিতে ভারী বোকা। একজন জোচ্চোর নিয়ে আর একজন মড়া নিয়ে মশগুল। মড়ার দাম কি বল দেখি?

যে ভাবে হউক তরুর টাকা আজ চুকাইয়া দেওয়া দরকার। কাজল তাই তিন নম্বরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কত দেবেন?

সমস্ত জিনিসের উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া ফকির শাউ বলে, দেড়শ রুপেয়া।

চেয়ার টেবিল আলমারি এত সব জিনিস, বেশী পুরাতন নয়, কাঠ ভাল, শৌখিন গড়ন—এর দাম মাত্র দেড়'শ টাকা! কাজল অনেক বেশী আশা করিয়াছিল।

দরদস্তুর করিতে সে জানে না। তবু একবার বলিল, এত কম!

ফকির শাউ বলিল, বাজার বড় মন্দা আছে, বিবি সাব। মিট্টিকা মাফিক।

সমস্ত জিনিসের দাম শেষ পর্যন্ত দুইশত টাকা ঠিক হয়—বাদ শুধু দুইখানি ছবি। একখানি রথীনের তৈল চৈত্র, অপরখানি ক্রুশ লগ্ন এক কিশোরীর।

সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে। কী তুফান! পাহাড়ের মত এক একটা ঢেউ, তার মধ্যে কিশোরীটি ক্রুশ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। তার চোখেমুখে অদ্ভুত নির্ভরতা।

এক একটা করিয়া মাল লরিতে তোলা হয়। মীনা ও কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। সুন্দর একখানা আয়না ধরিয়া মীনা বলে, এটা আমি দেব না।

ফকির শাউ বলে, দেও বেটি দেও। দু' পৈসাকা লিবিনচুষ দেগা।

না দেব না, কাকাবাবুর আয়না।

রথীন এই আয়নাখানায় মুখ দেখিত, এটা ছিল তার শখের জিনিস। মীনা দেবে না। ফকিরও নাছোড়বান্দা। দু'পয়সা চার পয়সা করিয়া সে দু'আনা পর্যন্ত ওঠে। মীনাকে দু'আনার মালাই বা গোলাপী রেউড়ী খাওয়াইতে চায়। মীনা মাথা নাড়াইয়া বলে, না, না। কাকাবাবুর আয়না।

কাজল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। সে এবার ফকির শাউকে বলিল, দয়া করে আয়নাখানা রেখে যান।

ফকির শাউ বলে, আচ্ছা জানে দেও। আমার কুছু নোকসান হোবে।

টাকা দেওয়ার সনয় আয়নাখানার জন্য সে কুড়িটা টাকা কাটিয়া রাখিল।

এই আসবাব পত্রের মধ্যে রথীনকে যেন ধরা ছোঁয়া যাইত। ফকিরের লোক জিনিসগুলি সরাইয়া নেওয়ার পর কাজলের ঘরখানা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

মনিমালা দীন দালালের সঙ্গে উকিল বাড়ি গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এ কী! ঘরের এ দশা কেন?

কাজল কহিল, সব বেচে দিয়েছি।

পেলি কত?

এক শ' আশি টাকা।

এক শ' আশি! বলিস কী? খাট খানার দামই হবে তিন শ' আলমারিটাও শ' দুই, তার উপর চেয়ার টেবিল আয়না। তুই আমায় আগে বলিস নে কেন? আমি ভাল খদ্দের যোগাড় করে দিতুম।

তুমি মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছ, তাই ভরসা করে বলি নি।

সন্ধ্যার সময় গা ধুইয়া ঠাকুরের আসনের সামনে ভোগ দিতে আসিয়া কাজল দেখে মীনা রথীনের আয়নাখানি বুকে করিয়া শুইয়া আছে। তার একখানা হাত মাথার নিচে, আর একখানা দিয়া সে আয়না আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

কাজল বলে, পোড়ামুখী, কাকাবাবুকে তুই যে এত ভালবাসতিস তা ত জানতুম না।

কাজল তরুকে দু'মাসের ভাড়া একশ কুড়ি টাকা দিলে সে বলিল, এবার ত কাঠ বেচে ভাড়া দিলে। এর পর বেচবে কি? আছে ত ঐ দেহখানা। তা আগে থেকেই—

সবটা শুনিবার জন্য কাজল আর অপেক্ষা করে না। চারুর কাছে আসিয়া দুঃখ জানায়, দিদি একথা বললে কি করে ভাই?

চারু বলে, ও সব পারে। রঘু উকিল এক যুগ ধরে যাতায়াত করছে, তাকে কেমন মুখের উপর বলে দিলে, ঘণ্টায় পনর টাকা দিতে না পারলে আর আসবেন না।

কাজল কহিল, না পোষালে বলবেই ত। ওটা হল ব্যবসার কথা।

তা হলেও তুই আর আমি পারতুম না। দিদি পারে। আমায় বলছিল, ঝি তুলে দেবে।

কাজল কহিল, ঝিও তুলে দেবে?

আমি যে মায়ের পেটের বোন। আমায় খেতে দিতে হয়।

ফার্নিচার বেচার আগেই হাওলাত বরাত শুরু হয়। ভাড়ার টাকা ও দেনা পরিশোধ করিয়া কাজলের হাতে কিছুই থাকে না। সে একদিন সাধনের কাছে জিজ্ঞাসা করে, কি করি বলুন দেখি?

সাধন বলিল, তোমার জন্য সিনেমায় চেষ্টা করব? নতুন লাইন, ভবিষ্যৎ ভাল।

বেশ ত।

এ দেশে ছায়াচিত্রের তখন আদি যুগ। বাংলায় তোলা ছবির সংখ্যা আঙুলে করিয়া গোনা যায়। সাধন বলিল, এক ফিল্ম কোম্পানির মালিক আমার বন্ধু। তাকে নিয়ে আসব?

কাজল বলে, এই ঘরে ভদ্দর লোক নিয়ে আসবেন? বসবার একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই।

সাধন কহিল, তাতে কি হয়েছে? সে তোমার এই মাদুরেই বসবে।

কয়েক দিন পরে সে সিনেমার মালিককে লইয়া আসিল। মানুষটি স্থূল-বপু, প্যাণ্ট কোট পরা, কেমন যেন আঁটসাট ভাব। দেখিলে মনে হয় প্রমাণের চেয়ে ছোট অড় পরানো একটি তাকিয়া।

সাধন তাদের পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দেয়, শ্রীমতী কাজল দেবী, বি. গুপ্‌টা।

ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, হা ডু ডু—বলিয়া করমর্দনের জন্য গুপ্‌টা হাত বাড়াইয়া দেয়।

দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া কাজল বলে, নমস্কার।

গুপ্‌টা প্রতিনমস্কার করিয়া বলে, ভারী লজ্জা দিলেন ত আমায়। আপনার কথা কবির কাছে অনেক শুনেছি। ও বলে, কাজল ইজ এ জেম। কথাটা খাঁটি সত্যি। শুনলাম আপনার সিনেমা লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?

কাজল বলে, আমার যে অবস্থা তাতে যা-হ'ক একটা কিছু পেলেই হয়।

কাজলের অকপটতায় গুপ্‌টা ভারি খুশি হয়। বলে, আমরা আপনার মতই একজন আর্টিষ্ট খুঁজছিলুম। আন্‌সফিস্টিকেটেড্ আর ডিভাইন্‌লি টল এণ্ড ডিভাইন্‌লি ফেয়ার।

এই প্রশংসায় কাজল বড় সঙ্কোচ বোধ করে।

গুপ্‌টা সাধনের দিকে চাহিয়া বলে, মিস কাজল হবেন আইডিয়াল কাঞ্চনজঙ্ঘা। কি বল, কবি?

সাধন উৎসাহের সহিত বলিল, নিশ্চয়। এমন ডিভাইন্‌লি টল এণ্ড···

কাজল ত অবাক। নিজের রূপের প্রশংসা অনেক শুনিয়াছে কিন্তু তার মধ্যে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা বনিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এ কথা সে কখনও কল্পনা করে নাই। অপরেও ইঙ্গিত করে নাই। সে একবার গুপ্‌টার দিকে চায় আবার চায় সাধনের দিকে।

গুপ্‌টা বলে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এভারেষ্টের হেরোইন।

সাধন ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়, এভারেষ্ট একখানা রূপনাট্য, গুপ্‌টার লেখা। হিরোর নামে বই'র নাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা তার স্ত্রী।

কাজল বলিল, আমি কি পারব?

গুপ্টা ও সাধন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়।

এরপর গুপ্টা কাজলের আবৃত্তি শুনিতে চায়। কাজল জিজ্ঞাসা করে, কি শুনবেন?

রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা।

কাজল বলে, বেশ।

বই আছে?

বই আছে। তবে দু'চারটে মুখস্থও বলে যেতে পারি।

সাজাহান?

হ্যাঁ।

উর্বশী?

কাজল মাথা নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ।

বেশ, উর্বশী শোনান।

কাজল আবৃত্তি করে,

নহ মাতা, নহ কন্যা,
নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী।

গুপ্টা বলে, খাসা। এমন হাই ক্লাস আবৃত্তি শিখলেন কার কাছে?

সাধন বলিল, রথীন বাবুর কাছে। রথীন বাঁড়ুয্যে, যিনি তোমাদের সময় প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন।

ওঃ, মোহিনী বাঁড়ুয্যের নাতি? আমাদের চেয়ে দু'ক্লাস নিচে পড়তেন। হি ওয়াজ জেম অব এ ম্যান। আর ফিলজফার। ঐ বুঝি তাঁর ছবি?— বলিয়া গুপ্টা রথীনের তৈলচিত্রের দিকে তাকায়।

সামনাসামনি দু'খানি ছবি। তৈলচিত্রের বিপরীত দিকেই ক্রুশলগ্না কিশোরী। গুপ্টা মন্তব্য করে, ছবি দু'খানা দেখলেই মিস কাজলকে চিনে নেওয়া যায়।

তারপর কাজলের হাতে একখানা বাঁধানো খাতা দিয়া সে বলিল, এইটে এভারেষ্টের পাণ্ডুলিপি। একটা জায়গা পড়ে শোনান ত।

কাজল কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সে অল্প কিছুটা পড়িলে গুপ্টা খাতাখানা চাহিয়া আর একটা জায়গা দেখাইয়া বলে, এইটে পড়ুন।

মনে মনে প্রথম ছত্র পড়িয়াই কাজল চোখ বিস্ফারিত করিল। গুপ্টা বলিল, গো আন, প্লিজ গো আন।

অস্বস্তি বোধ করা সত্বেও গুপ্‌টার নির্বন্ধাতিশয্যে কাজল শেষটায় পড়িতে আরম্ভ করে, এভারেষ্ট প্রাণেশ্বর।

গুপ্‌টা বলিল, আমার দিকে চেয়ে আরও জোরে বলুন।

কাজল তার দিকে চাহিয়া কহিল, এভারেষ্ট প্রাণেশ্বর।

বেশ, বেশ। আমি এভারেষ্ট আর আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘা—গুপ্‌টা ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের গা দিয়া ঘাম ঝরিয়া গেল।

পড়ার সময় তার গলা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল, গুপ্‌টা বলিল, প্রাণেশ্বর বলতে বলতে ঠিক হয়ে যাবে।

সাধন নীরব সাক্ষীর মত সব দেখে। এতক্ষণ সে কোন রকমে হাসি চাপিয়াছিল। এবার আর পারিল না।

আবৃত্তির পর গানের পরীক্ষা। কাজল গায় নজরুলের—

অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।

এই সময় গুপ্‌টার চোখে পড়ে তার সিঁথির পাশের দাগ। সে বলে, আপনার সবই সুন্দর। গান, আবৃত্তি এমন কি ঐ দাগটা পর্যন্ত। পড়ে গিছলেন বুঝি?

কাজল অন্যদিকে চাহিয়া বলে, হুঁ।

গুপ্‌টা বলিল, এই পতনে আপনার সৌন্দর্য আরও বেড়েছে।

কাজলের মনে হয় বিধাতা এই মানুষটির মধ্য দিয়া তাকে কত রকমেই না পরিহাস করিতেছেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে গুপ্‌টা বলিল, আমি তবে খালাস। এবার গাভ্‌নার এসে কণ্ট্রাক্ট করে যাবেন। আমার ইচ্ছে আপনি আমাদের কোম্পানির এক্সক্লুসিভ আর্টিষ্ট হ'ন—স্থায়ী শিল্পী।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, গাভ্‌নার কে?

উত্তর করিল সাধন, বিনয় বাবাকে গাভ্‌নার বলে। ওঁরা বাপ ছেলেয় একসঙ্গে বিজনেস করছেন।

গুপ্‌টা বলিল, সে হিসাবে আমাদের 'লালুয়া' খুব সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। আমাদের গ্রামের নামে বাবা কোম্পানির নাম রেখেছেন, লালুয়া ফিল্মস। এখানে কোন ফষ্টিনষ্টি হবার জো নেই। ফাদার এণ্ড সন এক সঙ্গে চালাচ্ছি। লালুয়ায় বাপ ও মেয়ে একত্র প্লে করতে পারে।

সাধন বলে, ওর বাবা নারী জাতির বিশেষ বন্ধু।

গুপ্‌টা কহিল, তাঁর নাম ব্রিটিশ পাউণ্ডের মত রেসপেক্টবল্‌। কাজল দেবীও হয়ত শুনেছেন, পুরাণসিন্ধু—

হিপনটাইজ করা মানুষের মতন কাজল বার দুই অর্ধস্পষ্ট স্বরে আওড়ায়, পুরাণসিন্ধু, পুরাণ—

গুপ্‌টা বলে, বাবার নামও জানেন দেখছি। জানবেনই ত। হৈমবতী অবলা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, নারী বাহিনীর ক্যাপ্টেন—

সে পিতার কর্মজীবনের ফিরিস্তি শেষ করিবার পূর্বেই কাজল বলিল, আপনারা বসুন। আপনাদের জন্য আমি একটু চা করে আনি।

গুপ্‌টার জিহ্বা যেন সরস হইয়া উঠিল। সে কহিল, মিঠে হাতের চা। ভাল, ভাল।

কাজল উঠিয়া সোজা চারুর ঘরে যায়। তাকে বলে, তুই কবিদের জন্য চা কর দেখি। আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নি।

চারু বলে, কেন, এই অবেলায় তোর গড়াবার কি হ'ল ?

হয়নি কিছু। দেখছিলুম বরাতজোর। বিধাতা আমায় নিয়ে কি ছিনিমিনিই না খেলছেন! ঠিক যেন ছোটদের পায়ে গড়ানো বাতাবি লেবুর বল।

সে চারুর কাছে পুরাণসিন্ধুর গল্প করিয়াছিল, হৈমবতী অবলা আশ্রমের বৃদ্ধের হাতে সেই লাঞ্ছনার কথা। আজ বলিল, কবি এসেছে সিন্ধুর বাচ্চাকে নিয়ে।

চারু জিজ্ঞাসা কর, সে আবার কে ?

দেখছিস ত ঐ লোকটাকে ? ঐ বেঁটে হবেন এভারেষ্ট আর আমি ওঁর প্রাণেশ্বরী কাঞ্চনঝঙ্ঘা !

দুই বান্ধবী খুব খানিকক্ষণ হাসে। সাধনরা বিদায় লওয়ার আগে কাজল তাকে একান্তে ডাকিয়া বলে, আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দিন ওদের কোম্পানিতে আমার পোষাবে না।

সাধন বলে, কেন ?

সে পরে বলব।

ও খুব আশা করেছিল।

না, আপনি ওকে বল দিন।

লোকটি ছিল ভাল, বিয়ে করে নি, নিরামিষ খায়।

কাজল কহিল, তাতে ভয় আরও বেশী।

মীনার অসুখ। জ্বর হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হারাধন আসিয়া বলিল, এখনই ওকে হাসপাতালে পাঠাও।

কাজল বলিল, কেন, ওষুধে কিছু হয় না?

হ'লে ত গুরুর নাম নিয়ে দিতুম ঠুকে এক ডোজ হাই ডাইলিউশন। অবশ্য হোমিওপ্যাথিকে এর ওষুধ আছে। ডক্টর দত্ত, আমার গুরুদেব—এঁদের কাউকে ডাকতে পারলে সুরাহা হয়। কিন্তু তা ত সম্ভব নয়।

বত্রিশ, চৌষট্টি টাকা ফি'র ডাক্তার ডাকা ত দূরের কথা, মেয়েকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার গাড়ি ভাড়ারও সংস্থান নাই। মণিমালা বাড়ি ছিল না। তরুর কাছে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। শুধু অসম্ভব নয়, সাহায্য চাহিতে গেলেই সে বলিবে, আর কেন? অমন দেহখানা রয়েছে—

কাজল ভাবিতেছিল, এখন উপায়!

হারাধন বলিল, তুমি কি যেন ভাবছ মনে হয়। ব্যাপার কি বল দেখি?

আমার—আমার কাছে যে একটি পয়সাও নেই। গোটা পাঁচেক টাকা—

ওঃ, এই কথা? এতে লজ্জার কি? আমার কাছেও খুচরো নেই। এই নাও—বলিয়া হারাধন দশটাকার একখানা নোট দেয়।

কাজল হাত পাতিয়া টাকাটা নিয়া বলিল, খুব শক্ত বুঝি?

নিশ্চয়। নইলে আমি কি পিছু পা হই? ডক্টর হোয়াইটহেড কি বলেন জান ত?

হারাধনের সম্পর্কে ডক্টর হোয়াইটহেডের অভিমত কাজল অন্ততঃ বিশ বার শুনিয়াছে। সে কহিল, তা জানি বই কি। মীনুর অসুখের নাম কি?

মেনিঞ্জাইটিস। বাড়িতে সেবা শুশ্রূষা চালানও অসম্ভব।

কাজল রিক্‌শা ডাকাইয়া, তরুর চাকর সখিয়ার সঙ্গে মেয়েকে লইয়া হাসপাতালে গেল। সেখানে ডাক্তার বলিলেন, ডায়গনোসিস ঠিকই হয়েছে। কতকগুলো দামী ওষুধ ইন্‌জেকশন আপনাদের কিনে দিতে হবে।

হাসপাতালে দেবে না?

না।

কাজল দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, আমি যে বড় গরিব ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার কহিলেন, এইই নিয়ম।

লাগবে কত ?

তা অনেক। আপাততঃই চল্লিশ।

টাকার অঙ্ক শুনিয়া কাজলের মাথা ঘুরিয়া যায়। সে ফিরিয়া আসিলে মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? হাসপাতালে কি বললে ওরা?

বলেছে অসুখ ঐই। ওষুধ ইন্‌জেকশনের দাম আমায় দিতে হবে?

ওঃ, মুখপোড়ারা এই রকমের দাতব্য খুলেছে বুঝি? তা লাগবে কত?

এখনই চাল্লিশ, শেষ পর্যন্ত কত লাগবে জানি না।

মণিমালা একটুক্ষণ ভাবিল, ঠোঁট নাড়িয়া কি যেন হিসাব করিল তারপর বলিল, তা হলে মেয়েটা বাঁচবে ত?

ডাক্তাররা বলেছে খুব শক্ত। তবে খরচা করলে বাঁচানো যেতে পারে।

মণিমালা বলিল, বেশ, টাকার কাজ আমি চালিয়ে দেব'খন।

কাজল কহিল, তোমার মামলার টাকা তাড়াতাড়ি দরকার, আমি শোধ করব কি করে?

তাই বলে মেয়েটা মরে যাবে? সে হয় না। আমার সব টাকাই ত আজ লাগছে না?

মণিমালা কাজলের আপত্তি শুনিল না। পঞ্চাশটি টাকা লইয়া তাকে সঙ্গে করিয়া হাসপাতালের দিকে রওনা হইল।

রিক্‌শায় বসিয়া কাজল অনেক কিছুই ভাবে। মেয়ের অসুখ, সে বাঁচিবে কি না কে জানে? ভাবে নিজের ভবিষ্যতের কথা। অজানা এই যাত্রাপথের শেষ কোথায়?

পাশেই মালাদি বসিয়া। নিজে সে বেশ্যা, বেশ্যার মেয়ে। কিন্তু কী উদার! পয়সার জন্য আগে লোকে তাকে খাতির করিত। কিন্তু পুলিসে ধরার পর হইতে পাড়াটা তার নিন্দায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা আসিয়া সেদিন বলিয়া গেল, মালীর কথা ছেড়ে দাও। খচ্চর ওদের ঝাড়, যেমন ছিল মা, তেমনি মেয়ে। যাই বল, হিল্লী, দিল্লী অনেক করলাম। কিন্তু কুকিনের কারবার কখনও করতে পারলাম না।—বলিয়া সশব্দে নাকে খানিকটা নস্য গুঁজিল।

কাজল সেদিন বলিয়াছিল, তা করলেই পারতে। তবু গাড়ি ঘোড়া হত।

বহু নিন্দিত সেই মণিমালা আজ তাকে সাহায্য করিল গাড়ি ঘোড়া বেচার

টাকা দিয়া। তার আয় বন্ধ। ব্যয় প্রচুর। মামলার তদ্বির করে দীন দালাল। মণিমালাকে সে নানাভাবে শোষণ করিয়া নেয়।

পুলিশের সেজ সাহেব লাউরি গহনা ফেরত দেয় নাই। বলিয়াছে, গয়না সেফ কাষ্টডিতে আছে মনে কর। একেবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

মণিমালা উহা লইয়া হাসাহাসি করে, কালে কালে কত দেখব। লাউরি সেজেছেন রিজেভ ব্যাঙ্ক।

গাড়ি ঘোড়া বেচার দৃশ্যটা ভারি করুণ। ঘোড়ার দালাল ফণীবাবু ক্রেতা লইয়া আসিলে মণিমালা বলিল, ঘোড়াটা আপনার কাছে কিনেছিলুম। আপনিই ব্রেক করে দিলেন। জানেন ত ও কী শখের জানোয়ার। রাস্তা কাঁপিয়ে চলত। একদিন চাবুক মারিতে হয় নি।

ফণীবাবু বলেন, দুঃখ কি? ওর চেয়ে সরেস জানোয়ার কিনে দেব, অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার।

রাজুর মতন কি হবে?

মণিমালা ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলে, দায়ে পড়ে শেষটায় তোকেও বেচতে হল, রাজু।

রাজু ছিল তার ছোট ভাইর নাম। তাকে সে বড় ভালবাসিত। ছেলেটি শৈশবেই মারা যায়। সেই হইতে মণিমালা খরগোস, বিড়াল, কুকুর, টিয়া অনেক পশু পাখী পুষিয়াছে। তার অনেক গুলিকেই ডাকিয়াছে রাজু বলিয়া।

একটি চতুষ্পদ প্রাণীর কাছে নিজের অভাব জানাইতে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই উপস্থিত মানুষদের দিকে চাহিয়া মণিমালার লজ্জা করিতে থাকে। সে বলে, বেচলুম কেন জানেন, ফণীবাবু? ঠিক অভাবে নয়। বেচে কিনে কাশী যাব ভাবছি। আপনাদের কলকাতার উপর ঘেন্না ধরে গেছে—বলিয়া মণিমালা হাসে। শেষের কৈফিয়ত এবং হাসিটুকু দৃশ্যটাকে আরও মর্মস্পর্শী করিয়া তোলে।

কোন্ রাস্তা 'মাইজী'—রিকশা কুলির এই প্রশ্ন কাজলের চিন্তাধারায় বাধা দেয়। সে বলে, আমি ত জানিনে বাবা। যেতে হবে ক্যাম্বেল হাসপাতাল।

মণিমালা বলিল, ডাইনে যাও। তারপর কাজলের দিকে চাহিয়া কহিল, দেখলি, একবার জিজ্ঞেস করি নি যে মীনুকে কোন হাসপাতালে দিয়েছিস?

কাজল জিজ্ঞাসা করে, ক্যাম্বেলে এ সব অসুখ সারে ত?

কেন সারবে না? হাসপাতালটা ত ভালই। তবে অসুখ সারা না সারা

ভগবানের হাত। তুই কিছু ভাবিস নে। মধু ঠাকুরকে দিয়ে এক নাম চণ্ডী পড়িয়ে নেব। আমার জন্তে রোজ সে কালিঘাটে সস্তেন করছে।

তোমার দেখছি খরচা হচ্ছে চারধার দিয়ে।

মণিমালা বলিল, তা আর হবে না? কাছারির উকিল ব্যারিষ্টারকে আগাম টাকা দিচ্ছি, আর গুরু পুরুতকে দেব না? ওঁরাও ত উকিল।

বেশ, মধু ঠাকুরকে ব'ল মীনুর জন্তেও যেন সস্তেন করে।

হাসপাতালে মণিমালাই ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলিল, তাঁর হাতে ঔষধ ও ইন্জেকশনের টাকা দিল।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, আবার কিনতে হবে কবে?

ডাক্তার বলিলেন, আজ আর নয় কাল কি পরশু লাগবে।

আমাদের একজনকে থাকতে দেবেন না? আমি মীনুর মা।

না, এখন নয়। একটু কমলে যা হ'ক ব্যবস্থা করব।

এখন দেবেন না কেন?

মেনিঞ্জাইটিসের চিকিৎসায় বড় যন্ত্রণা। আত্মীয়দের দেখতে দেওয়া হয় না।

কাজল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। ডাক্তার বললেন, মেয়ের বাবাকে বরং পাঠিয়ে দেবেন।

কাজল কহিল, তিনি ত……

ডাক্তার কহিলেন, মাই গড্। নেই বুঝি? যাক্ কাল সকালে আবার খবর নেবেন।

রথীনের গড়া কল্পনালোকে বাস করিয়া জীবন সম্পর্কে কাজলের যে ধারণা ছিল দিনের পর দিন তাহা খুলিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এক একটা নূতন অভিজ্ঞতা হয় আর জীবনের বাস্তব রূপ কুৎসিত ভাবে প্রকট হইয়া পড়ে।

পয়সা না পাইলে হাসপাতালের ধাঙড় মেথররা ভাল করিয়া কথার জবাব দেয় না। আবার ডাক্তার ও ছাত্রেরা তাকে দেখিলেই আগাইয়া আসে। কোন রকমে তার সঙ্গে দুটা কথা বলিতে পাইলে যেন ধন্য হইয়া যায়। মীনা কেমন আছে এই প্রশ্নের উত্তরে সকলে একই জবাব দেয়, আছে বেশ, ভয় নেই।

কাজল বোঝে যে সত্যকার অবস্থা তারা জানে না, বোঝেও না।

জলের মতন টাকা খরচ হয়। পরের টাকা। কিন্তু চোখ দিয়া মেয়েকে

একটি বার দেখারও উপায় নাই। যন্ত্রণাদায়ক রোগ কিন্তু চিকিৎসার যাতনা নাকি আরও বেশী। বাপ মা তাহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না।

একদিন একটি তরুণ ছাত্র কাজলকে মেনিঞ্জাইটিসের চিকিৎসার বিবরণ দিল। বলিল, এর প্রধান চিকিৎসা লাম্বার পাংচার।

মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল ছেঁদা করে ভিতর থেকে তরল পদার্থ বার করা হয়।

কাজল বলিল, তাতে খুব কষ্ট-হয় বুঝি ?

তা হয়।

কাজল ছেলেবেলায় নাপিতের ফোঁড়া কাটা দেখিয়াছে। রোগীকে বলির পাঁঠার মতন চাপিয়া ধরিয়া ছুরি চালায়। রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, নাপিতকে গালি দেয়। সে তখন ভাবিত এটা হাতুড়ে চিকিৎসার স্বরূপ। মীনার চিকিৎসার যাতনার কথা শুনিয়া আজ তার মনে হয় চিকিৎসা শাস্ত্রটাই বোধ হয় এই রকম অন্ধকারে হাতড়ানো।

রাত্রে তার ঘুম হয় না। খালি ভাবে মীনার যন্ত্রণার কথা। চারুকে বলে, এরপরও যদি না বাঁচে ত দুখ্‌খু রাখব কোথায় ?

চারু বলে, ভাবনা নেই, মীনা সেরে উঠবে।

একদিন সকালে সুবালা আসিয়া বলিল, আগে জানতাম না। কাল বাস্তু-ঘুঘুর কাছে শুনলাম মীনার খুব অসুখ। সে নাকি হাসপাতালে ?

প্রিয়, সুবালা, রসবতী প্রমীলাকে তার সামনে বলে, বাস্তু দেবতা। নিজেদের মধ্যে বাস্তুঘুঘু।

কাজল বলিল, হ্যাঁ, মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে।

সুবালা প্রশ্ন করিল, ভয় নেই ত কিছু ?

ডাক্তাররা ভরসা দিচ্ছে। তবে এখনও জ্ঞান হয় নি।

ভয় নেই, ও সেরে উঠবে। ওর বালা জোড়া কোথায় ?

প্রশ্নটা অদ্ভুত। কাজলের কানে কেমন যেন বাজে। সে বলে, তুই যেটা দিয়েছিলি ?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আরো খানিকটা সোনা দিয়ে বড় করে গড়িয়ে দিয়েছিল। বাক্সেই তোলা ছিল, মীনু হাসপাতালে যাওয়ার সময় পরিয়ে দিয়েছি।

সবাই রথিবাবুর দেওয়া বলেই জানে ত ?

না, জানে মীনুর সুবল মাসী দিয়াছে।

সুবালা বলিয়া উঠিল, এই রে!

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কেন, হল কি?

এদিক ওদিক চাহিয়া সুবালা বলিল, আমার তামাকওয়ালা বাবুকে কাল পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

সুবালার নূতন তামাকওয়ালা বাবুর কথা কাজল জানিত। বালাখানায় তার দোকান। সে বলিল, কেন, হয়েছে কি?

তার বাড়িতে চোরাই মাল পেয়েছে। শেষ রাত্তিরে তাই আমার ঘরেও খানাতল্লাশ হল। গালপাট্টাওয়ালা পাহারাওলা আর সার্জিন এসেছিল এক দঙ্গল।

পায় নি ত কিছু?

না ভাই। কিন্তু তম্বি যা করলে, আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি।

ভয় কিসের?

ভয় পুলিসকে তত নয়, যত রসিকে। জানিস ত, রসি আমাদের শত্তুর মনে করে। তোকে ভালবাসি বলে পিয়কে আর আমাকে ও দু' চক্ষে দেখতে পারে না।

তার জন্য ভয় করবি কেন?

পুলিস যাওয়ার পর থেকে সে খালি গজর গজর করছে। আমি চোর, তার ঘরের যে সব মাল চুরি গেছে সবই নাকি আমি নিয়েছি। আড়াই বছর আগে সোনা হারিয়েছিল—

কথার মাঝপথে সে থামিয়া গেল। তার চোখের দিকে চাহিয়া কাজল বলিল, আচ্ছা সত্যি করে বল্ দেখি ব্যাপারখানা কি? সেই সোনার সঙ্গে মীনুর বালার কি সম্পর্ক?

সুবালা কাজলের হাত ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। বলে, তুই আমায় মাফ কর্ ভাই!

কাজলের মনে পড়ে মীনার হাতে বালা পরাইবার সময় সুবালার ভয়ত্রস্ত চাহনি, অস্বাভাবিক হাব ভাব। সেদিন কাজলকে সে অনুরোধ করে, মেয়ের হাত থেকে বালা খুলে রাখিস ভাই।

কাজলের চোখে ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। তারপর সে ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ বলিল, মেয়েকে যৌতুক দিতে গিয়ে শেষটায় চুরি করেছিলি?

সুবালা কোন জবাব করে না, ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকায়। কাজলকে ভালবাসিয়া আড়াই বছর আগে যে কাজ করিয়াছিল আজ তার কি কৈফিয়ত দিবে? কেন যে চুরি করিল নিজেও তাহা ভাবিয়া পায় না।

কাজলের সামনে সে অপরাধীর মত বসিয়া থাকে। কাজল যেন হাকিম, সে আসামী। কাজল তাকে যে কোন শাস্তি দিবে তাহাই সে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে।

কিন্তু কাজল ত শাস্তি দেওয়ার মানুষ নয়। শেষটায় চুরি করলি—এইটুকু বলিয়াই সে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

একটু পরে সুবালা বলিল, এখন উপায়?

কাজল বলে, উপায় আবার কি? মীনুর হাত থেকে বালা খুলে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেব।

দিস ফেলে, পাপের চিহ্ন না থাকাই ভাল। পুলিস কোত্থেকে কি বার করবে তার ঠিক নেই। রসির ঘরে আজকাল আবার একটা পাহারাওলা আসছে।

কাজল জানে রসবতী সাধুর ভস্ম মাখে, তার ঘরে লোক আসে শুনিয়া সে বিস্ময় বোধ করে। সুবালা বলে, রসি যে সাধুর ছাই মাখে পাহারাওলাও তার চেলা।

এত দুঃখের মধ্যেও কাজলের হাসি পায়। সে জিজ্ঞাসা করে, পাহারাওলা ছাই মাখে না?

সুবালা বলে, সে বুড়োমিনসে মাখে এস্নো আর ক্রিম।

কাজল হাসপাতালে যাইয়া শুনিল মীনার অবস্থা কিছুটা ভাল। সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই, কিন্তু সুতার মতন নাড়ী পাওয়া যাইতেছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল, সুতোর মতন নাড়ী পাওয়া কি ভাল?

ডাক্তার কহিল, মোটেই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু পাচ্ছি।

নাড়ী কি রকম হলে ভাল হয়?

আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল। আমি ত কবরেজ নই।

কাজল সেদিনও মেয়েকে দেখিতে পাইল না। নার্সকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মীনার হাতে বালা নাই। চোরের উপর বাটপাড়ি হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া সুবালা বলিল, জানি না আমার বরাতে কি আছে।

মীনা সারিয়া উঠিল। মেয়ের মঙ্গল চিন্তার চেয়ে এবার কাজলের কাছে বড় হইয়া উঠিল দেনার চিন্তা। মণিমালার দেনা কি করিয়া শোধ করিবে?

সে টাকা চায় নাই। কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিল, উকিলদের টাকা দিলেও চলে। ব্যারিষ্টারদের আবার চাই জেম। তাও আগাম, ঢং দেখ না।

আর কয়েকদিন পরেই হাইকোর্টে তার আপিলের শুনানি হইবে। তার আগে টাকা শোধ করা দরকার। সংসারও অচল, মীনার পথ্যের যোগাড় হয় না। তাকে একটু ফলের রস দিতে পারে না।

একদিন প্রমীলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, কাজল তার কাছে চার আনা পয়সা চাহিয়া চাল কিনিয়া তবে হাঁড়ি চড়াইল! পয়সা দেওয়ার সময় প্রমীলা বলিল, রাস্তায় নস্যি কিনব মনে করেছিলুম, পরিমল মুকুথুল্, যাক্ বাড়ি গিয়ে নেওয়াব। সে 'পরিমল মুকুথুল্' বলিল বেশ একটু সুর করিয়া।

একদিকে অভাবের করালরূপ আগ্নেয়গিরি গহ্বরের মতন হাঁ করিয়া আছে আর একদিকে আছে প্রাচুর্যের ইঙ্গিতময় প্রলোভন—কলমের গাছের ফলের মত সহজলভ্য, হাত বাড়াইয়া ছিঁড়িয়া নিলেই হয়।

ভাগাড়ে মড়া পড়িলে শকুনের দল আসিয়া যেমন হাজির হয় অবস্থা ঠিক সেইরূপ। এ পাড়ার ফাগুয়া আর গিরধার নূতন প্রস্তাব লইয়া আসে। সোনাবাগানের তিন নম্বর আসে। সে একদিন মীনাকে লাল একটি বল দিয়া গেল। আর একদিন দিল চোখ ঘোরানো পুতুল। পুতুল কোমর দুলাইয়া নাচে। তিন নম্বর বলে, এ বাইজী হ্যায়।

মীনা বলিল, মাজী।

কাজল শেষটায় একদিন ফাগুয়াকে ডাকিল। সে বলিল, হামাকে ডাকিয়েছ কেন? মারবাড়ী বাবুকে লিয়ে আসব? উ বহুত বঢ়িয়া আদমী। তামাম বালতিকা রাজা।

কাজল এই বালতি রাজের ধনৈশ্বর্যের বহু গল্পই শুনিয়াছিল। সে বলিল, জান ত আমার দেনা কত?

ফাগুয়া বলে, উ সব শোধ করিয়ে দেবে। মগর—

এই মগরের মর্ম বুঝিবার জন্য কাজল তার দিকে চাহিয়া থাকে। ফাগুয়া বলে, মগর উনকো খুশি করনা চাই। আমির আদমীকা মেজাজ, ঘোড়েকা মাফিক। চলছে ত খাসা চলছে, ঔর কভি মিনিটমে বিগড় গেইলো।

ফাগুয়া চলিয়া গেলে কাজল বসিয়া বসিয়া ভাবে নিজের অদৃষ্টের কথা। অকূলে কূল পাইয়াছিল কিন্তু তরী ভিড়াইতে না ভিড়াইতেই পারটা ধ্বসিয়া পড়িল।

মনে পড়িল তার দেশের কয়েকটি নারীর কথা। ধুপগঞ্জে সমাজের বুকে বসিয়া তারা সমাজ বিরোধী কাজ করে। ঘন ঘন প্রেমিক বদলায়। পাশের বাড়ি আগুনে পুড়িয়া যায় আর ভরতবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের মামী তখন প্রেমাস্পদকে লুচি ভাজিয়া খাওয়ায়। সুধন্ববাবুর ভাইয়ের স্ত্রী বছরে একবার ভ্রূণ হত্যা করে আর সুধন্ব হয় সমাজপতি। যারা জোরালো, যারা কাদামাটির মত নরম নয়, কাজলের মত নয়, সমাজ তাদের বরদাস্ত করে। আর শাস্তি দেয় তাকে, তার বাবাকে।

সন্ধ্যার আগে ফাগুয়া আসিয়া মনে করাইয়া দেয়, ঘরে আমির আসিবে, কাজল যেন মেয়েকে সরাইয়া রাখে। এই পথের পথিকরা বিশেষতঃ ধনীরা গণিকার কোলে সন্তান দেখিলে গোসা করে।

কাজল রোগশীর্ণ দুর্বল মেয়ের কপালে কাঁচপোকার টিপ পরাইয়া তার মুখে চুমা খায়। তারপর তাকে চারুর কোলে দিয়া বালতিরাজের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। আজ ঘরে নূতন অতিথি আসিবে। শুরু হইবে জীবনের আর এক অধ্যায়।

মানুষটির আগে আগে আসে জুতার শব্দ। মৃত পশুর চামড়া শেঠজীর দেহের ভারে কাত্‌রায়। তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফাগুয়া বলিল, কজ্জল বিবি, তুমহার শেঠজী আসিয়েছেন। তামাম বালতি—

অপরিচিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, রাম রাম বিবি সাব।

কাজল প্রথমে দরজায় পাদুকা দেখিতে পায়। জুতা না যেন রূপমতীর পারে ভিড়ানো ছোট্ট দুখানি ডিঙি।

বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া মাটিতে দাঁড় করাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায় শেঠজীর আকৃতি ও গঠন সেইরূপ। বয়স চল্লিশের উপর, গোঁফে পাক ধরিয়াছে। হলদে পাগড়িটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিলে বাহির হয় একটি চৌকা টাক। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনে পাতলা হলদে পাড় ধুতি, তার ভিতর হইতে লাল আণ্ডার উইয়ার উঁকি মারে। একটা কানে সোনার রিং,

আঙুলে ছয় ছয়টি পাথর বসানো আংটি। বৈদ্যুতিক আলোয় সেগুলি জলজল করে। মানুষটি যেন জুয়েলারের দোকানের সচল বিজ্ঞাপন।

কাজলের চাকর নাই। সখিয়া অসুস্থ। ফাগুয়া বলিয়া গেল, পান সোডা লিমনেড বিরিঞ্চির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিবে।

দরকার হোনেসে মাল উল ভি ব্রেঞ্চি লিয়ে আজবে, শেঠজী—বলিয়া শেঠজীকে মিলিটারী সেলাম করিয়া ফাগুয়া বিদায় লয়।

তুম বহুৎ খাপস্থরৎ আছ, রম্ভাকা মাফিক—বলিয়া শেঠজী উপরের দিকে চাহিয়া চোখ ও আঙুল ঘুরায়। তারপর প্রশ্ন করে, কুছ বেমার উমার আছে?

কাজল মাথা নাড়াইয়া জানায়, না।

বেমার নেই? বহুত আচ্ছা। বেমারসে হামার জাস্তি ডর আছে।

কাজল বুঝিল, তার অতিথি কোন্ ব্যাধির ইঙ্গিত করিতেছে।

অতিথি এবার আত্মপরিচয় দেয়, তার নাম গোকুল চন্দ্। শেঠ রাম বিরিজ তার চাচা, বুলাকিলালজী তার চাচাশ্বশুর। সারা ভারতব্যাপী কারবার তাদের অনেক, চিনি আর বিলাতি মাটির, কয়লা আর কাপড়ের।

আপনারা শুনেছি বালতির রাজা—

ইণ্ডিয়া বার্মা টিব্বিটকা তামাম বালতি হামকোই হ্যায়। ঔর হ্যায় বঙাল দেশকা গঙ্গা। তুম গঙ্গা পিতা হ্যায়?

কাজল বলে, না।

গোকুলচাঁদ বকিয়া যায়, কাংগ্রিস মে হাম বহুত রূপেয়া ঢাল দিয়া। এক-দফে চিনিকা কলমে এষ্ট্রাইক হোলো। মিনিষ্টর যাকে মিটমাট করল। রূপেয়ামে সব হোতা বিবিজান। আভি কুছ ড্রিঙ্ক উঙ্ক ত জরুর—

কাজল কহিল, আমি মদ খাই না। আপনার জন্য আনান।

গোকুল চাঁদ কহিল, উ ঠিক হ্যায়।

এই সময় বিরিঞ্চি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলে গোকুল চাঁদ এক পাঁইট জনি ওয়াকার ও দুই বোতল চাবি মার্কা বিয়ার আনিতে হুকুম করে। মণিব্যাগ খুলিবার সময় আঙুল উঁচু করিয়া বার দুই তিন আংটির জলুস দেখায়। কাজলকে প্রশ্ন করে, তুমার আস্তে চাপ ঔর কাটলিশ?

আমি খাই না।

বহুত আচ্ছা! হামভি গোস মছলি ই সব নেই খাতা। মগর ড্রিঙ্কা সাথ কুছ ভাজি ঔর বাদাম হোনে চাই। বিবিকা ওয়াস্তে পেড়া, রাবড়ি, মালাই।

কাজল কহিল, আমি কিছু খাব না। আপনার জন্ত আহুক।

কাজল আগে বিরিঞ্চিকে একবার মাত্র দেখিয়াছিল, মণিমালার ঘরে খানা-তল্লাসির দিন। আজ শেঠজীর হাত হইতে সে যখন টাকা নেয় তখন তাকে ভাল করিয়া দেখিল। টাকার জন্য হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চির কোটরগত চোখ দুটা জ্বলিয়া ওঠে। নোট দুখানা সে যেন খপ্ করিয়া কাড়িয়া নেয়।

শেঠজী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুম্হার নাম ?

বিরিঞ্চি।

ব্রেঞ্চি। আচ্ছা নাম! লেকিন বহুত দুবলা হ্যায়। হাম বইঠ্ নেসে টুট্ যায়গা—আবার হোঃ হোঃ হাসি। হোস পাইপ হইতে রাস্তার জল দেওয়ার সময় প্রথমে যে রকম শব্দ হয়, হাসিটা সেই রকম।

বিরিঞ্চিও হাসে। শেঠজী বলেন, ঘর কাঁহা ?

ক'লকাতায়।

কাজল শুনিয়াছিল লোকটি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের নামে শহরে দু'দুটা রাস্তা আছে। বিরিঞ্চির জন্য তার দুঃখ হইতে লাগিল।

সে চলিয়া গেলে গোকুল বলিল, দেখলেই হামারা মালুম হুয়া তুম এ রাস্তাকো আদমী নেই। ভদ্দর আদমীকা লেড়কী। ঘর কুতা ?

আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, শেঠজী। আমি বাড়ির কলঙ্ক!

তুম কলঙ্ক ওয়াতি (কলঙ্কবতী) চাঁদ আছে। আশ্মানকা চাঁদ—বলিয়া শেঠজী কাজলের গালে সশব্দে চুমা খায়।

এরপর বহুলোক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে। গণিকালয়ে যারা আসে তাদের ধরনই এই। তারা মেয়েদের প্রশ্ন করে, কেন তারা এপথে আসিল, কে আনিল ? প্রথমে কি ভাবে প্রলুব্ধ করিল ? কিন্তু কাজল এতটা বিরক্তি কোনদিনই বোধ করে নাই। গোকুলচাঁদ পীড়াপীড়ি করায় শেষটায় বলিল, আমি চাঁড়াল। চাঁড়াল জানেন, শেঠজী ?

গোকুলচাঁদ হাসিয়া কহিল, রাজা হরিশচন্দ ভি চণ্ডাল থা। উ জানে সেও। তুম গাহনা জানো ?

গান একটু একটু জানি।

ঔর নাচনা ?

নাচতে জানি না।

এই সান্—বলিয়া কোমরে বাঁ হাত রাখিয়া ডান হাত তুলিয়া গোকুলচাঁদ দেহ ও মাথা নাড়াইতে থাকে। কাজল প্রশ্ন করে, আপনি নাচ জানেন বুঝি?

জরুর! এই সান—গোকুল খানিকটা পা নাড়ায়। তারপর বলে, হুস্কি আনে দেও। নাচনা উস বখত খুব বঢ়িয়া হোগা। বাঙালী উদিশরণকা মাফিক।

উদিশরণ নয়, উদয়শঙ্কর।

ঠিক হ্যায়। তুম আভি গাহনা চালাও—

আয় বান্দি তুই বেগম···

ও ত জানি না।

উ বহুত বঢ়িয়া গাহনা তামাম বেগমকা। আচ্ছা গাও, যো জানতা।

কাজল গায় রবীন্দ্রনাথের গান। গোকুলচাঁদ বলে, বহুত আচ্ছা গান। কোন্ বানায়া?

রবিঠাকুরকে জানেন? তাঁর লেখা।

রোবিন্দনাথ? জরুর জানতা, জোড়াসাঁকোমে উনকা কোঠি হ্যায়। উসকা বগল হামভি একঠো কোঠী বনায়া। রোবিন্দর আচ্ছা গাহনা বাজনা ওয়ালা। জেনানা লেকে থিয়েটার ভি কিয়া, আম্পায়ারমে। হাম জুটব্রোকার ফারগুসন সাবকা সাথ উনকা নাচ দেখা। এই সান—বলিয়া শেঠজী রবীন্দ্রনাথের নৃত্যের অনুকরণে প্রয়াস পায়।

সেই রাত্রির ইতিহাস, তার বেদনা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রথম প্রেমের মত প্রথম লাঞ্ছনার স্মৃতিও মোছে না।

মদ্যপানের ফলে বালতিরাজের কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চায়। চোখের মণি অনেক বড় দেখায়, মুখের দুই কোণে ঠোঁটের পাশে থুথু জমিয়া ওঠে। লোকটা ঐ থুথু জড়ানো ঠোঁট দিয়া ঘন ঘন চুমা খায়। কাজল মড়ার মতন পড়িয়া থাকে। গোকুলচাঁদ বলে, ঔর হুইস্কি লে আনে বোলো।

কাজল ইশারায় জানায়, আর না।

ঠিক হ্যায়। পরশু রোজ কুছ জাস্তি ড্রিঙ্ক কিয়া থা। উ রোজ হামারা একঠো আঙ্গোটি চুরি গিয়া—বলিয়াই সে আংটিগুলি একটা একটা করিয়া খোলে আর বলে, ইসকা ভাও দো হাজার, এ হ্যায় হীরা, ডাইমন্। এ পানশো চুন্নী, ঔর এ পেরবাল। তোম এঠো লে লেও।

না। আপনি ও রেখে দিন। দরকার হলে আমিই চেয়ে নেব।

জরুর। তুম ঔর হাম ত হাজব্যাণ্ড ঔর ওয়াইফকা মাফিক হ্যায়।

কাজল ভাবে, এ কী জ্বালা! শেঠজী বকিয়া যায়, উ রোজ একঠো বিবি হামারা সোনেকা দাঁত নিকল লিয়া। উমা দাস লাইন মে।—বলিয়াই সে হাঁ করিয়া দাঁত দেখায়। তারপর বলে, উরোজ বহুত জিন পিয়া থা। জিন ঔর র্যাম।

লোকটা কাজলের ব্লাউজের বোতাম খুলিতে চেষ্টা করিলে কাজল একটু সরিয়া বসে। গোকুল বলে, হাম ত মুফত নেই মাংতা, চাঁদি দেগা।

কাজলের ভয় করে। ইচ্ছা হয় বাহিরে যাইয়া মণিমালা ও চারুকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে, দুইদিন পরে মণিমালার মামলা। তার টাকা কালই শোধ করা দরকার। টাকা না পাইলে গোয়ালাও দুধ বন্ধ করিয়া দিবে। মীনাকে উপবাসী থাকিতে হইবে।

গোকুলচাঁদের মুখের উৎকট গন্ধে কাজলের গা গুলাইয়া উঠিতেছিল। সে চলিয়া গেলে কাজল গলায় আঙুল দিয়া বমি করিল। স্নান সারিয়া যখন ঘরে আসিল তখন রাত প্রায় একটা।

সারা রাত তার ঘুম হয় না। আধ ঘণ্টার উপর সাবান দিয়া স্নান করিয়াও মনে হয় শরীরে যেন ক্লেদাক্ত। প্রিয় রসবতী ও সুবালার সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু দেহের মূল্যের। রূপ যৌবন আছে তাই তার দেহের দাম বেশী। যতদিন এই রূপযৌবন থাকিবে ততদিন সে চড়া দামে বিকাইবে।

এরপর সে আর ভাবিতে পারে না। কাঁদিয়া ফেলে, কখনও এরূপ কাঁদে নাই। বাড়ি ছাড়ার দিন নয়, পিতার কিংবা রথীনের মৃত্যুতেও নয়।

পরদিন সকালে চারু কহিল, এ কী রে! চোখ যে বসে গেছে। একবার আয়নায় মুখ দেখ্ দেখি।

কাজল আয়নার মুখ দেখিল না। সে ত জানে গত রাত্রের অভিজ্ঞতা কী ভয়ঙ্কর!

গোকুলচাঁদের সেদিনও আসার কথা। টাকা রাখিয়া গিয়াছে। কাজল সারাদিন এই অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে। বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়া খেলা দেখাইবার আগে সার্কাসের খেলোয়াড়রা যেমন প্রস্তুত হয়, সেই রকম।

বৈকালে সে মণিমালার টাকা দিতে গেলে সে বলিল, এখন না হলেও

চলত। আমি মনে করেছিলুম তুই দিতে পারবি না। তাই পরশুই টাকার যোগাড় করে রেখেছি।

পরশু,—পরশু! কথাটা যদি কালও বলতে, মালাদি।

পরশু টাকা পেলাম রাত্তিরে। কাল বলব বলব করে দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি বালতিওলা তোর ঘর জুড়ে বসে আছে।

কাজল আর কোন কথা বলে না। শুধু একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

কিছুদিন যাতায়াতের পর গোকুলচাঁদ একদিন আসিয়া বলিল, সিমেণ্টের কারখানা খোলার জন্য সে পাঞ্জাব যাইতেছে। সেখান হইতে যাইবে মুম্বই। তারপর ক্রাচি। বম্বেকে সে বলে মুম্বই, করাচিকে ক্রাচি।

কাজল কহিল, বেশ ত ঘুরে আসুন।

বেশ! শেঠজী যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল, তুম হামারা আস্তে শুচবে না?

কাজল বুঝিতে পারে না। তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। শেঠজী বলে, হামার জন্য তুমার দুখ্‌খু করবে না?

কাজল নীরব।

বোলো, বোলো দুখ্‌খু করবে।

কাজল অগত্যা নিরুপায়ভাবে বলিল, তা করবে।

ই ঠিক বাত। তুম ঔর হাম ত হাজব্যাণ্ড্‌ এণ্ড ওয়াইফকা মাফিক হ্যায়।

কাজল তার ভাগ্যদেবতাকে মনে মনে ধিক্কার দেয়, আর গোকুলচাঁদ মনে করে এই বারবনিতাকে সে ধন্য করিতেছে।

যাওয়ার আগে কাজলের খরচার জন্য সে কিছু টাকা দিয়া যায় আর সে যাহাতে তাকে ভুলিয়া না যায় সেই জন্য উপহার দেয় একটি স্নানের টব ও দুইটি বড় বালতি। প্রত্যেকটির উপর পিতলের পাত বসানো। তাতে খোদাই করা—

কজ্জল বিবি

নিচে—শেঠ গোকুলচন্দ আজমগড়ওয়ালা।

তার কৃপায় কাজলের হাতে দুইটি পয়সা হইল বটে কিন্তু সে কিছুদিন আসিবে না শুনিয়া কাজল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হাইকোর্টে মণিমালার আপিল অগ্রাহ্য হয়। নিম্ন আদালতের দণ্ডই বলবত থাকে।

পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণের কথা। রাত্রে কাজলের ঘরে বসিয়া সে অনেক গল্প করিল, কোকেনের ও ঘোড়ার গল্পই বেশী। তাদের পাড়ায় যুগীর মার ছিল ধবধবে সাদা একজোড়া মণিপুরী ঘোড়া। লোকে বলিত, বর্মার টাট্টু। মণিমালার ইচ্ছা ছিল সেই রকম এক জোড়া টাট্টু কেনে।

সকলকে সে কুলপি মালাই খাওয়াইল, দীনদালালকে খাওয়াইল বড় চারটা সিদ্ধির কুলপি। বলিল, আপনি ত ঢের করলেন, বারিক মশাই। কিন্তু আমার বরাত মন্দ।

দীন বলিল, এর প্রিভি কাউন্সিল হয় না, হলে বিলেত গিয়ে তোমায় খালাস করে আনতুম।

মণিমালা একটু হাসে।

রাত প্রায় বারোটা। দীনদালাল চলিয়া গিয়াছে। চারু গিয়াছে ঘুমাইতে। তরুর ঘর নিস্তব্ধ। মণিমালা আমতা আমতা করিয়া বলিল, তোকে বড় ভালবাসি কাজল, তাই একটা কথা বলছি, কিছু মনে করিস নে।

কি কথা?

বল্ কিছু মনে করবি না?

না, করব না।

কাল আমি যখন যাব তখন মীনাকে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াস নে।

কেন বল দেখি?

তাহলে আমি আর ফিরতে পারব না। ওর সঙ্গে আমার রাশের অমিল। রাশি নক্ষত্রের।

ওর সঙ্গে তোমার এমন কি সম্পর্ক?—কাজলের কণ্ঠে বেদনা প্রকাশ পায়।

মণিমালা বলে, ও রকম হয়। আমরা এক ছাদের তলায় থাকি ত। বাড়ির এক নম্বর।

কাজল কহিল, আমার ঐ একরত্তি মেয়ে। ওর ত কোন দোষ নেই, দিদি।

না, না। আমায় ভুল বুঝিস নে। ওর আবার দোষ কি? এ হচ্ছে রাশের ফল। এক রাশের সঙ্গে আর এক রাশের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক। ও হওয়ার পর থেকে আমার লোকসানই চলেছে। লোকে গয়না ঠকিয়ে নিয়েছে। কারবারে লোকসান দিয়েছি। নিজের ছেলেকে খুন করেছি। তারপর—

কাজল বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, সে কী!

হ্যাঁ। নিজের পেটের ছেলে। গর্ভে ধরেছিলাম। তোমরা জানতে হাওয়া বদলাতে গেছি। আমি গিছলুম পেট খসাতে। কালীঘাটেই ছিলুম।

কাজল তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মণিমালা অন্তরের আবেগে ঝড়ের মতন বকিয়া যায়—গনৎকার হাত দেখে বললে মেয়ে হবে। ভাবলুম আমার মেয়ের জীবনও ত এইভাবেই কাটবে। এক হয় দেহ বেচবে, না হয় মদ কোকেন। তার চেয়ে হবার আগে মরে যাওয়াই ভাল। নিজের হাতে কত ওষুধ খেলুম। পেটের উপর ঘুষি মারতুম। পেট থামচে ধরতুম। কিন্তু মেয়ে না হয়ে হল ছেলে। লাউড়ির মড়া ছেলে।—বলিতে বলিতে সে কেমন অস্থির হইয়া পড়িল।

তার পরদিন সে যখন জেলে রওনা হইয়া যায় তখন তার চোখ দুটি কাজলকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু মণিমালা তাকে ডাকিল না।

কাজলের ইচ্ছা ছিল মীনাকে ঘুম পাড়াইয়া মণিমালা যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু মেয়ের আগে সে নিজেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

দালালের দল আবার কাজলের কাছে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে। বলে, নৌতুন লোক নিয়ে আসবো দিদিমণি ?

কাজল বলে, সে কি কথা ?

ফাগুয়া হিতার্থীর মতন উপদেশ দেয়, আভি তুমার টাইম আছে। ভাল পড়তা। কুছ কামাই কর্ লেও।

সে হয় না। শেঠজী আগাম টাকা রেখে গেছে।

ফাগুয়া মুখ টিপিয়া হাসে। দালালেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, মেয়েটা যেমন সুন্দর তেমনি ভাল, কিন্তু বেকুব।

চারুলতা বোঝে কাজলের বিশ্রামের কতখানি প্রয়োজন। জীবনে যে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে তার ধাক্কা সামলাইতে বেশ সময় লাগিবে। শেঠজী এই সময় আরও কিছুদিন যাতায়াত করিলে কাজলের দেহ মন দুইই ভাঙিয়া পড়িত। চারু শেঠজীকে তার অনুপস্থিতির জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দেয় কিন্তু ভগবানকে ক্ষমা করিতে পারে না। বলে ভগবান কি নিষ্ঠুর! তোকে কিনা এই রাস্তায় নিয়ে এল ?

কাজল বলে, ছিঃ তাঁর নিন্দে করতে নেই।

কেন করব না ? যদি তাঁকে মানতেই হয় তাহ'লে একশ'বার বলব, কি দরকার ছিল এতোগুলো মেয়েকে এমনি করে যাতনা দেবার ? কুষ্ঠরোগীর

চেয়েও অধম করে রাখবার? আমাদের এই বেশ্যা জাতের কথা বলছি।—বলিতে বলিতে ক্ষোভে রাগে চারুর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কাজল জানে তার দুঃখ কত গভীর, কত মর্মন্তুদ। ভণ্ডুল তাকে লইয়া কি ছিনিমিনিই না খেলে! এক একবার কাছে টানিয়া নেয়। আবার দূরে ছুঁড়িয়া ফেলে। শুধু চারু কেন, দুঃখ সবার। লাল বল পাইলে কুকুর যেমন তাহা লইয়া ছুটাছুটি করে, একবার দাঁতে করিয়া মুখে তোলে আবার ফেলিয়া দেয়, পুরুষের হাতে এ পাড়ার মেয়েদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। তারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি লাল চকচকে বল।

গোকুল কলিকাতায় ফিরিয়াছে কিন্তু কাজলের ঘরে আর আসে না। তার গাড়ি এই গলিরই বিশ নম্বর বাড়ির দরজায় থামে। কাজলের পোর্টিকো হইতে গাড়িখানা দেখা যায়।

একদিন ফাগুয়া আসিয়া কাজলকে খবর দিল, বিশ নম্বরমে একঠো নোতুন মাইয়া আইছে। গেরধার গোকুলকে উ কোঠীমে লইয়ে গেলো। শালা, বাঁদীকা বাচ্চা।

কাজল কহিল, তা নিক না। কি হয়েছে?

এর দু'এক দিনের মধ্যেই ফাগুয়া ও গিরধারে মারামারি হইয়া গেল। রীতিমত রক্তারক্তি কাণ্ড। পাড়ায় রটিল, কাজল না পাম ওলিভ (নবাগত মেয়েটি) কে বেশী সুন্দর ইহা লইয়া তর্কাতর্কিই রক্তপাতের কারণ। শুনিয়া কাজল বলে, আমার জোর বরাত বলতে হবে।

এরপর আরম্ভ হয় রীতিমত পতিতা জীবন। তাকে দরজায় দাঁড়াইতে হয় না বটে কিন্তু প্রিয় সুবালা রসবতীর সঙ্গে অন্য কোন বিষয়েই কোন তফাত থাকে না।

মাস কয়েক পরে কাজল সোনাবাগানে উঠিয়া আসিল। আট নম্বর বাড়ির উত্তর দিকের চওড়া গলিতে কুসুমের বাড়ি। তিন তলার ঘর, সামনে খোলা ছাদ, সারা দিনই রোদে ঝলমল করে। শীতকালে ঘরে বসিয়াই রোদ পোহানো যায়। দেখা যায় বহুদূরে বিস্তৃত নীল আকাশ।

বড় ঘর, পূর্ব দিকে খাটের উপর গদি, ধবধবে চাদর, ছোট বড় নানা রকমের তাকিয়া। নিচে মেঝেতে শতরঞ্জির উপর আর একখানি পুরু বিছানা।

আলমারি ভরা পুতুল, বাসন ও কাপড় চোপড়। উভয় দিকে দেয়ালে দেব দেবীর পট ও দু'খানা ল্যাণ্ডস্কেপ। বিপরীত দিকে রথীনের বড় একখানা তৈল চিত্র।

সে এই গলিতে উঠিয়া আসায় প্রিয় ও সুবালা খুবই খুশি হয়। তারা প্রায়ই আসে। হর্তুকি বেদানাও আসে। তাস খেলে।

প্রমীলা সদর দরজার পাশ হইতে গলা ছাড়িয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, কাজল আছ? কাজু—

পাড়ায় সে গর্ব করিয়া বেড়ায় আমার বাড়িতেই হাতে খড়ি, তাই এত বাড় বাড়ন্ত। ফলাওটা কি কম হয়েছে? আগে ঘর ভাড়া জুটত না আর এখন দরজায় জুড়ি মোটর বাঁধাই আছে।

শুনিয়া প্রিয়, সুবালা রাগ করে। কাজলকে বলে, বাস্ত ঘুঘুটাকে শুনিয়ে দিতে পারিস না?

কাজল উত্তর করে। বলে, যদি আনন্দ পায় ত ক্ষতি কি? আমার পসার ত নিতে পারবে না?

এই পসারের কথাটা রসবতীর কানে যায়। সে ঠাট্টা করে, সতী লক্ষ্মীর দেমাক এখন পসারে এসে ঠেকেছে। এর পর আরও কত দেখব।

দিন দিন কাজলের পসার বাড়ে। অনেক বড় বড় লোক আসে, সমাজের চূড়ামণির দল। তার একটা গান শুনিতে হইলেও অন্ততঃ আগের দিন বলিয়া যাইতে হয়।

ঠিক এতটা নয়। তবে তরুর বাড়িতেই ভিড় শুরু হয়। তরু তাহা পছন্দ করিত না। একদিন কাজলকে বলিল, তোমার ঘরে রাত বারটা একটা অবধি গান বাজনা চলে। এতে আমার বড় অসুবিধে হচ্ছে।

কাজল চারুকে কথাটা জানাইলে সে কহিল, বুঝলি ত দিদি তোকে ঘুরিয়ে উঠে যাওয়ার নুটিশ দিলে।

কাজল বলিল, অসুবিধে হলে বলবেই ত।

গান বাজনার জন্য নয়! ওর ঘরেও বেশী রাত অবধি গান বাজনা হত। রঘু উকিল একটার আগে উঠতে চাইত না। ব্যাপারটা অন্য রকম।

কি?

দিদির চেহারা মন্দ নয়, নাম করা গাইয়ে কিন্তু তার চেয়ে তোর ঘরে ভিড় বেশী হয় এটা সে সহ্য করতে পারে না। আমার ঘরে হলেও পারত না।

বেশ, আমি তাহলে উঠে যাব।

তুমি উঠে গেলেও তার সুবিধে হবে না। এ রাস্তায় যে সব বাবুরা আসে তারা খালি গান চায় না, চায় আরও কিছু। তারপর চারু যাহা বলিল তার মর্ম এই যে, এই পথের পথিকদের নিকট নারীর যৌন আবেদনের মূল্যই বেশী। আর সে দিক দিয়া তরুর তেমন আকর্ষণ নাই। বরং শামুক যেমন বাহিরের কোন কিছুর স্পর্শে নিজেকে গুটাইয়া লয় পুরুষের সংস্পর্শে তরুও তেমনি কোঁকড়াইয়া যায়। বাবুর দল ইহা পছন্দ করে না।

এরই কিছুদিন পরে কাজল নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসে। নদীর বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত পুরুষের পর পুরুষ আসে। নানা রকমের, নানা প্রকৃতির। তাদের আদর অত্যাচারে হৈ হুল্লোড়ে কাজল এক এক সময় অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে, সে একটু শান্তি চায়, চায় নিরালা জীবন। তখন মনে হয় সাধনের কথা। লোকটি গরিব, পয়সা দিতে পারে না তাই বেশী আসে না কিন্তু সে আসিলে কাজল একটা নূতন জীবনের আস্বাদ পায়, সাহিত্যিকের মার্জিত রুচির সুষমায় ভরা স্নিগ্ধোজ্জ্বল জীবন।

লোকটি মানুষ হিসাবেও ভাল। সে দরিদ্র, অভাবের ছাপ তার বেশ ভূষায়, তার সর্ব অঙ্গে কিন্তু লোকটির ভিতরে কোন দৈন্য নাই। জলের উপর হাঁসের মতন দুঃখের উপর সে ভাসিয়া বেড়ায়, তার গায়ে পাঁক লাগে না।

মাঝে মাঝে রঘু উকিল আসে। তার সঙ্গে তরুর মনান্তর হইয়াছে তাই সে কাজলের ঘরে আসিয়া মদ খায়। তার গান শোনে। সে আরও ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় কিন্তু কাজল দেয় না। বলে, আপনি যে তরুদির বাবু।

রঘু কাজলকে মদ ধরাইতে চায়। লোককে মাতাল বানাইয়া সে আনন্দ পায়। মৃদু মৃদু হাসে, হিংস্র হাসি। সেই হাসিতে ফুটিয়া ওঠে জগতের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কাজল এই হাসি দেখিয়া ভয় পায়।

তখনও সে তরুর বাড়িতে ছিল। একদিন চারু বলিল, জানিস রঘু উকিল একটা বাবুকে পাগল করে দিয়েছে?

কাকে?

বিভূতিকে। যে ছোকরা ওর সঙ্গে দিদির ঘরে গান শুনতে আসত তাকে। যাকে মদ খাওয়ানো নিয়ে সাধনের সঙ্গে রঘুর ঝগড়া।

ব্যাপারটা এই। সম্রান্ত ধনী পরিবারের এই তরুণটি সবে আইন পাশ করিয়া

হাইকোর্টে যাতায়াত শুরু করিয়াছিল। সম্মুখে উজ্জ্বল সম্ভাবনা, অনন্ত ভবিষ্যৎ।

রঘু তাকে মদ ধরাইল। বিভূতি প্রথমে আপত্তি করে, বলে, আমার সহ্য হবে না। নার্ভ দুর্বল। ডাক্তাররা স্মোক করতেও নিষেধ করেছেন।

তরুও তাকে সমর্থন করিত। রঘুকে বলিত, একি তোমার স্বভাব। উনি বলছেন অসুখ করবে অথচ তুমি ওঁকে মদ খাওয়াবেই।

শেষ পর্যন্ত বিভূতি মদ ধরিল। অল্প দিনের মধ্যেই রঘুকে সে ছাড়াইয়া গেল। হ্যাণ্ডনোট কাটিল, কাবুলীওয়ালার কাছে ছুটিল।

বর্তমানে সে উন্মাদ। সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় আর গায়, সাকী জাগো।

শুনিয়া কাজল বলিল, রঘু বাবু নিজে যে পাগল হয়ে যায় নি এই ত আশ্চর্য।

চারু জিজ্ঞাসা করে, কেন রে? এ কথা বলছিস কেন?

কেন তা বলতে পারি না কিন্তু মনে হয়।

অতিথি আসে আরও অনেক। বৈশিষ্ট্যহীন, স্বাতন্ত্র্যহীন একই ছাঁচে ঢালা, যেন কতকগুলি কাঠখড়ের পুতুল। তারা একই ধরনে কথা বলে, দরদস্তর করে। একই ভঙ্গীতে প্রেম জানায়। মনে হয়, কোন কলেজের একদল ছাত্র প্রফেসরের দেওয়া নোট মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে।

অবশ্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকও দু চারজন আসে।

কিছুদিন এক অধ্যাপক যাতায়াত করিলেন। বয়স পঞ্চাশের উপর, সাদা ধবধবে গায়ের রং, মাথায় টাক, লোমশ শরীর, বিশেষ করিয়া হাতের রোঁয়াগুলি যেন ভালুকের মতন। লোকটি অন্ধ। প্রথম দিন সাধনের সঙ্গে তাঁর আগমন। সে পরিচয় করাইয়া দেয়, ইনি হচ্ছেন মস্ত বড় পণ্ডিত।

কাজলের চোখ দুটি ভদ্রলোকের মাথার টাক খুঁজিতে থাকে। দেখিতে না পাইয়া হয়ত হতাশও হয়।

পণ্ডিত বলেন, নমস্কার, এলাম ষ্টাডি করতে। সাইকো এ্যানালিটিক্যাল ষ্টাডি।

কাজলের বিস্ময় আরও ঘনীভূত হয়। সে জিজ্ঞাসা করে, কি করতে?

ফ্রয়েডীয় ভঙ্গীতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, আপনাকে আমি অধ্যয়ন করব। আপনাদের—

কাজল ফ্রয়েডের কথা রথীন ও সাধনের কাছে শুনিয়াছিল। বলিল, কিসের তাড়নায় আমরা এই পথে এসেছি তাই জানতে চান। এই ত?

ঠিক ধরেছেন। আমি আপনাদের সম্বন্ধে থিসিস লিখব ভাবছি। আপনারা সাইকোএনালিসিসের বিস্ময়।

ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে আসেন। বড় বড় কথা বলেন। কাজল একদিন সাধনকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মানুষটা পুলিসের গোয়েন্দা নয় ত? শুনেছি আজকাল এ পাড়ায় পুলিস ঘোরাঘুরি করছে—স্বদেশীদের ধরার জন্য।

সাধন হাসিয়া বলে, না সে ভয় নেই। হাই ফ্যামিলি, বাপ মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন, ভাইরাও সব নাম করা লোক। নিজে একটা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

অধ্যাপক সাধারণতঃ ছুটির দিন আসেন। আসেন একা। ঘরে অন্য কেহ না থাকিলে কাজলের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু মৃদু চাপ দেন আর গল্প করেন। চাপটা বেশী জোরে হইলে কাজল বলে, লাগছে যে ভাইস বাবু।

এক্সকিউজ্ মি। আপনার নরম হাতের স্পর্শে, আপনার কণ্ঠের মধুর স্বরে আমি মাঝে মাঝে সব ভুলে যাই।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, আপনি বিয়ে করেন নি?

তা করেছি। তবে মাদাম কচি-কাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত।

আপনি কি মেম বিয়ে করেছেন?

না। আমার ওয়াইফ বাঙালীরই মেয়ে। তিনি আমার ষ্টাডিতে সাহায্য করতে পারেন না।

কাজল বলিল, এ ত বড় দুঃখের কথা।

কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ যে আমার চোখ নেই, আপনাকে দেখতে পাই না। শুনেছি আপনি অসাধারণ সুন্দরী—ডিভাইন বিউটি।

চোখ না থাকা নিশ্চয়ই দুঃখের কিন্তু সুন্দরী ত অনেক দেখেছেন। সাধনবাবুর কাছে শুনেছি আপনার পরিবার খুব সুন্দর।

অধ্যাপক বলেন, আমার স্ত্রীর উপর সাধনের কিছুটা দুর্বলতা আছে।

কাজল বলে, ওমা! সে আবার কি? বন্ধুর বউ—

হাউ চার্মিং—বলিয়াই অন্ধ কাজলকে কাছে টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরেন।

কাজল নিজেকে ছাড়াইয়া নেয়। তার মনে হয় অন্ধ প্রৌঢ়ের এই আকুতি যেন সৃষ্টির পরিহাস। সে ধীরে ধীরে তাঁর কাঁধে হাত বুলাইতে থাকে। ষাঁড়ের গলার নিচে হাত বুলাইলে সে যেমন শান্ত হইয়া যায়, পণ্ডিতটিও সেইরূপ

শান্ত হইয়া যান। বলেন, সাধন যেন জানতে না পায়। ও হয়ত এই নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলবে, পাগল মানুষ।

কাজল বলিল, না তাঁকে বলব না!

অধ্যাপক অন্য দিন যাহা দেন তার চেয়ে আজ পাঁচটি টাকা বেশী দিয়া গেলেন। কাজলের মনে হইল অতিরিক্ত টাকা কয়টি সাধনকে না বলার ঘুষ।

এই অধ্যাপকটি সেই হইতে আর আসেন নাই।

যারা শুধু গান বাজনা শুনিতে আসে, গল্পগুজব করিয়া বা মদ খাইয়া চলিয়া যায়, কাজল তাদের বেশী পছন্দ করে। শুধু কাজল নয় রূপজীবিনী মাত্রেই বোধ হয় ইহা সত্য। কিন্তু এই ধরনের লোকের সংখ্যা কম। অধিকাংশই আসে দৈহিক প্রবৃত্তির তাড়নায়, তাদের মধ্যে কারও কারও আবার ক্ষুধা খুব উগ্র। বয়স হইয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে, চোখের দীপ্তি কমিয়াছে কিন্তু দৈহিক লালসাকে আরও উগ্র করিবার জন্য মোদক খাইয়া আসে। দুই তিন রকম মদ পাঞ্চ করিয়া লয়। শুধু দেহ দিয়াই হতভাগিনীরা রেহাই পায় না, অনেকের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করিতে হয়। বলিতে হয়, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি না এলে বসে বসে ভাবি—এইসব ছেঁদো কথা।

যাদের বয়স কম সেই সব বাবুরা ইহাতে ভারী খুশি হয়। জলের মত টাকা ব্যয় করিয়া যায়।

মেয়েদের পক্ষে কিন্তু এই অভিনয় অনেক সময়ই দেহ বিক্রয়ের চেয়েও পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে। কিন্তু উপায় নাই।

মাস তিনেক যাবৎ ননীগোপাল নামে একটি লোক যাতায়াত করে। শ্যামবর্ণ, রোগা ছিপছিপে গড়ন কিন্তু লম্বা নয়। সে আসে খুব কম, মাসে দুই তিনবার। আসিলে আর উঠিতে চায় না। খালি আদর করে, প্রেম জানায়। জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমায় ভালবাস, কাজু?

ভালবাসি, কিন্তু কাজু বলতে পারবেন না।

কাজুও বলতে পারব না! এ কি রকম ভালবাসা? বেশ, কাজু বলব না। কিন্তু তুমি আমায় আপনি বলতে পারবে না, তুমি বলবে।

বলব।

আচ্ছা তুমি আমায় কার মতন ভালবাস? যার সঙ্গে এসেছিলে তার মতন?

তার চেয়ে বেশী বাসি।

ননীগোপাল বলে, দেয়ালে ঐ যার ছবি, ওর মতন?

কাজল রথীনের ছবির দিকে চায়। কোন কথা বলে না।

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া ননী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলে, যতদিন ঐ রকম না বাসবে ততদিন মনে করব আমার বেঁচে থাকাই বৃথা।

কাজলের অসহ্য ঠেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় প্রেম করাই এখন তার কারবার। আর ননীগোপালের দল সেই কারবারের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে চটাইতে নাই।

ননী একটি সিগারেট ধরাইয়া বলে, কাছে এস।

কাজল বলিল, আপনার বুকভরা এত ভালবাসা অথচ আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

ননী উত্তর করে, স্বার্থপর হতে পারলে নিশ্চয় ক'রতাম। কিন্তু ঘরে আইবুড়ো তিনটি বোন, মা, মাসীমা, টি. বি. গ্রস্ত ছোট ভাই আর আধ ডজন মোটা মোটা বেড়াল।

কাজল বলে, বেড়াল কেন?

বাড়ির সবাই এক একটা করে বেড়াল পোষে। ওতে নাকি টি. বি. আটকায়। ওরা ছাগল পুষতে চেয়েছিল কিন্তু তা আমি দেই নি। তাতে খরচা ঢের। একটু থামিয়া লোকটা আবার বলে, পয়সার অভাব তাই তোমার কাছে ঘন ঘন আসতে পারি না।

বাবুদের মধ্যে শতকরা আশি জনই এক একটি ননীগোপাল। তাদের সঙ্গে ধরাবাঁধা নিয়মে প্রেম করিতে হয়, দিনের পর দিন একই ছন্দে। দুপুরে নিদ্রা, বৈকালে প্রসাধন। সন্ধ্যার পর দালাল ও বাবুদের সঙ্গে দর কষাকষি। বাবুর পর বাবু আসে। কেহ একা, কখনও বা একটা দল। পালার পর পালা চলে।

বাবুরা আসিলে মীনাকে রাত বারটা একটা পর্যন্ত ঝিয়ের কাছে রাখিতে হয়। আগে সে মোটেই থাকিতে চাহিত না। এখন থাকে। তবে মধ্যে মধ্যে গোলমাল বাধাইয়া দেয়।

সেদিন একটি যুবা আসিয়াছিল। লম্বা চেহারা, শ্যামবর্ণ, প্রায় কালো বলিলেই চলে। চোখ দুটি বুদ্ধি-দৃপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টা পরীক্ষা পাশ করিয়া সে সরকারী চাকুরির চেষ্টা করিতেছে।

কাজলের মাথা এই যুবকের কোলের উপর। সে কাজলের ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে বলে, এই ঠিক চুমু খাওয়ার ঠোঁট। এমনটি আর দেখি নি।

কাজল বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, আর মোটেই দেখেন নি? এঁ্যা!

ঠিক এই সময় দরজা ঠেলিয়া মীনা ঘরে ঢুকিল। কাজল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, তুই, তুই এখানে কেন? ঝি কোথায়?

মীনা পাণ্টা প্রশ্ন করিল, কে ও?

যুবকটি বলিল, ছেলে মানুষ এসেছে, তা আসবেই ত। তোমার মেয়ে বুঝি?

কাজল ঠিক তার দুদিন আগে যুবকটিকে বলিয়াছে, তার কোন সন্তান নাই। সে যেন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। আগন্তুক বলিল, মিথ্যে কথায় দেখছি তোমরা সবাই সমান।

এই টিপ্পনী কাজলকে যেন তীব্র কষাঘাত করে। মীনার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া তার গালে জোরে একটা চড় মারিয়া বলে, পাজী, হতভাগা মেয়ে।

মীনা ব্যথা পায় খুবই কিন্তু কাঁদে না। কেমন যেন অবাক হইয়া যায়।

ঝি ঘুমাইতেছিল। কাজল যাইয়া তাকে বকাবকি আরম্ভ করিল। কলিকাতার ঝি, তাও এই পাড়ার। একদিন সেও দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। কাজলের মুখের উপর সে শুধু সমানে জবাবই করিল না, গাল মন্দ করিল ঢের বেশী। অভিশাপ দিল, একদিন তোকেও আমার মতন হতে হবে।

কাজল শিহরিয়া ওঠে। চায়ের কাপে ঝড়—সামান্য একটা ব্যপার যে এতদুর গড়াইতে পারে সে ইহা ভাবিতেও পারে নাই। সে এবার রণে ভঙ্গ দেয়।

ঘরে যাইয়া যাহা দেখে তাহা আরও চমৎকার। যুবাটি ঘরে নাই। কাজল তোশকের তলায় কয়েকটি টাকা রাখিয়াছিল তাহাও নাই।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা কাজলের আজ এই প্রথম। লোকটি নাকি কাগজের লিখিয়ে। কত বড় বড় কথাই না বলিত অথচ সামান্য ক'টা টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

মধ্যে মধ্যে বাবুরা কাজলের ঘরে পার্টি দেয়। সেদিন রঘু উকিলের ককটেল্ পার্টি। তার পার্টির জন্য ঐ বাড়ির হেনা, টম্যাটো ও অনিলাকে আনানো হয়। আগে প্রয়োজন হইলে কাজল প্রিয় ও সুবালাকে আনাইত। কিন্তু নতুন বাড়িওয়ালী কুসুমের উহা পছন্দ নয়। সে বলে, এগার নম্বরের (অর্থাৎ তার বাড়ির) তাহলে মান থাকে না। কাজল বলে, বাবুরা যদি আর কাউকে পছন্দ করে?

কুসুম হাসিয়া বলে, বাবুদের আবার পছন্দ! ওরা কি ছাই রূপ গুণ চায়, না বোঝে? মদের মুখে যা বুঝিয়ে দেবে তাই বুঝবে। সেই হইতে কাজল আর প্রিয়, সুবালাকে আনায় না। তারা ক্ষুণ্ণ হয়।

রসবতী বলে, ও ত জানা কথা। ও বড়লোক হয়েছে, ছোটদের এখন চিনবেই না। সাধে কি আর ওকে দেখতে পারি না?

রঘু প্রচুর হুইস্কি সোডা বিয়ার ব্র্যাণ্ডি আনায়। সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আর মদের চাট। লখিয়া সোডার বোতল ভাঙে। রঘু নিজে গেলাসে গেলাসে মদ ও সোডা ঢালে।

সাধনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সে না আসায় রঘু টিপ্পনী করে, সাধন এখনও এল না। হয়ত কারও ঘরে বসে কাব্যি করছে।

দীন দালাল ফোড়ন দেয়, আর কাটলিশ খাচ্ছে।

ঘরময় হাসাহাসি পড়িয়া যায়। ইনস্পেক্টর ফজলে আলি জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কি কবি সাধনের কথা বলছেন?

রঘু বলে, হ্যাঁ। আপনি তাকে চিনলেন কি করে?

ওর বাড়ি সার্চ করতে গিছলুম।

দীন বলে, চুরি টুরি নাকি?

আলি সাহেব একটু বিরক্তির সুরে বলে, না না স্বদেশী ব্যাপার।

রঘু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, টেররিস্ট, কমিউনিস্ট এসব নয় ত?—বলিয়াই কাজলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর একটা গেলাস হাতে তুলিয়া বলে, আসুন আমরা আজ সবাই কাজল দেবীর স্বাস্থ্যপান করি।

প্রত্যেকে এক একটি গেলাস তুলিয়া লয়। কাজলও একটা তোলে—সোডার গেলাস।

পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকাইয়া সবাই কাজলের স্বাস্থ্যপান করে। কাজলের মনে পড়ে তরুর ঘরে প্রথম রাত্রির দৃশ্য। স্বাস্থ্যপান শব্দের সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়।

গেলাসের পর গেলাস চলে। রঘু, ফজলে আলি এবং অনিলাদের স্বাস্থ্য পান হয়। তারপর মেয়েদের তিনটির একত্রে পাইকারী স্বাস্থ্যপান।

প্রথমে কাজল কয়েকখানা গান গায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত।

আলি বলে, খাসা গলা আপনার।

রঘু বলে, তরুকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কাজল মৃদু হাসিয়া প্রতিবাদ করে।

কাজলের আরও কয়েকখানা গানের পর শ্রোতারা চটুল গান শুনিতে চায়, যাতে সবাই মিলিয়া 'ব্রাভো' 'ব্রাভো' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতে পারে। সঙ্গে নাচাও চলে। দীন দালাল বলিল, এবার তোমার সেই ঠুন ঠুন পেয়ালা হ'ক, হেনা।

হেনা ধরিল, ঠুন ঠুন পেয়ালা ঠনন্ ঠনন্।

গানের সঙ্গে চলে নাচ। টম্যাটো দীন দালালের কোমর ধরিয়া নাচে। তার মোটা পায়ের দুম দুম শব্দে ঘরখানা কাঁপিতে থাকে। নাচিতে নাচিতে গাল লাল হইয়া ওঠে। রঘু বলে, মুখখানা টম্যাটোর মতনই হয়েছে। লাল লাল, ফুলো ফুলো,—বলিয়াই সে তার স্বাস্থ্যপান করে।

টম্যাটো ভারি খুশি। সে হাসিয়া বলিল, আমাকে নিয়ে আজ অবধি মদের পানা হ'ল তিন বার। আজই দু'বার। আর একদিন হয়েছিল সরষে ফুলের বাড়িতে। বিনির বোন সরষে ফুল।

তাদেরও স্বাস্থ্যপান হইতে পারে এই আশায় হেনা ও অনিলা গলার স্বর চড়াইয়া দেয়।

নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে ডিসের পর ডিশ চপ কাটলেট উড়িয়া যায়। অনিলারা তিনজনেই যেন উপবাসী ছিল। তার মধ্যে টম্যাটো সবার সেরা। সে একটা ফাউল রোস্ট নিঃশেষ করিয়া ফেলে। দীন আর একটা। সে বলিল, পাখী হচ্ছে আমার স্পেশিয়ালিটি, বিশেষ করে কোঁকর কোঁ।

ললিত উকিল এখানেও ওকালতির কথা ভুলিতে পারে না। ফজলে আলিকে বলে, মক্কেলের জামিন টামিনগুলো একটু তাড়াতাড়ি করে দেবেন, আলি সাহেব। ঐটেই ত আমাদের রোজগার।

আলি বলে, দেইই ত। নইলে আমাদেরই বা চলে কি করে?

চুরুট ও সিগারেটের ধোঁয়া মেঝের দু তিন হাত উপরে যেন মাকড়সার জাল বুনিয়া দেয়। ধোঁয়া, পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ ও মানুষের উষ্ণ নিঃশ্বাসে বাতাস ভারী হইয়া ওঠে। কাজলের এখনও এতটা সহ্য হয় না। সে কাশিতে আরম্ভ করিলে দীন দালাল তাকে খানিকটা তালমিছরি দিয়া বলে, এইটে মুখে রাখ। কাশি কমে যাবে।

আলি প্রশ্ন করে, আপনি তালমিছরি পকেটে রাখেন কেন?

দীন দালাল বলিল, রাখতে হয়। ফুসফুসের দোষ আছে কিনা তাই কবরেজ চুষতে বলেছে।

ক্রমে ক্রমে সকলেই নেশায় চুর হইয়া গেল। ব্যতিক্রম শুধু রঘু। তার মাথায় চাপিল নারীর নগ্ন সৌন্দর্য দেখিবে। সে বলিল, প্যারিসের এক ডি. লিট. আমার বন্ধু, মস্ত বড় চিন্তাশীল লোক। সে বলে, নাথিং লাইক নেকেড বিউটি।

টম্যাটো এই প্রস্তাবে সম্মত হয় বটে তবে অগ্রিম টাকা চায়। তাকে সমর্থন করে হেনা ও অনিলা।

মনিব্যাগ খুলিতে খুলিতে রঘু বলে, ওর জন্য আটকাবে না।

তার ভাগিনেয় পল্টু বলিয়া ওঠে, মামুর ওটা হচ্ছে ম্যাজিক ব্যাগ।

কী বেহায়াপনা! সামান্য টাকার জন্য মেয়েরা পুরুষের সামনে নগ্ন দেহে দাঁড়াইবে ভাবিতে কাজলের শরীর রি রি করিয়া ওঠে। সকলের অলক্ষ্যে সে বাহিরে যাইয়া ছাদে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়ায়।

ভারী সুন্দর রাত, জলপ্রপাতের মত জ্যোৎস্না যেন ঝরিয়া পড়ে। বাতাসে ও জ্যোৎস্নায় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কানে আসে সেতারের তান, দূরে কে যেন সেতার বাজায়। মনে হয় চাঁদিনী রাতের গায়ে জড়োয়ার গহনা পরাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে—কতক্ষণ কাজল তাহা জানে না—রঘু পিছন হইতে আসিয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিল। সে ফিরিয়া চাহিলে বলিল, বাঃ তুমিও দেখছি একজন কবি।

কাজল কহিল, রক্ষে করুন। কবিদের ত আপনি ঘেন্না করেন।

সাধনের কথা বলছ? লোকটা ভারী গরিব আর আনলাকি।

আপনার পয়সায় মদ খেত বলে ঘেন্না করেন কিন্তু তার ভেতরকার মানুষকে ত আপনি চেনেন নি।

রঘু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে, মানুষ দিয়ে কি হবে ?

কাজল তার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। পকেট হইতে মনিব্যাগটা তুলিয়া রঘু বলিল, দুনিয়ায় দাম শুধু এই ব্যাগের, ম্যাজিক ব্যাগ।

কাজল কহিল, কেন ? বাপ, মা, স্ত্রী, সন্তান সবই ত আপনার আছে।

রঘু বলিয়া উঠিল, নো, নো ! বাপকে ভালবাসি ম্যাজিক ব্যাগের মালিক বলে। আর স্ত্রী—সি ইজ, সি ইজ—

পরিচয়ের প্রথম দিন হইতেই কাজলের ধারণা, রঘুর মনে কি যেন গভীর দুঃখ আছে, আছে বিষাক্ত ক্ষত। আজ বুঝিল তার এই বেদনা পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। আজকের রঘু সেই বেদনারই ফল। ভুলিবার জন্য সে মদ খায়, লোককে মাতাল বানায়, রূপজীবিনীদের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

তুলারাশির জাতকের মতন তার সুন্দর কোমল চেহারা দিনের পর দিন তাই খারাপ হইয়া যাইতেছে। এই শিক্ষিত ধনী সন্তানের প্রতি কাজলের দয়া হয়। তার চোখের এই দরদ দেখিয়া রঘু তাকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া তার মুখে একটা চুমা খায়। কাজল আপত্তি করে না। রঘু আর একটা চুমা খায়। কাজল সরিয়া গিয়া বলে, না, না আপনি তরুদির—

বোগাস, সে কি আমায় মর্গেজ রেখেছে না কি ?

আরও খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়। শুধু এই বাড়ি নয়, পাড়াটাও নিঃশব্দ। রঘু বলিল, আমি এখন চললাম।

আর সবাই ?

আলি চলে গেছে। ওদের কি আর যাওয়ার ক্ষমতা আছে ? দেখবে এসো।

কাজল আগাইয়া আসিয়া দেখে দীন দালালের পাশে টম্যাটো শুইয়া। হাঁটু পর্যন্ত তার একখানা পা দেরাজের নিচে। হেনার মুখে গেঁজলা। রঘুর ভাগিনেয়ের বালিশের উপর পোড়া চুরুট, মুখময় চুরুটের ছাই। তার ডান পা অনিলার বুকের উপর। অদূরে বাড়িওয়ালীর মেয়ে আলতার বেড়াল কটকটি চোখ বুজিয়া নিবিষ্ট মনে হাড় চিবাইতেছে।

কাজলের মনে পড়ে মহাভারতের একখানা ছবি। ভারতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, বীরের শবে শবে কুরুক্ষেত্র আজ শ্মশান, শিয়াল শকুনির লীলাভূমি, এও সেইরকম। জীবনে কুরুক্ষেত্রের যেন শেষ নাই।

বাড়িওয়ালি কুসুম পরদিন সকালে আধ পাঁইট মদ ও একটা সোডা পাইয়া ভারী খুশি হইল। বলিল, কাজল এগার নম্বরের লক্ষ্মী। বাড়ির আমার ছিরি ফিরে গেছে। হরদম গাওনা বাজনা লেগেই আছে। বাবু আসছে না যেন মধুর কলসীতে পিঁপড়ের সার লেগেছে। তাই ত আলতাকে বলি, কাজলের মতন হতে। তবে ত দিদিমা, আয়ীমার নাম বজায় থাকবে। কিন্তু কি মেয়েই পেটে ধরেছি! মেয়ে তা শুনবে না। ও ত আর তোমার মতন বরাত করে আসেনি, কাজল। আর তোমার মতন আক্কেলবাজও নয়।

কাজল আজকাল প্রায়ই এই ধরনের প্রশংসা শুনিতে পায়। পায় বরাত ও আক্কেলবাজীর সার্টিফিকেট। এক এক সময় তার কাছে এগুলি মন্দও লাগে না।

সোনাবাগানে কার্তিক ও সরস্বতী পূজায় ঘটা খুব। ঘরে ঘরে পূজা। সুবালাদের ইচ্ছা কাজলও এবার সরস্বতী পূজা করে। প্রমীলা টম্যাটো এমন কি হর্তুকি পর্যন্ত বলিল, এবার ঘটা করে মায়ের পূজো কর, কাজল।

বাড়িওয়ালী কুসুম বলিল, সে ত সুখের কথা। এগার নম্বরে পূজোর পাট উঠে গেছে অনেকদিন। পূজো হত আমার দিদিমা কুমকমের সময়। সে কুমকম নেই, সে সোনাবাগানও নেই। বাবুরাও যেন চামচিকে বনে গেছে। বাবু ছিল লালারা, শীলেরা—সোনার গুঁড়োর উপর গড়াগড়ি যেত।

আজও পাড়ার মেয়েরা কুমকুমের পূজার গল্প করে। তা ছাড়া গাইয়ে বিন্দুর পূজার নাম ডাকও খুব।

কাজল বলিল, আমি কি পারব?

প্রমীলা বলিল, পারবি না কেন শুনি? তোর সবতাতেই ভয়! এত গাড়ি মটর এসে দরজায় লাগছে।

পূজোর জন্য তাদের কাছে টাকা চাইব?

নিশ্চয়। যৈবনে আমি ত বাবুদের নাক ধরে টাকা আদায় করতুম। যৈবন কি একটা সোজা জিনিস, বিশেষ করে তোর যৈবন।

কাজলের কিন্তু কিন্তু বোধ হয়। প্রমীলা তাকে বোঝায়, যারা বাবুদের কাছ থেকে মুচড়ে টাকা আদায় করতে পারে ওরা তাকেই বেশী পছন্দ করে। বোকা বনে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া বাবুরা চায় ধুমধাড়াক্কা। তুই

ধুমধাম করতে পারলে সারা শহর এসে তোর পায়ে লুটোবে। সম্ভব হলে বড়লোকের ছেলেরা তোর ছাদে এসে নামবে উড়ো জাহাজে করে।

গত বৎসর কাজল বান্ধবীদের অনুরোধ এড়াইয়া ছিল। এবার পারিল না। একে ত দুর্বল প্রকৃতির লোক, তা ছাড়া নামের লোভও হয়ত খানিকটা ছিল। সে পূজা করিতে সম্মত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই রঘুর ভাগিনেয় পণ্টু বলিল, বেটাছেলের কাজের ভার নিলুম আমি।

প্রমীলা বলিল, আমি হব পূজোর ম্যানেজার। আমি পুরনো বাড়িউলি।

সোনাবাগানে উঠিয়া আসার পর কাজলের সঙ্গে চারুর দেখা হয় খুব কম। সে বাটীর বাহির হয় না। কাজলও যাইতে সময় পায় না। এই উপলক্ষে তাই সে নিজেই চারু ও তরুকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল।

মাস কয়েক দেখা নাই। কিন্তু এর মধ্যে এ কী পরিবর্তন! চারু শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে। গায়ের রং ফ্যাকাশে, ঠোঁট দু'খানা ব্লটিং পেপারের মত সাদা—যেন আগের চারুর একটা কঙ্কাল।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, এত রোগা হয়ে গেছিস যে?

চারু বলিল, তবু বেঁচে আছি ত।

কেন মরার কি হ'ল? অবিশ্যি ইচ্ছে করে যদি আত্মহত্যা করিস সে কথা আলাদা।

চারু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

ভণ্ডুল সাহেবকে? সে ত জানা কথা—বলিয়াই কাজল লজ্জায় জিভ কাটে।

চারু বলে, তুইও একথা বললি? তা তোরই বা দোষ কি? অত বড় লোককে বোঝা ত সোজা নয়। পুলিস তিন তিনটে ফৌজদারিতে জড়িয়েছে। মজা দেখছে সবাই। তবে আমি ভেবেছিলাম তুই অন্তত ভুল করবি না।

কাজল তার হাত ধরিয়া বলিল, আমায় মাফ কর ভাই। ভুল হয়ে গেছে। ধরেছে আজ ক'দিন?

দিন ষোল হবে।

সেই থেকে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে শরীরের এই অবস্থা করেছিস বুঝি?

খাওয়া ছাড়িনি, তবে ছাড়তে হবে। যেদিন সাহেবের গ্রেপ্তারের খবর এলো দিদি সেই দিনই রোজগারের চেষ্টা করতে বলেছে।

এখন খাচ্ছিস কোথায়?

দিদির কাছেই। সে বলেছে পৌষ মাস খাওয়া বন্ধ করিস নে। এ মাসে একটা বেড়াল কুকুর তাড়াতে নেই, আর তুই ত মায়ের পেটের বোন—একটু হাসিয়া চারু আবার বলে, খাওয়া আমি বন্ধ করতুম কিন্তু করি নি—দিদির অকল্যেণ হবে বলে। আজ বাদে কাল মাঘ মাস। এর পর কি হবে জানি না।

কাজল সেদিন ছিল এক ঘণ্টার উপর। অন্যদিন অনেক কথা হয়, আজ আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না। চারু শুধু বার দুই বলিল, জানি কোন দোষ করে নি। খালাস সে হবেই। তবে এখনও জামিন পেল না—কথাগুলি অনেকটা স্বগতোক্তির মতন।

কাজল তরুকেও নিমন্ত্রণ করিল। বলিল, যাবেন কিন্তু দিদি।

তরু বলিল, খুব ঘটা হবে শুনছি। বিন্দুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

একথা কে বললে?

বলে পাঁচ জনে। সেদিন বিরিঞ্চি বলছিল।

কাজল বলে, না ও সব বাজে কথা। তার অবস্থা আর আমারও অবস্থা—বলে বটে কিন্তু তার কণ্ঠে যথেষ্ট অহমিকা প্রকাশ পায়।

সেদিন সে গোপনে চারুকে দশটা টাকা দিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিল গভীর বেদনা লইয়া।

তার পূজায় ঘটা হইল খুবই। অনেক বিখ্যাত গায়ক গায়িকা আসিলেন। আসিলেন শহরের বহু নামী লোক—সাংবাদিক সাহিত্যিক, উকিল এটর্ণি। দু'একজন নামজাদা দেশভক্তও ছিলেন।

পূজার পর প্রমীলা, ফাগুয়া তিন নম্বরের ভাইপো দোপেঁয়াজি টম্যাটো অনেকে বলিল, বিন্দু এবার তোমার কাছে হার মেনেছে।

কাজল খুশি হয় খুবই। সে আজ কুমকুমের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়াছে। এখন হইতে সোনাবাগানের মান মর্যাদা রক্ষার ভার তার উপর।

কয়েকদিন পরে ফাগুয়া একটি লোক লইয়া আসে। কাজলকে আড়ালে ডাকিয়া আগন্তুকের পরিচয় দেয়, মোহান্ত মহারাজ হ্যায়, গদ্দিকা মালিক।

মোহান্ত নেশা করিয়া আসিয়াছিল। প্রথমেই সে কাজলের হাতে টাকা দিল, ফাগুয়াকেও মোটা হাতে বকশিশ করিল।

ফাগুয়া চলিয়া যাইতেছিল, কাজল তাকে ডাকিয়া দুইটা কমলালেবু দেয়।

লেবু হাতে করিয়া কথাটা যেন তার মনে পড়িয়া গেল। সে কাজলের দিকে চাহিয়া বলিল, চারু দিদিমণি মর্ গিয়া।

খবরটা আসে বজ্রাঘাতের মতন। কাজল বলে, কি বলছিস তুই? কে মরল?

পরশু রাতমে চারু দিদিমণি গলেমে ফাঁস লাগাইল। এই সান—বলিয়া ফাগুয়া নিজের গলায় পরনের কাপড়ের খুঁট জড়ায়, জিভ বাহির করে।

চারুর সম্পর্কে কাজল অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছিল ইহা সত্য কিন্তু এতটা ভাবিতে পারে নাই। তার কল্পনায় ভাসিয়া ওঠে চারুর শেষ ছবি, ফাগুয়া সেই ছবিকে সজীব করিয়া তোলে। লেবুর কোয়া চোষে আর বর্ণনা দেয়—চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শিরাগুলি নীল, পায়ের পাতা মাটির দিকে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পানওয়ালার দোকানে সুতায় বাঁধা রঙিন কাঁচের বলের মত বাতাসে দেহ একটু একটু দোল খায়।

কাচের বলের দোল খাওয়ার মতই যেন একটা সাধারণ ঘটনা। ফাগুয়া সেইরূপ নির্বিকারভাবে বলিয়া যায়। নিজের সত্যবাদিতার বড়াই করে, হাম আপনা আঁখসে দেখলু।

কাজল বলে, তুমি চুপ কর ফাগু।

ফাগুয়া চুপ করে বটে কিন্তু তার আগে টিপ্পনী করিয়া লয়—উসকা দিদি বড় হারামি আছে।

সে চলিয়া গেলে কাজল মোহান্তকে বলিল, আজ আপনি যান, দয়া করে আর একদিন আসবেন।

মোহান্ত বলে, মাইরি আর কি!

না, না। আজ আমায় ছুটি দিন। আপনার টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি।

কেন? পানওয়ালা যার কথা বললে সে তোমার কিছু হত না কি?

হত না কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল।

বেশীর নিকুচি করেচে। ঝুটমুট কারবার মাটি করবে কেন?

কাজল যত আপত্তি করে, মোহান্তের সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হয়। কাজল দেখে আপত্তি করা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, এর পর লোকটা হয়ত অপমান করিয়া বসিবে। তাকে নীরব দেখিয়া মোহান্ত বলে, হারমোনিয়মটা এই দিকে এগিয়ে দাও দেখি।

কাজল হারমনিয়ম আগাইয়া দেয়।

এই ত লক্ষ্মী মেয়ে—বলিয়া মোহান্ত সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করে। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি বেসুরো বাজনা। একে ত মন খারাপ তার উপর এই উৎপাতে কাজল অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। মোহান্ত বলে, চুপ করে রইলে যে? এস কোরাস গাই—

ঠাকুর দাদা পেয়ারা খায়,
কাঁচা খায় ডাঁশা খায়
পাকার ত কথা নাই,
ঠাকুর দাদা পেয়ারা খায়।

সে এর মধ্যেই লখিয়াকে দিয়া মদ আনাইয়াছিল। মদ খাইতে খাইতে এবার নিজের বংশের গল্প আরম্ভ করিল, আমরা হলাম মোষচণ্ডীর মোহান্ত। মোষচণ্ডী বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। দেবীর নামেই গ্রামের নাম। আমি মহারাজ রামভদ্দরের নাতি বলভদ্দর। মদ খেত ঠাকুরদা। ইয়ার বন্ধু নিয়ে বসত, মাঝখানে থাকত রূপোর তৈরি মদের গামলা। গামলায় একটা গোলাপ ভাসত। দাদুর ইয়ের নাম গোলাপ ছিল কিনা।

মুখে নল লাগিয়ে তারা মাল টানত। যে পরপর পাঁচ বার গোলাপটাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারত, সেদিনের জন্য তার উপাধি হত বাহাদুর। বাহাদুরি ঠাকুরদাদারই একচেটে ছিল। তা ছাড়া অন্য ব্যাপারেও সুবিধে আমাদের খুব। যে সব মেয়েরা পুণ্যি করতে আসে—

কাজল বলে, আপনি চুপ করুন।

বলভদ্র কিন্তু পিতামহের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। কাজলের গায়ে বমি করিয়া দেয়। মদের সঙ্গে বাহির হয় ডিমের কুচি আর কাটলেটের টুকরা।

টাকার পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া মোহান্ত চলিয়া যায়। কাজল আধঘণ্টা ধরিয়া স্নান করে। সাবান ঘষে, গঙ্গাজল ছিটায়। তবুও শরীর ঘিনঘিন করে। সে ভাবে চারুর কথা। চারুর প্রেম—তার মৃত্যু। তার সব জ্বালা জুড়াইয়াছে। সে ভালবাসিতে জানিত, তাই মরিতে পারিল।

আর সে নিজে? সে কখনও ভালবাসে নাই। নিজের দেহের সুখ সম্ভোগ ভিন্ন আর কিছু চেনে নাই তাই এই পুরস্কার। বলভদ্রের কাছে লাঞ্ছনাই যে তার প্রাপ্য।

পরদিন সকাল আটটার ডাকে এক চিঠি আসিল। চারুর চিঠি। সে লিখিয়াছে,

ভাই কাজল, তুই যেদিন নেমন্তন্ন করে গেলি সেই দিনই তোদের সাহেব এসেছিল। সে ভারী রোগা হয়ে গেছে। চোখ বসে গেছে, তার কণ্ঠার হাড় গোনা যায়।

মান্দ্রাজের একটা চেট্টি তার নামে দু'নম্বর ফৌজদারি করেছে। মিথ্যে মামলা। চেট্টিরা নাকি ঐ রকম করে।

এখানকার পুলিশ ওকে ধরে টিউটিতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে জামিন হয়েছে। মামলা মান্দ্রাজে তাই ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হবে ঢের।

সে বড়, খুব বড়। আমার মতন একটা মেয়েকে নিয়ে তুষ্ট থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। যারা বড় তারা নাকি একজনকে নিয়ে তুষ্ট থাকেও না। ওদের ধরনই ঐ। সে যে আমাকে নিয়ে খুশি নয় তাও জানতুম।

কিন্তু সেদিন যা দেখলুম তাতে দুনিয়ার উপর ঘেন্না ধরে গেছে, নিজের উপর আরও বেশী। কিন্তু ভাই, দৃশ্যটা যদি না দেখতুম। কি দেখলুম জানিস? দিদিতে আর সাহেবে খুব ঢলাঢলি।

তোর ভাল হ'ক, সাহেবের ভাল হ'ক। সে বড় হ'ক, আরও বড়। এইই আমার শেষ চিঠি। দুঃখ এই যে তোকে আর দেখব না।

চিঠিখানা পড়িয়া কাজল একটু স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। তরুর উপর কোন দিনই সে খুশি নয় কিন্তু আজ মনে হয় তাকে পাইলে সে মারিয়া বসিতে পারে।

দুপুরে একদল পুলিস আসিয়া উপস্থিত। পাঁচ ছয়টি পাহারাওয়ালা, একটি জমাদার ও দুইজন অফিসার। তাদের মধ্যে একজন গোয়েন্দা বিভাগের, অপরটি ফজলে আলি। সঙ্গে ভণ্ডুল, তার পরনে লুঙি, গায়ে সিল্কের হাতকাটা পাঞ্জাবি।

তার পরিবর্তন হইয়াছে অনেক। শরীর আগের চেয়ে কৃশ, বাঁ চোখে কালো ফিতার সঙ্গে ঝুলানো চৌকো চশমা, নাকের নিচে ছোট্ট বাটারফ্লাই গোঁফ।

পুলিসের আবির্ভাবে গলিতে সাড়া পড়িয়া যায়। এগার নম্বরের মেয়েরা প্রমাদ গনে। মীনা যাইয়া কুসুমের খাটের তলে লুকায়। বাড়িওয়ালী গজর গজর করে, আঃ মরণ, তুই আবার এখানে ঢুকুতে এলি কেন?

মীনা ঠোঁটে আঙুল দিয়া বলে, চুপ মাসি।

ফজলে আলি ও গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার কাজলের ঘরে আসিয়া বসেন। ভণ্ডুলকেও ঘরে আনা হয়। সে চশমা মুছিতে মুছিতে ছাদের দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে,—ওঃ ডিয়ার ডিয়ার।

গোয়েন্দা অফিসার কাজলকে প্রশ্ন করেন, তোমার নাম ?

কাজল।

আগে কি নাম ছিল ?

ঐ নামই ছিল। নাম আমি বদলাই নি।

একে চেন ? এর নাম বলতে পার ?

হ্যাঁ চিনি। ওর নাম বোস সাহেব। কেউ কেউ বলে ভণ্ডুল সাহেব।

কোথায় দেখেছ ?

চারুর ঘরে। তাদের বাড়িতে আমি ভাড়াটে ছিলুম।

শুনেছি চারুর সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল।

হ্যাঁ। সে আমায় খুব ভালবাসত।

সে কখনও তোমার কাছে এর কথা বলত ?

হ্যাঁ, প্রায়ই বলত।

চারু কখনও বলেছে যে ভণ্ডুল তার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে ?

কাজল নীরব।

কথা বলছ না যে ? এ চারুর কাছ থেকে সাত হাজার টাকা নিয়েছে শুনেছ ?

হ্যাঁ, বাড়ি করবে বলে নিয়েছিল। বাড়ি হবে চারুর নামে।

গোয়েন্দা অফিসার ফজলে আলির দিকে চাহিয়া বলিলেন, মেয়েদের বেলায় সব জায়গায় এই এক ফন্দি। আর ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ফল্‌স পারসনিফিকেশন।

তারপর আবার কাজলকে প্রশ্ন করিলেন, ভণ্ডুল সাহেব কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলে শুনেছ ?

না।

চারু তোমার কাছে এই বলে দুখ্‌খু করত যে ভণ্ডুল তাকে মারধর করে ?

ভণ্ডুল বলিল, ওঃ ডিয়ার, ডিয়ার।

গোয়েন্দা ধমক দিলেন, ইউ স্টপ্‌। (তারপর কাজলের দিকে চাহিয়া) এ চারুকে মারধর করত ?

না।

চারু আর কি বলত ?

বলত, এত বড় লোক, ওকে বোঝা ত সোজা নয়।

অফিসার ও আলি দু'জনেই হাসিয়া ফেলেন। আবার প্রশ্ন হয়, ভণ্ডুল আর কোন মেয়েকে ভালবাসে বলে চারু রাগ করত ?

আমি জানি না।

তুমি তার কাছে বোলতা বা পাখোয়াজের নাম শুনেছ ?

না।

তুমি জান যে চারু মারা গেছে ?

হ্যাঁ।

শুনলে কার কাছে ?

ও পাড়ার পানওয়ালা ফাগুয়ার কাছে।

সে বলতে এসেছিল কেন, তোমায় সাবধান করতে এসেছিল বুঝি ?

সাবধান কিসের ?

এই ধর, পুলিস আসার আগের সাবধানতা।

কাজলের মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়।

ঠিক করে বল ত ফাগুয়া কেন এসেছিল।

এসেছিল একটি লোক নিয়ে, তখন বলে গেছে।

তুমি বেশ পাকা লোক দেখছি। গভীর জলের মাছ। যাক্, ভণ্ডুল জামিনে খালাস হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছে ?

না।

সে চারুর বাড়িতে এসেছিল জান ?

হ্যাঁ। চারুর চিঠিতে আজ জানলাম।

চিঠিখানা কই ?

ছিঁড়ে ফেলেছি।

তাতে নিশ্চয়ই তোমায় লিখেছে, এই আমার শেষ চিঠি।

হ্যাঁ।

তার দুঃখের কারণও লিখেছিল ?

কাজল থতমত খাইয়া বলিল, না তা ছিল না।

ভয় পেয়ে যাচ্ছ দেখছি। হবেই ত। চিঠিখানা ভালয় ভালয় বার করে দাও।

সত্যিই ছিঁড়ে ফেলেছি, কুচি কুচি করে।

কি লিখেছিল ?

আর কিছু না।

তুমি কি এটা বিশ্বাস করতে বল ? দেখছি থানায় না নিয়ে গেলে—কথাটা শেষ না করিয়াই অফিসার জমাদারকে হুকুম করেন, আসামীকো বাহার লে যাও।

বাহিরে যাওয়ার সময় ভণ্ডুল ঘাড় বাঁকাইয়া শূন্যে চাহিয়া সুর করিয়া বলে, ইট ইজ লং লং ওয়ে টু টিপারারি।—সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক হইতে চশমা খুলিয়া পড়ে।

গোয়েন্দা অফিসার এবার কাজলকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, এই ব্যাপারে তুমিও আছ। আমাদের রিপোর্ট সেই রকম।

আমি !—কাজল যেন আকাশ হইতে পড়ে। তার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না।

হ্যাঁ। তুমি পড়তে পার ত ? দেখ প'ড়ে—বলিয়া অফিসার কাজলের হাতে একখানা চিঠি দেন। সে চিঠির উপর চোখ বুলাইয়া নিলে বলেন, চারুর লেখা না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পড়ে শোনাও দেখি।

কাজল পড়িতে লাগিল,

কলিকাতা পুলিসের বড় সাহেব মহোদয় মান্যবরেষু,

আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়। দিদি নয়, বোস সাহেব নয়, কাজলও নয়। ইতি বশংবদ শ্রীমতী চারুলতা দাস্যা।

অফিসার বলেন, এর মানে বুঝতে পারছ ? মরার পর এ কাগজখানা তার ব্লাউজের মধ্যে পাওয়া গেছে।

কাজল কহিল, আমাদের দোষ নেই তাই ত বলে গেছে।

তাতেই ত সন্দেহ আরও বেশী হয়। লিখবার মানে কি—বলিয়া অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকান।

কাজল ত সাধারণ মেয়ে, তার এই চাহনির সামনে পাকা অফিসারেরও মাথা নিচু হইয়া আসে। কাজলের পা কাঁপিতে থাকে।

ডিটেকটিভ বলেন, চারুর চিঠিতে মনে হয় তোমরা দুজনেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে

আছ। তুমি আর ওর বোন তরু।' ভণ্ডুল জামিনে খালাস হওয়ার পরেই তিনজনে মিলে—

না, না পুলিস সাহেব। আমি চারুকে বড় ভালবাসতুম। আমি কিছু জানি না।

বেশ দেখা যাক্।

ফজলে আলি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সে এবার কাজলকে বাহিরে ডাকিয়া বলিল, অফিসারটি বড় কড়া লোক। হয়ত তোমায় বিপদে ফেলবে।

জানি ত সবই। কিন্তু এই মামলার ভার ওঁর উপর। উনি কি মনে করবেন তাই তোমার সঙ্গে যে আলাপ আছে তাও জানতে দেই নি। দেখলে না?

তা বুঝেছি।

কাজল চুপ করিয়া থাকে। আলি এবার স্বর একটু নিচু করিয়া বলিলেন, জানই ত ডিটেকটিভরা কালোকে সাদা করতে পারে। কিছু টাকা দিয়ে দাও।

এবার কথা চলে আরও নিচু গলায়। একটু পরে ভণ্ডুল পুলিসের সঙ্গে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাওয়ার সময় তার ইংরেজী গান শোনা যায়,

আই লভ্ ইউ, এণ্ড ইউ লভ্ মি।
বী লভস্ ড্রোন্, এণ্ড ড্রোন্ লভস্ বী।

পুলিস আসায় বাড়িময় ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। কাজলকে হয়ত একটু অসুবিধায় পড়িতে হইত। কিন্তু তার বরাত ভাল। অফিসার যাওয়ার সময় হাসিয়া কথা বলিলেন। ফজলে আলি তার সঙ্গে করমর্দন করিল।

আড়াল হইতে কুসুম ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। পুলিস চলিয়া গেলে সে পাড়ার সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, লাল পাগড়ি দেখে সবাই ত ভয়ে কাঁপছে। জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি কুসুম দি!

আমি বলি, পুলিস মাজেষ্টর ওর ঘরে আসবে না ত আসবে কোথায়? বড় লোকেরা, হাতী ঘোড়ারা ত ওর দরজায় বাঁধা। আমি নিজের চোখে দেখনু একটা নিসপেক্টর ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। আর এক মিন্সে কাজুর হাত ধরে কি ঝাঁকানিই না ঝাঁকালে! যেন বিন্দাবন পেয়েছে, রাস নীলে করতে চায়।

কাজল চলার মাঝপথে থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, এ কী? জীবনের এইই কি পরিণতি?

একদিন সে সুবালাকে বলিল, বেশ গেল চারু, গায়ে কাদা মাটি মাখল না। দুনিয়াকে কেমন ফাঁকি দিলে। আর আমরা?—শেষের কথা দুটির মধ্যে নিজের উপর তীব্র বিরক্তি প্রকাশ পায়। সুবালা বলে, তোর আর দুখ্‌খু কি? দুখখু আমাদের। খেতে নেই, পরতে নেই।

কাজল কহিল, ঠিক বুঝলি না। আমি সে কথা বলি নি।

সুবালা অভিমানের সুরে বলিল, আমরা গরিব। আমরা ত বুঝবই না।

কাজল দেখে এই রাস্তার মেয়েদের কাছে জীবন সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করা বৃথা। এদের অবস্থা পাঁকের কেঁচোর মতন। এরা বোঝে না যে কিসের মধ্যে আছে। কোথায় আছে। কাজলের আজ মনে পড়ে মণিমালাকে। সে থাকিলে হয়ত বুঝিত।

মন তাকে মাঝে মাঝে অতীত জীবনে লইয়া যায়। সুন্দর স্মৃতি—দেশের স্মৃতি, রথীনের স্মৃতি। এগুলিও ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ছবির কাচের উপর ধূলা পড়িলে যেমন হয়, সোনাগাবানের জীবনের মলিনতার ছোপ পড়িয়া এই সব ছবিরও যেন রং চটিয়া গিয়াছে।

একদিন বেলা ন'টা আন্দাজ লখিয়া আসিয়া খবর দিল, তুমার দেশোয়ালী আদমি আইছে।

দেশের লোক! দাদাটা কী জ্বালাতেই না পারে?—মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই কাজল চাহিয়া দেখে সামনে পাঁচু।

ঘরখানা ভাল করিয়া দেখিয়া পাঁচু বলিল, বাঃ বেশ বড় মানুষ হয়েছ। চেহারাও বাগিয়েছ খাসা।

কাজল কোন উত্তর করে না। শুধু একবার পাঁচুর দিকে চায়। চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে সাধারণ বাঙালীর যেরূপ হয় এই কয় বছরে পাঁচুও সেইরকম বেশ একটু মোটা হইয়াছে। তার গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরনে হলুদ পাড় মিহি ধুতি, পায়ে চেকের মোজা, গায়ে রঙিন শাল। সে বলিল, চক্কোত্তি বংশে তুমিই সব চেয়ে সেয়ানা। তবে এতে আমারও কিছু বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

কাজল বলিল, তোমার কি একটু লজ্জাও নেই ?

লজ্জা! লজ্জা কিসের ? তোমার বরং উচিত আমায় ধন্যবাদ দেওয়া।

বেশ ধন্যবাদ, হাজারো ধন্যবাদ। এসেছ কি মনে করে ?

কেন, কিছু ঘাট হয়েছে না কি ? এলেম তোমায় দেখতে। দেশে বসে শুনলাম তোমার যেমন পয়সা হয়েছে, তেমনি নাম ডাক। তাই ইচ্ছে হ'ল একবার দেখে আসি। যারা আমার ভালবাসা পেয়েছে তাদের সবারই বরাত খুলেছে। ভাসানির সোয়ামী আজ নামী ডাক্তার, বসনের ছেলে ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছে, কদমের—কত আর বলব ?

কাজল কহিল, বেশ ত, বলে যাও।

শুনলাম তোমারও ফি একান্ন টাকা। জেলা কোর্টের একটা বড় উকিলের ফি! আর কলকাতার সেরা ডাক্তারদের।

কাজলের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল, কি চাও তুমি আমার কাছে ?

চাই অনেক কিছু—পাঁচু এবার আঙুলের পর্ব গুণিয়া বলিতে লাগিল, এক নম্বর চাই টাকা।—দু নম্বর—

টাকা! টাকা কিসের ?

তোমার দাদা জমি বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছে। ডিক্রি করেছি, সেই টাকা।

কেন, জারি দিলেই পারতে ?

গণেশ তোমার ভাই, আমার ব্রাদার-ইন-ল বললেই চলে। তাই জারি নেই নি।

সে না তোমার বন্ধু ?

বন্ধু, হেঃ হেঃ বন্ধু! সে ছিল বঁড়শির টোপ। সেই টোপে তোমায় গেঁথে তুললুম। এমনি করে—বলিয়া পাঁচু বঁড়শি দিয়া মাছ ধরার কৌশল দেখাইয়া দেয়।

কাজলের চোখ মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসে। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাঁচু বলিল, তোমার আমার গ্রহের কি একটা যোগাযোগ আছে। রাশ নক্ষত্রের মিল। দেশে তোমাদের সমস্ত পরিবারকে আমি খাইয়ে পরিয়ে রেখেছি।

কেন, গোরা ? তারও কিছু হল না ?

সে জেলে।

জেলে!

ডাকাতি করে জেলে গেছে। স্বদেশী ডাকাত।

স্বদেশী ত?

পাঁচু হাসিয়া বলিল, ডাকাতের আবার দেশী বিদেশী, গরিবের ঘোড়া রোগ। ঘরে খাবার নেই আর তিনি গেলেন দেশ-প্রেম করতে। যত সব—

কাজলের কানে সব কথা যায় না; সে তখন ভাবিতেছিল গোরার কথা। শ্যামবর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল দুটি চোখ, ওষ্ঠের উপর হয়ত গোঁফের ঘন-কৃষ্ণ রেখা পড়িয়াছে। গোরা আজ লৌহ গরাদের পিছনে।

কাউন্সিলের নির্বাচনের সময় কাজল নগরীর দেয়ালে দেয়ালে লৌহ গরাদের পিছনে সুভাষচন্দ্রের মূর্তি দেখিয়াছিল। মনে পড়িল সেই মূর্তি।

তাকে নীরব দেখিয়া পাঁচু বলিয়া উঠিল, ভাবনাময়ী আবার ভাবতে বসে গেছে দেখ্‌ছি।

কাজল মুখ তুলিয়া বলিল, বাড়িঘরের খবর ত দিলে। আর কি বলবে বল। মা আছেন কেমন?

ভালই। তবে চিন্তা ভাবনায় একটু রোগা হয়ে গেছেন। যাক্, এক নম্বর ত হ'ল। দু'নম্বর, আমি তোমায় চাই।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, আর?

রাগ করছ দেখছি। হেঃ হেঃ তোমার অমন রূপ কিন্তু রাগ করলে—

এই সময় মা মা বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে মীনা ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, এ কে মা?

আমি তোমার বাবা—বলিয়া পাঁচু তার দিকে হাত বাড়াইতেই মীনা সরিয়া যায়।

পাঁচু কাজলকে প্রশ্ন করিল, এ আমাদের মেয়ে না?

কাজল নীরব। পাঁচু মীনার হাত ধরিয়া বলে, কাছে এস। আমি তোমার বাবা।

মীনা বলে, ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। মা রাগ করে।

আগেও দু'একজন মীনাকে বলিয়াছে, আমি তোমার বাবা! একদিন সে মাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, মোটা বাবু কি আমার বাবা?

কাজল মেয়ের গালে এক চড় মারে। সেদিন মীনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, মোটাবাবু যে বললে সে বাবা হয়।

পাঁচু বলিল, তুমি জিজ্ঞেস কর। মা রাগ করবে না।

মীনা মায়ের দিকে তাকাইলে সে মুখ ফিরাইয়া নেয়। মীনা বলে, কেন, এ পাড়ায় ত কারও বাবা থাকে না। শুধু মা থাকে।

পাঁচু হাসিয়া বলিল, এর মধ্যেই অনেক কিছু শিখেছিস দেখছি।

মীনা বলিল, পিরমিল মাসী যে সেদিন বলল।

পাঁচু কহিল, ভাল কথা। পিরমিলদির খবর কি? তার জন্য দেশ থেকে একটা নস্যির ডিবে এনেছিলুম। শামুকের খোলার তৈরি।

কাজল বলিল, আছে ভাল।

হর্তুকি, প্রিয়, সুবালা?

সবাই ভাল আছে।

পাঁচু মীনার হাতে চকচকে একখানা সিকি দিলে মীনা বলিল, ওঃ সিকি—যেন নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস।

পাঁচু বলিল, হবেই ত। বড় মানুসের মেয়ে। ঘরে টাকার স্রোত বইছে।

সে ছিল প্রায় ঘণ্টা খানেক। এর মধ্যে দেশের অনেক গল্প করিল, বেশীর ভাগই টাকার গল্প। নিজের টাকারই বেশী, তা ছাড়া গ্রামের কার রোজগার কেমন! আর করিল নতুন নতুন মেয়েদের কুৎসা।

খানিকটা পরে কাজল বলিল, আমাদের কাছে তোমার পাওনা কত বল দেখি?

সে নির্ভর করছে তোমার উপর। তুমি খুশি করলে—

না, না, তার চেয়ে বরং তুমি ঘর বাড়ি নিলেম করে নাও। আমার মা ভাই সব গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াক।

পাঁচু বলিল, আমায় সহ্য করতে পারছ না বুঝি? কিন্তু এত রাগ কিসের শুনি? একদিন এই গোঁফে ঠোঁট দিয়ে কত আদর করেছ। মনে নেই?—বলিয়া পাঁচু গোঁফে তা দেয়।

কাজল কোন উত্তর দেয় না। পাঁচুর দিকে তাকায়ও না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে ভালবাসিত। ভয়ও করিত। আজ সে প্রেম নাই কিন্তু ভীতিটুকু আছে। এ এক অদ্ভুত মনোভাব। পাঁচুর উপর বিরক্তি তার খুবই কিন্তু সে জোর করিয়া কোন কিছু চাহিলে কাজলের তাকে না বলার বোধ হয় সাধ্য নাই।

পাঁচুও সেইটুকু বুঝিয়া গেল। বলিল, কাল আবার আসব।

কাজল এবারও বলিল, না, না। কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠে।

পাঁচু পর পর কয়েকদিন আসিতেছে। আসিয়া মদ খায়, সুর ভাঁজে আর অনর্গল কথা বলে। সে আজকাল ধূপগঞ্জ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। খাতির করে সবাই, সালিশিতে ডাকে। বিষয় সম্পত্তি লইয়াও নিজের বৌদির সঙ্গে তার মামলা চলিতেছে। তবে দলিল পত্র সব তার হাতে। সম্পত্তিও তার নামে বেনামায় কেনা।

কাজল প্রশ্ন করে, তোমার দাদা?

অক্কা পেয়েছে। সেও শেষটায় বৌর কথায় উঠত বসত। ভীমরতি ধরেছিল।

কাজল তাকে হালকা ধরনের মানুষ বলিয়াই জানিত কিন্তু পাঁচুর এই নীচ বিষয়ী রূপ দেখিয়া তার মনটা ঘৃণায় ভরিয়া গেল।

পাঁচু মীনাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করে, তাকে তুলার খরগোস দেয়। আর রান্নার ছোট হাঁড়িকুঁড়ি। কিন্তু মীনা বাগ মানে না। মায়ের আর পাঁচটি বাবুর মতন তাকেও সন্দেহের চোখে দেখে। ঈর্ষা করে।

কালো গোঁফওয়ালা এই মানুষটি যে তার বাবা, ইহা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। সে কাছে টানিলে সরিয়া যায়। আমি তোমার বাবা— বলিলে উত্তর করে, ই—ই—স্।

এবারও পাঁচুর প্রধান বন্ধু প্রমীলা। মাঝে মাঝে তাকে এ বাড়িতে লইয়া আসে। নস্য দেয়। প্রমীলা বলে, পরিমলে আর শানায় না। আমায় র' দিও আর সিদ্ধির কুলপি।

সিদ্ধির কুলপি কেন? মালই খাওয়াব।

এ বয়সে মদ আর খেতে চাই না। বয়েসটা অবিশ্যি এমন বেশী নয়।

পরদিনই প্রমীলা মদ খায়। প্রচুর মদ। বেশ একটু নেশা হইলে গান ধরে,

কে পোয়াতী রসবতী
খোলা নিবি আয় লো···

তার কাণ্ড দেখিয়া কাজল কাঁদিয়া ফেলে।

দিন কয়েক পরে পাঁচুর এক পাটি জুতা হারায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া যায় না। পাঁচু বলে, আমায় তাড়াবার জন্য শেষটায় জুতো সরাতে আরম্ভ করলে?

কিছুদিন যাবৎই এই ধরনের উৎপাত শুরু হইয়াছে। আজ কাজলের কোন বাবুর জুতো হারায়। কাল নস্যের ডিবা। একদিন দেখা যায় হারমনিয়মের রিড ভাঙা।

সরস্বতী পূজার কয়েকদিন আগের কথা। কুসুম একদিন বলে, তোমার ঘর ব'লে বাবুরা তবু আসছে। অন্য ঘরে এই কাণ্ড ঘটলে কুরুক্ষেত্তর হয়ে যেত।

প্রিয়র মতে এসব হিংসুটদের কাজ। সে বলে, তোর পসার দেখে সবাই হিংসেয় ফেটে পড়ছে ত।

কাজলেরও সন্দেহ হয়। সন্দেহ অনিলার উপর। সে লোকের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে, রাগ সেই জন্যে। এই ব্যাপার লইয়া অনিলার সঙ্গে কাজলের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। একদিন কাজল এই ধরনের ইঙ্গিত করায় অনিলা বলে, কথায় কথায় তুই সবাইকে পায়ে ঠেলবি। কেন? কিসের জন্য শুনি?

তুই হিংসুটে। আমার পসার দেখে হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছিস।

হিংসে কিসের? দেহ বেচার বড়মানষি, তার আবার হিংসে। গলায় দড়ি দে রে।

কাজল হঠাৎ থামিয়া যায়। ভাবে, এ কী! সে কি পাগল হইয়া গেল না কি?

ঝগড়াটা বন্ধ হওয়ায় কুসুম টম্যাটোর কাছে আক্ষেপ করে, এ্যাঁ থেমে গেল! ওদের চুলোচুলি হল না! মেয়েদের চুলোচুলি দেখতে বেশ কিন্তু। আর বেরালের কলো। (কলহকে সে বলে কলো)

কয়েকদিন পরে পাঁচুর চশমা হারাইয়া গেল। বাথরুমের সামনেই একটা টেবিলের উপর চশমা রাখিয়া সে বাথরুমে গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখে চশমা নাই।

সে চেঁচামেচি আরম্ভ করে, গালি দেয়। ভয় দেখায়, আমার মামাশ্বশুর পুলিসের বড় চাকরে। তাকে নিয়ে আসব। কোমরে দড়ি দিয়ে সব বেঁধে নিয়ে না যাই ত আমার নাম পাঁচু হাজরা নয়।

সেদিন প্রমীলা ছিল। সে অনেক বুঝাইল। পাঁচু বলিল, জান ত দিদি চল্লিশ টাকার কমে আজকাল চশমা হয় না।

প্রমীলা বলে, তা আর জানি না? না জানি এমন বিষয় নেই। নিমতলা চিনি কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি।

কি করি বল ত দিদি? মামাশ্বশুরকে ডেকে আনব?

তুমি কাজলের ফিসের কথাও একবার ভাব। একান্ন টাকা। কদিন এসেছ বল দেখি?

হিসাবের অঙ্কে তার লোকসান হয় নাই দেখিয়া পাঁচু কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু সেই হইতে সে আর আসে নাই।

প্রমীলা বলে, ভাইয়ের পেরেম আমার চড়ুইর পালকের মতন। পাছে শেষটায় সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন আর শাল নিয়ে টান পড়ে এই ভয়ে সরে পড়েছে। একেই বলে বোঝদার মানুষ।

এর কয়েকদিন পরে কাজল ঘরে ঢুকিয়া দেখে মীনা ছুরি দিয়া তবলার চামড়া কাটিতেছে। সে বলে, এ কি করছিস? মীনা থতমত খাইয়া যায়।

কাজল বলে, বল্ তবলা কাটছিলি কেন?

মীনা নীরব। কাজল বলে, তাহলে এসব তোরই কাণ্ড? বাবুদের জুতো আর চশমা চুরি, হারমনিয়মের রিড ভাঙা—

মীনা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলে কিন্তু কিছুই স্বীকার করে না। কাজল বলে, কী দুষ্টু মেয়ে! হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। রক্তের দোষ। বল্ এসব কেন করেছিস?—বলিয়াই মেয়ের গালে দুটা চড় মারে।

মীনা এবার সবই স্বীকার করে। জুতা ও চশমা লুকানো, রিডভাঙা সবই তার কাজ।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, সে সব করলি কি?

ঐ হোথায়—বলিয়া মীনা পাশের বাড়ির দোতলার ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

ঐ দোতলার ছাদ এ-বাড়ির তেতলার চেয়ে নিচু। মীনা আলিসার ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া ঐ বাড়ির গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের ভিতর সব ফেলিয়া দিয়াছে।

পরের দিন ঐ ট্যাঙ্কের ভিতর হইতে সব জিনিসই পাওয়া যায়। কাজল মেয়েকে বলে, এ সব করেছিস কেন?

মীনা অভিমানের স্বরে বলিল, কেন, ওরা কেন আমার মায়ের কাছে আসবে?

উক্তিটা অভাবিতপূর্ব। কাজল মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। একটু পরে মীনা বলে, আর করব না মা।

মেয়ের কাছে কিন্তু কাজলের এবার সম্পূর্ণ পরাজয় হয়।

সময় কাটিয়া যায়। মীনা বড় হইয়া ওঠে। তাকে ঘিরিয়া কাজল নানা কল্পনা করে। মীনাকে সে ভদ্র করিয়া তুলিবে, শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। তাকে বারবনিতার জীবন যাপন করিতে দিবে না।

শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ বহুদিনের। এই অনুরাগ জন্মায় রথীনের সান্নিধ্যে। তারপর জীবনপ্রবাহ নানা খাতে বহিয়া গিয়াছে, নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া। কিন্তু সেই অনুরাগ আজও লোপ পায় নাই। এখনও সে খবরের কাগজ পড়ে। সুযোগ পাইলেই গল্প উপন্যাস নাটক পড়ে।

আগে মীনাকে সে নিজে পড়াইত, এখন পড়ায় একজন মাস্টার। লোকটি সাধনের দেওয়া। সাধন নিজেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মীনাকে লইয়া বসে। পশুপক্ষীর ছবি আনিয়া গল্পচ্ছলে বলে, কোন্ দেশে কোন্টার বাস, কোন্টা মাংসাশী, তৃণভোজীই বা কোন্গুলি। ডিম টম্যাটো কমলালেবু আনিয়া করে ভিটামিনের গল্প। জোয়ার-ভাঁটা কেন হয়, চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ হয় কেন—এই সব বুঝাইয়া দেয়।

কাজল মেয়েকে উৎসাহ দেয় নানা রকমে। সে ভাল পড়া পারিলে সুন্দর পুতুল কিনিয়া দেয়, কোনদিন দেয় রঙিন খেলনা।

মীনা কখনও হয়ত প্রশ্ন করে, বলত মা আলেকজাণ্ডার কে? কাঙারু কাকে বলে?

কাজল না জানার ভান করে। বলে, অত জানিনে বাবা।

তুমি কিছুই জাননা মা—বলিয়া মীনা হাসে।

সে কখনও ইংরেজী বলে। আধ বাংলা মিশানো দু'একটা ইংরেজী শব্দ তার মুখে বেশ শুনায়।

একদিন সুবালা কাজলকে প্রশ্ন করিল, মেয়েকে মাস্টারনি করে তুলবি নাকি? অত লেখাপড়া শেখাচ্ছিস যে?

কাজল কহিল, ওর বরাতে কি আছে জানি না। তবে ওকে অন্ধ করে রাখতে চাই না।

অন্ধ! কেন, ওর চোখে কোন দোষ হয়েছে নাকি? দোষ হয়ে থাকলে লেখাপড়া ছাড়িয়ে দে। ওতে চোখ আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়। দেখছি ত ইসকুলে পড়া মেয়েদের। ওদের সবার নাকে চশমা।

কাজল কহিল, সে কথা বলিনি ভাই।

সুবালা বলে, তা হবে। আমি মুখ্যু মানুষ, তায় গরিব তোর কথা ঠিক বুঝতে পারিনি।

আগে ঠিক এই অবস্থায় কাজল তার কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিত, অমনি অভিমান হল ? সঙ্গে সঙ্গে সুবালা যেন গলিয়া যাইত। এখন কাজল সেরূপ করে না। সুবালা বেশী অভিমান করে। ভাবে, আমাদের তফাৎ যে এখন ঢের।

একদিন বাড়িওয়ালী কুসুম কাজলকে বলিল, আমার ইচ্ছে আলতাকে লেখাপড়া শেখাই। তোমার কি মত ?

কাজল কহিল, বেশ ত।

ওকে তাহলে পাঠিয়ে দেব ? মীনুর মাষ্টার যখন আসে আমার আলতাও তখন পাশে বসে থালি পড়া শুনবে। ওকে আর আলাদা পড়াতে হবে না।

কাজল কহিল, সে কি সুবিধে হবে দিদি ?

তা হবে না কেন ? দুজন এক সঙ্গেই পড়বে। আলতার বয়েস পনর হতে চলল কিন্তু বিদ্যেয় মীনুর চাইতে থাটো বই উঁচু নয়। তবে তোমার পয়সার মাষ্টার, তুমি যদি আপত্তি কর তাহলে অবিশ্যি আলাদা কথা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজল বলিল, বেশ মাষ্টার এলে আলতাও আসে যেন।

আলতার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হইতে চলিল। এতদিন সে লেখাপড়া কিছুই করে নাই। তার কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো আর তেঁতুল চোষা। মীনার পড়ার ঘরে আসিয়া তার অবস্থা হয় ডাঙার মাছের মতন। নিজেকে সে কিছুতেই থাপ থাওয়াইয়া লইতে পারে না। পড়ার দিকে মনই দেয় না কিছু শোনে কিনা তাহাও সন্দেহ। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার ছেলের সঙ্গে মীনার মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলে। কাজল মীনাকে বলে, আলতা তোর চেয়ে অনেক বড়। তার সঙ্গে পুতুল খেলা কি রে ?

শুনিয়া আলতা বলিল, বেয়ান কি বড় হতে নেই ? তা ছাড়া আমি যে ছেলের মা।

নাতনির বিবাহে কাজল থরচা করিল প্রচুর। নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার ভার ছিল রঘুর ভাগিনেয় পণ্টুর উপর। কিছুদিন হইল সে ছায়াচিত্রের অভিনেতা হইয়াছে। ষ্টুডিও হইতে ফিরিয়া মুখে রং মাথা অবস্থাতেই সে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা শুরু করিয়া দেয়।

কাজল বলে, মুখের রংটা তুলে ফেলুন।

পল্টু হাসিয়া উত্তর করে, ওটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে আণ্ট। এই এক স্টুডিয়োয় আবদালা সাজলাম আর তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার আর এক প্রান্তে গিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম দুর্বাসা হয়ে।

কাজলের নাতনির বিবাহ। কলিকাতার বহু বিখ্যাত লোক শুভকর্মে যোগ দিলেন। পরস্পরের সঙ্গে দরজায় কিংবা সিঁড়িতে দেখা হইয়া গেলে কেহ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ান, কেহ বা রুমালে মুখ ঢাকেন। এদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা সে অবস্থাও কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

পুতুলের বিবাহের দু'তিন দিন পরেই কুসুম আলতাকে বলিল, তোর বেয়ানের কাছে তার মায়ের সামনে একখানা বেনারসি চাইবি।

আলতা কহিল, পুতুলের মতন ছোট বেনারসি পাবে কোথায়?

পুতুলের কেন? তোর জন্যে।

আমাদেরও ত তাহলে দিতে হবে।

বোকা মেয়ে। আমরা হলুম বরের কুটুম। আমরা দিতে যাব কেন? একখানা মিলের শাড়ী তত্ত্ব করি ত সেই খুব।

মেয়েকে দিয়া বেনারসি আদায় করিয়া পাড়ার পাঁচ জনের কাছে কুসুম আবার বড়াই করিতে লাগিল, কাজলের বরাত জোর বলতে হবে। অজ পাড়াগেঁয়ে, দেশ থেকে গাড়ি চেপে শ্যালদায় এসে নামে। সে কিনা কুটুম্বিতে করলে কুম্‌কমের ঘরে।

মীনার সঙ্গে আলতার কুটুম্বিতা হইল বটে কিন্তু তাদের একত্রে পড়া বেশী দিন চলিল না। মাস্টার একদিন কাজলকে বলিলেন, আলতার জন্যে মীনার পড়ার বড় ব্যাঘাত হচ্ছে। ও নিজে ত পড়েই না, তার উপর প্রায়ই গোলমাল করে।

কাজল কথাটা কুসুমকে বলিলে সে তার সামনে মেয়ের মুখে এক চড় মারিয়া বলিল, কখনো মীনার পড়ায় ক্ষেতি করতে যাবি না। বুঝলি? সে হল পড়াশুনোয় ভাল, একদিন পণ্ডিত হবে আর তুই গো-মুখখ্যু।

অন্য ভাড়াটে হইলে কুসুম তখনই মুখে মুখে নোটিশ দিত, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়ি ছেড়ে দাও। কিন্তু কাজলের কথা স্বতন্ত্র। কুসুম প্রায়ই তার কাছে মদ পায়, অগ্রিম ভাড়া পায়। এর উপর আবার মধ্যে মধ্যে টাকা ধার নেয়। কোনদিন বলে, দুটো টাকা হবে ভাই? বাজার আটকে গেছে। কখনও বা রিক্‌শা চড়িয়া আসিয়া বলে, রিস্‌কার ভাড়াটা দিয়ে দাও ত কাজু, হাতে কিছু নেই।

কাজল ঘরভাড়া কখনও ফেলিয়া রাখে না। কর্পোরেশনের ট্যাক্স তার দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিবারই ট্যাক্সের সময় কুসুম তার কাছে হাত পাতে।

প্রমীলা কাজলকে উপদেশ দেয়, এ সব লিখে রাখবি। মোটা টাকা হলেই একখানা এস্টাম্পো করে নিবি। দেখবি আস্তে আস্তে এ বাড়ি তোরই হয়ে যাবে। যে সে কথা নয়, কুমকমের বাড়ির মালিক।

বাড়িভাড়া ছাড়া কুসুমের অন্য কোন আয় নাই। নিজের বয়স হইয়াছে, কোন লোক তার কাছে আসে না। একটি মাত্র বাঁধা বাবু আছে, তার চেয়ে বয়সে ছোট। লোকটির নাম বিপিন, তার সমস্ত খরচাই কুসুমকে যোগাইতে হয়। অন্য লোকের সামনে কুসুম তাকে বাড়িওয়ালা বলিয়া ডাকে। সে এক এক দিন রাত্রে পুরি তরকারি লইয়া আসে। অথব এক ঠোঙা মুড়ি বেগুনি। সেও কুসুম মদের সঙ্গে উহা খায়। খাবারের কিছুটা ভাগ আলতাও পায়।

প্রায়ই বেশী রাত্রে কুসুম আসিয়া কাজলের দরজায় টোকা দেয়। বলে, একটু হবে? গলাটা ভিজিয়ে নিতুম। তোমাদের বাড়িওয়ালার ফিরতে রাত হয়ে গেল। দোকান বন্ধ, তাই নিয়ে আসতে পারে নি।

বাবুদের বোতলের তলায় যাহা অবশিষ্ট থাকে কাজল খুশি মনেই তাহা কুসুমকে দেয়।

এক এক দিন না থাকিলে কুসুম গজর গজর করে, গরিবের ফুটো বরাত। তুমি কি করবে ভাই?

আলতার পড়া বন্ধের পর কয়েকদিন সে আর কাজলের কাছে মদ চাহিল না। টাকা ধারও নয়। পাঁচজনের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, সাধে কি আর বেশ্যাকে লোকে ঘেন্না করে? পরের ভাল আমরা দেখতে পারি না। এই ত আলতা লেখাপড়ায় এগিয়ে যাচ্ছিল, হিংসের চোটে কাজল তার পড়া বন্ধ করে দিল।

লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় আলতা কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। মীনাকে গোপনে বলে, তোর মাস্টারকে বলবি আমি তার উপর খুব খুশি হয়েছি।

আলতা মেয়েটি ভাল, ঝগড়াঝাঁটিতে নাই, কোন্দলপনায় নাই। তার অভাববোধও খুব কম। মিলের শাড়ী সাদা শেমিজ আর দুগাছা কাচের চুড়িতেই খুশি। এদিকে কুসুম মেয়েকে পাঁচজনের চোখে সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। তার ভরসা ঐ মেয়ে, মেয়ের উঠতি যৌবন।

সে যে বাড়িভাড়া পায় তাতে মদের খরচা কুলানই মুশকিল। অথচ মদ ছাড়া তার একদণ্ড চলে না। ভাড়াটেদের সকলের কাছেই সে মদ খাইতে চায়। যারা খাওয়ায় না, খাওয়াইতে পারে না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। এক একদিন মারামারি লাগিয়া যায়।

বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। ছাদ দিয়া জল পড়ে, মাঝে মাঝে আস্তর খসিয়া পড়ে। তার যতটুকু প্রয়োজন কাজল তাহা নিজের পয়সায় সারাইয়া নিয়াছে। অন্য ভাড়াটেরা বাড়ি মেরামতের কথা তুলিলেই কুসুম বলে, না পোষায় ত ঘর ছেড়ে দাও। মুখে মুখে নুটিশ দিচ্ছি।

বাড়িখানা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মায়ের বাড়ি। মা রেশম পাইয়াছে তার মা কুমকমের নিকট। কন্যা পরম্পরায় ক্রমে মালিকানা। কুসুম বলে, আমরা ভুঁইফোড় নই। রেল চেপে আসি নি। কুমকমের নাতনি কুসম বললে চিনবে সবাই।

তাকে কেহ কুসুম বলিয়া ডাকিলে সে তীব্র প্রতিবাদ করে। বলে, 'উ' দিয়ে দরকার নেই বাবা। 'উ'য়ে 'ফু' হয়ে যাব। কুসুম বললে কেউ চিনবেও না।

মায়ের চেয়ে সে বেশী করে দিদিমার গল্প—দিদিমার ছিল জগৎ জোড়া নাম। নাট বেলাটের কাছেও পৌছেছে। হলদির রাজার বাড়িতে ছোট নাট তার গান শুনে এক খানা গিনি পেলা দিয়েছিল।

কেহ যদি বলে, সে গিনি খানা রেখে দিতে পারতিস, কুসুম অমনি উত্তর করে, নাটের দেওয়া গিনিও ছিল কত তাই যত্ন করিনি।

কিন্তু আসল কথা, তার দিদিমা ও মা সেই গিনিখানাকে যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিল। কুসুম মদ খাইয়া তাহা উড়াইয়া দিয়াছে।

কুমকুম ছিল বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা, সুন্দরীও বেশ। সোনাবাগানে আসিয়াই কাজল তার নাম শোনে। প্রমীলা প্রায়ই তার গল্প করিত, মেয়ে মানুষ ছিল কুম্‌কম। ছেরাদ্দে তার কীর্তন শুনে সবাই রুমালে চোখ মুছত।

বিদ্যেসাগরের নাম শুনেছিস, যার কথামালা? তিনি একদিন রাজকেষ্ট মুখুজ্জের বাড়িতে কুমকম দিদিমার কীর্তন শুনে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। সে কী কান্না! আমিও কতবার হেঁচকি তুলেছি।

এই গল্প শুনিয়া পাঁচু একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন ছেরাদ্দে মেয়েরা কীর্তন গাইত বুঝি?

প্রমীলা বলিল, সেই ত ছিল রেওয়াজ। তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছে যে ছেরাদ্দে গুঁপোরা কীর্তন গাইবে?

কিছুদিনের মধ্যে মীনা পড়ায় বেশ উন্নতি করে। মাস্টার খুশি হন। সাধন তার পড়ার ঘরখানাকে মানচিত্র দিয়া সাজাইয়া দেয়। মীনা এখন মানচিত্রে বড় বড় শহর, নদী পাহাড় সব দেখাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা মুখস্থ বলিতে পারে।

সব রকমেই কাজলের সুদিন। তার মেয়ে পড়ায় ভাল। সে নিজে পাড়ার সেরা সুন্দরী, যেমন তার রোজগার তেমনি নাম ডাক। বারোয়ারি পূজার মাস দুই আগে পল্লীবাসিনীরা স্থির করিল, এবার তাকে পূজা কমিটির সেক্রেটারী করিবে।

এই সেক্রেটারীগিরির মান খুব। সেক্রেটারী নির্বাচন করার অর্থ তাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া। এই মানের বিনিময়ে তাকে খরচাও করিতে হয় যথেষ্ট। চাঁদা তোলার পর যাহা ঘাটতি পড়ে সবই সেক্রেটারীকে দিতে হয়। পাড়ার এই রেওয়াজ।

আজ পর পর কয় বছর বিন্দুই সেক্রেটারী হইয়া আসিয়াছে। সে কলিকাতার একজন নাম করা গায়িকা। সিনেমায় পর্দার আড়ালে থাকিয়া এক একখানা গান গাহিয়া দুশ', আড়াইশ' রোজগার করে। রেডিও এবং গ্রামোফোনেও তার ফিস্ সর্বোচ্চ। তার মানের আর এক কারণ সে দেহ বিক্রয় করে না। বাবুদের শুধু গান শুনাইয়া টাকা রোজগার করে।

বিন্দু মেয়েটি গম্ভীর প্রকৃতির। গান বাজনা লইয়াই সব সময় ব্যস্ত থাকে। লোকের সঙ্গে মেশে খুবই কম। কারও কথা লইয়া ঘোঁট পাকায় না। পাড়ার রূপজীবিনীরা তাকে তাই দেমাকে মনে করে। বলে, ও হল স্বর্গের অপ্সরী কেলাস। আমাদের সঙ্গে যে কথা কয় এই ত যথেষ্ট।

কাজলের কাছে সেক্রেটারী হওয়ার প্রথম প্রস্তাব করিল কুসুম।

বিন্দুর সঙ্গে কুসুমের খাতির খুব। তাই এই প্রস্তাবে কাজল বিস্মিত হইল। ভাবিল, ব্যাপার কি?

আসল কথা কিছুদিন আগে কুসুম বিন্দুকে বলে, আমার মেয়েকে একটু গান শিখিয়ে দাও, ভাই। নইলে কুমকমের নাম ডুবে যাবে।

বিন্দু সম্মত হয়।

আলতা টম্যাটোর কাছে দুঃখ করে, মা আমায় নিয়ে পড়েছে। পিটিয়ে

পাটিয়ে একটা কিছু গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু আমার কিছু হবে না। এ পাড়াই আমার ভাল লাগে না।

টম্যাটো বলিল, ও কথা আমার সামনে আর ব'ল না। কুসমদি শুনতে পেলে আমায়ও গাল মন্দ করবে।

মায়ের ভয়ে আলতা কয়েকদিন গান শেখার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু বিন্দু তার সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িল। কুসুমকে বলিল, তোমার মেয়ের কিছু হবে না, কুসুমদি। যেমন গলা খারাপ, তেমনি সুর ধরতে পারে না।

কুসুম বলিল, এঁ্যা! কুমকমের নাতনির মেয়ের গান হবে না? এ একটা কথার মত কথা বটে। কালে কালে কতই শুনব।

সেই হইতে বিন্দুর বিরুদ্ধে সে প্রচার চালাইতেছে। অনেকে বলে, সেক্রেটারী বদলাইবার ধুয়াও প্রথমে সেই তুলিয়াছে। কাজল সেক্রেটারী হইলে তার সুবিধা ঢের। লোকের কাছে জাঁক করিতে পারিবে, সিক্রিট্রি হচ্ছে আমার প্রজা। পূজাসম্ভার কাঙালী ভোজনের চাল ময়দা চিনি সবই উঠিবে তার বাড়িতে।

দীন দালাল কাজলকে বুঝাইল, সেক্রেটারীগিরিতে খরচা আছে বটে। কিন্তু এটা একটা বড় রকমের ইনভেস্টো। এক টাকায় কুড়ি টাকা আসবে।

কাজল এবার নিজেই আসরে নামে। নামে হয়ত এক টাকায় বিশ টাকা আসিবে শুনিয়া। সে নিজেই ভোট সংগ্রহ করে। বিন্দুর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করিয়া দেয়। অথচ বিন্দুর সঙ্গে সদ্ভাব বই কোন দিনই তার অসদ্ভাব ছিল না। কয়দিন আগেও বিন্দু মীনাকে সুন্দর একটি গ্লোব উপহার দিয়াছে।

কয়েকদিন পরে সে কাজলকে এক চিঠি লিখিল—

কাজল, শুনলাম তুমি আমার নামে পাঁচ জায়গায় পাঁচ কথা বলে বেড়াচ্ছ। কোন এক জায়গায় বলেছ, দেবদেবীর কাজে বামুনের মেয়েরই সেক্রেটারী হওয়া উচিত। আমার মতন পতিতার মেয়ের হওয়া উচিত নয়।

তুমি ভুল শুনেছ। আমার জন্ম পতিতার ঘরে নয়, গৃহস্থ পরিবারে। তবে আমার বাবা বামুন ছিলেন না।

আমাদের এই অবস্থায় জাতি নিয়ে গর্ব করার কোন মানে হয় না। কিন্তু তুমি দেখছি এ বিষয়ে প্রিয়বালার শিষ্য হয়ে উঠেছ।

তুমি আমার জন্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিত না করলে এ চিঠিও আমি লিখতুম না। যাক্ তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি সেক্রেটারী হবার ইচ্ছে আমার আদৌ

নেই। যারা আমার জন্য চেষ্টা করছিল তাদেরও আমি ডেকে নিষেধ করে দিয়েছি।

শেষ একটি কথা, আমার বিরুদ্ধে বলায় আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় বেশী দুঃখ পেয়েছি তোমার অবনতি দেখে।

ইতি—বিন্দু।

কাজল চিঠিখানা পড়িয়াই কুচি কুচি করিয়া ফেলে।

পরদিন কুসুম তাকে জিজ্ঞাসা করে, পাড়ায় শুনলাম বিন্দু নাকি সেক্রেটারী হবে না। তোকে চিঠি দিয়েছে। কেন রে, কারণ কিছু লিখেছে?

কাজল বলিল, হ্যাঁ আমার সঙ্গে পারবে না বলে পিছিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম খুশি হইয়া বলিল, যাক্ পাড়ার বনেদিয়ানা আবার কুমকমের বাড়িতেই ফিরে এল। আসবে না? দিদিমা ঠাকুরের অত নাম করত, অত কীর্তন গাইত।

প্রতিবারের মতন এবারও পাড়ার শীতলার বামুন পূজা-কমিটির প্রেসিডেণ্ট হইলেন। কাজল অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশী টাকা তুলিল। তাকে সাহায্য করিল সিনেমা আর্টিষ্ট পণ্টু আর দীন দালাল।

বীমা জগতে বিখ্যাত খগেশ বাবু একশত টাকা দিয়া বলিলেন, এ তোমার কাজ, আরও কিছু বেশী দিতে পারলে খুশি হতুম।

তার মোসাহেব বিরাটকায় একটা লোক হাতের অষ্ট ধাতুর আংটি খুলিয়া দিয়া বলিল, এটার দাম কিছু নয়। কিন্তু মহামূল্য জিনিস। এটা হল আমার পেন্নামি।

খগেশ পরিহাসচ্ছলে প্রশ্ন করিলেন, প্রণামী কাকে? কাজলকে না দেবীকে?

তার বন্ধু বলিল, এ্যাজ সী লাইকস্ ইট, (ওর যা ইচ্ছে)।

কাজল হাসিয়া বলিল, দেবতা আর মানুষ উভয়কেই আপনি ঠকাচ্ছেন কিন্তু।

মোসাহেব বলিল, দেখি পরের বছর দেবী যদি তুষ্ট হন তাহলে জোড়া পাঁঠাই দেব।

কাজল কহিল, বারোয়ারির ঠাকুর তো পাঁঠা খান না।

পূজায় প্রতিবারেই যাত্রা হয়। প্রিয় কাজলকে ধরিল, যাত্রার একটা ধর্মের বই দিস ভাই। যা দেখলে আখেরের কাজ হবে। যাতে রামপ্রসাদী গান থাকে এমন বই।

কাজল বলিল, হনুমানের কোন বই দেব? লঙ্কাদাহন গোছের।

তা দিস। হনুমান হলেন পবননন্দন। রামের অমন ভক্ত।

প্রমীলা কহিল, আমার পছন্দ রসের বই, যাতে ভালবাসা আছে, তাই নিয়ে লড়াই আছে। আর হা হুতোশ।

খুব ঘটা করিয়া পূজা হইল। কাঙালী ভোজনে খিচুড়ি ভাজি ও তরকারির ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে বোঁদে পানতুয়া। কাজল নিজে প্রত্যেক কাঙালীকে একখানি করিয়া আনি দিল আর পানতুয়ার খরচা।

থানা অফিসর ফজলে আলির বন্ধু। থিয়েটারের রাত্রে তিনি বিশেষ পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। পাড়ার বখাটে ছেলেরা অন্য বারের মতন গোলমাল করিতে সাহস করিল না।

কাজল বিশ্রাম করিতেছিল। কয়েকদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিশ্রামের দরকারও ছিল খুব। সন্ধ্যা হইতেই তার মাথা ধরিয়াছিল। থিয়েটার সে দেখে নাই। থিয়েটারের পর অনিলা আসিয়া কহিল, মিশরকুমারী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কাজল বলিল, সে আবার কে?

নাহরিন। তুমি থিয়েটার দেখ নি?

সন্ধ্যে থেকে শরীরটে খারাপ ছিল। যাক—তাকে নিয়ে এস।

অনিলার পিছন পিছন ঢুকিল মিশরকুমারী। সবে নাহরিনের বেশ সে খুলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মুখের পেন্ট ও রং তোলে নাই। মাথার চুল খোলা।

কাজল বলিয়া উঠিল, এঁ্যা, তুমি নাহরিন মালা দি? শুনলাম খুব ভাল প্লে করেছ।

মণিমালা কিছুটা কৃশ হইয়াছে। তবে আগের চেয়ে তাকে সুন্দর দেখায়। সে বলিল, কেন, থিয়েটার দেখিস নি?

না; শরীরটে খারাপ ছিল। তুমি প্লে করবে জানলে এই শরীর নিয়েই যেতুম।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল, মীনু কোথায়?

সে ঘুমুচ্ছে। তাকে ডেকে দি?

না, ঘুম ভাঙিয়ে দরকার নেই।

তার জীবন যে তোমারই দান মালাদি।

ও সব কথা ছেড়ে দে। আমি বরং আর একদিন বেড়িয়ে যাব।

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, শুনলাম, চারু নাকি আত্মহত্যা করেছে ?

হ্যাঁ।

অমন ভাল মানুষ। অত সরল। আর তাকে ঠকিয়ে ভণ্ডুলটা আছে বেশ। নাচের পার্টি নিয়ে সারা দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগনি ভাইঝিদের মাদ্রাজে পেশোয়ারে নাচিয়ে বেশ নাকি টাকাও পিটেছে।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, তার জেল হয়নি ?

শুনলুম ত, হয় নি।

আমার কাছে সে এসেছিল, তার দলে প্লে করতেও বলেছিল, আমি রাজি হই নি।

তুমি আজকাল কি কর ?

কোকেন বেচা ছেড়ে দিয়েছি। দেহও বেচিনা। প্লে করেই চলে যায়। ছোট ছোট সব ক্লাব আছে তাদের শখ মেয়ে নিয়ে প্লে করা। আমি সেই সব ক্লাবে পাঠ করি। আমার নাম আজকাল মিস পারুল বোস—বলিয়া মণিমালা হাসিতে লাগিল।

কাজল বলিল, হাসছ যে ?

হাসি পায় লোকগুলোর বোকামি দেখে। মিস বোস, মিস ব্যানার্জি, মিস গুপ্তা আমাদের এই সব উপাধি দিয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করতে চায়। একজন তরুণ কবি আবার আমায় নিয়ে পদ্য লিখেছে। আমার ঠিক সময় ছেলে হলে তার বয়সী হ'ত।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, রোজগার হয় কেমন ?

এক একটা পাঠে সত্তর আশি টাকা। আমি গড়ে মাসে একখানা করে পাঠ নামাতে পারি।

তোমার চলে তাতে ?

তা চলে যায়। চলা-না-চলা হচ্ছে মনের খেয়াল।

আমি কিন্তু পারি না। এত টাকা আসে কিন্তু কোথায় যে যায় জানি না। অথচ ছেলেবেলা একসঙ্গে পাঁচটা টাকা দেখেছি খুব কম।

মণিমালা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, তুই একটু সামলে চল। তোর সুখ্যেৎ শুনলুম খুব। আবার এও শুনলুম, তুই নাকি ঝোড়ো হাওয়ার মতন ছুটে চলেছিস। কিন্তু অতটা ভাল নয়।

কাজল বলিল, বুঝি সবই কিন্তু উপায় নেই, ভুলে থাকার জন্যই সব করি। মেয়ের পুতুলের বিয়ের ঘটা করা, বারোয়ারি পূজোর সেক্রেটারীগিরি এসব নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম।

মণিমালা বলিল, আমার একটা ঘটনা মনে পড়েছে। একদিন কোন প্লাটফরমে বসে ছিলুম। দেখলাম হু হু করে একটা ইঞ্জিন ছুটে আসছে, তার ড্রাইভার নেই। ইঞ্জিনটা ছুটে গিয়ে পড়ল একটা ঢিবির উপর। সব চুরমার হয়ে গেল। ধোঁয়া আর মাটি, লোহা আর কয়লায় আকাশটা ছেয়ে ফেলল। কেউ ছুটে চলেছে দেখলেই আমার মনে পড়ে সেই ইঞ্জিনের কথা।

এর পর আরও অনেক কথা হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া মনিমালার কাশী ভ্রমণ, লাউরির কথা, রথীনের প্রসঙ্গ।

কাজল বলিল, থাক্ ও সব।

আজকাল রথীনের সম্পর্কে কোন আলোচনাই সে পছন্দ করে না। এমন কি তার তৈলচিত্র থানাও কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক পরে মণিমালা চলিয়া যাওয়ার সময় কাজল তার হাত ধরিয়া বলে, আর একদিন এসো দিদি।

শরীর খারাপ। কেমন যেন অবসাদ ও বিরক্তি সারা দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঘুম আর আসে না। আধ-ঘুম, আধ-জাগরণের মধ্যে কাজলের মনে পড়ে মণিমালার কথা। ভাবিতে ভাবিতে চোখের উপর দেখে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত ইস্পাত আর কয়লার গুঁড়া, আগুন আর মাটি সমস্ত আকাশটাকে যেন কালো করিয়া দিয়াছে।

দীন দালাল বলিয়াছিল, পূজা কমিটির সেক্রেটারিগিরিতে খরচা আছে কিন্তু ওটা বড় রকমের ইন্‌ভেস্টো। এক টাকায় কুড়ি টাকা দেবে।

তার কথাই সত্য হইল। বারোয়ারি পূজার পর কাজলের বাবুর সংখ্যা বাড়িয়া গেল। আগে তার ফি ছিল ঘণ্টায় ত্রিশ টাকা (একান্ন নয়)। এবার ত্রিশের জায়গায় করিল চল্লিশ।

বাবুর পর বাবু আসে। মদ ও পেঁয়াজ রসোনের গন্ধে, বিড়ি সিগ্রেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হইয়া ওঠে। রোজই রাত একটা পর্যন্ত হৈ হুল্লোড় চলে। কোন কোন দিন ভোর হইয়া যায়। আকাশ ফরসা হইলে বাবুদের ঘর-বাড়ি আপিস আদালতের কথা মনে পড়ে।

এদের ধরনই বা কত বিচিত্র। মদ পেটে পড়িলেই কেহ চেঁচায়, কেহ কাঁদে, কেহ বা বেসুরো গায়। একদল রাজনীতি সমাজনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা শুরু করিয়া দেয়। শেষের দলকে কাজলের অসহ্য ঠেকে। আর অসহ্য মনে হয় ডজন খানেক বিড়ালের মালিক ননীগোপালকে।

দীর্ঘকাল পরে প্রথম দিন আসিয়াই সে দুঃখ জানাইল, একটা ভাই ছিল। সেও গেল। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন বোন দুটিরও থাইসিস্ হয়েছে।

কাজলের ভয় হয় এই লোকটির মধ্যেও হয়ত যক্ষ্মার বীজ ঢুকিয়াছে। লম্পটগুলা কত দূষিত ব্যাধি লইয়াই না আসে। জীবাণু ছড়াইয়া দিয়া যায়।

যাওয়ার সময় ননীগোপাল কাজলের হাত ধরিয়া বলিল, জীবনে আমার একমাত্র বন্ধন তুমি। তবে তোমার ফিটা বড় বেশী। হাফ করলে তবু মাসে একবার আসতে পারি।

কাজল কোন উত্তর করে না। ননীগোপাল কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বলে, দেখি টাকাটা আবার কতদিনে জোগাড় হয়।

আগে রঘু কোন উৎপাত করিত না। এখন পেটে মদ একটু বেশী পড়িলেই কাঁদিয়া ফেলে। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ইচ্ছে হয় ওয়াইফটাকে গুলি করে মেরে ফেলি। আর—আর একজনকে।

দীন দালাল জিজ্ঞাসা করিল, আর কাকে ?

একটু ভাবিয়া রঘু বলিল, আর নিজেকে।

কাজলের মনে হয় শেষের এই উক্তি রঘুর মনের কথা নয়। তার উপর কাজলের অনুকম্পা হয়। কিন্তু শুধু কি রঘু ? এ পল্লীতে যারা আসে তাদের প্রত্যেকের জীবনেই হয়ত এইরূপ কোন ব্যথা বেদনা আছে। ভুলিবার জন্য তারা আসে, ঠিক যেন দেওয়ালির পোকার দল—মরিবার জন্যই আগুনে ঝাঁপ দেয়।

এই হৈ হুল্লোড় কাজলের সহ্য হয় না। শরীর দুর্বল বোধ করে। এক এক দিন চোখে অন্ধকার দেখিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। প্রমীলা পরামর্শ দেয়, মাল ধর, কাজু। হুঁস্কি। আমার ঘরে যখন ভিড় আর ধরে না সেই সময় হুঁস্কি ধরলাম। ঘোড়ামার্কা—সাদা ঘোড়া। ওতে তাকত হয়। তাকতের ওষুধে এক হয় হুঁস্কি থাকে আর নয় বেরাণ্ডি। আমায় ডাক্তার বলেছে। সেই মাকুন্দো ডাক্তার।

শুনিয়া কুসুমের হাসি আর ধরে না। সে বলে, পিরমিলের ঘরে ত ইঁদুর

পড়ে মূর্চ্ছো যেত এই জানি। ভিড় আবার হত কবে? ভাগ্যিস বাড়িখানা পেয়েছিল। তাও আমাদের মতন বাড়ির মালিক নয়, নিশি। কে একজন স্তবাদে মাসি হত সে দিয়ে গেছে। (লেসিকে কুসুম বলে নিশি)।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, তবে বুড়ী চালাক নোক। কথাটা বলেছে ভাল। মদ ভারী উপকারী জিনিস। এই ত তোমাদের বাড়িওলার কথাই ধর। সারাদিন খেটে খেটে সন্ধ্যেয় নেতিয়ে পড়ে। এখানে এসে মাল টেনে তবে চাঙ্গা হয়।

কাজলকে পরামর্শ দিয়া কুসুম সেই রাত্রেই তার বাবুকে বলে, এবার নিশ্চিন্তি হওয়া গেল। মদের জন্য আর ভাবতে হবে না।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করে, কি রকম?

কাজল মদ ধরবে। আমি তাকে সেই বুদ্ধি দিয়েছি। লোকও লাগিয়েছি। মেয়েটা বোকা। ও একবার মদ ধরলে আমাদের সব রকমেই স্থবিধে।

বাবুর ভাঙ খাইয়া নেশা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ঘন ঘন মাগনা মদ পাওয়ার সম্ভাবনায়ই তার হৃদয় মন গুঞ্জরিয়া উঠিল। সে গুন গুন করিয়া গান শুরু করিয়া দিল, ঠুনঠুন পেয়ালা—

কুসুম তার গালে ঠোনা দিয়া বলিল, মরণ দশা। মালের কথা শুনেই সুর ভাঁজতে বসে গেলেন।

কাজলের মদ খাওয়ার কথা শুনিয়া রঘু বলিল, তোমার হাতে ফার্ষ্ট পেগ মদ তুলে দেব আমি। বলে রাখছি কিন্তু।

এই ব্যাপারে মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়। পলটু বলে, ও অনারটা আমায় ছেড়ে দাও মামু।

রঘু বলিয়া উঠিল, বোগাস।

দীনদালাল হাসিয়া বলিল, মামা ভাগনে যারই জয় হোক আমাদের লাভ কেউ ঘোচাতে পারবে না। কথায় বলে, মিষ্টান্নম্—। মদের বেলায়ও তা সত্যি।

পলটুর হাতে গেলাসের তলায় একটু মদ পড়িয়াছিল। সে সেটুকু দীনদালালের নাকে মুখে ছড়াইয়া দিল।

দীন বলিল, দেখলে, দেখলে কাজল?

কয়েকদিন পরের কথা। রাত প্রায় একটা। বাবুরা সব চলিয়া গিয়াছে। কাজল গান গাহিয়াছে একটানা তিন ঘণ্টা। বাবুদের মদ ঢালিয়া দিয়াছে।

তার শরীর খারাপ বোধ হইতেছিল, ভারী দুর্বল। চোখ মেলিয়া চাহিতেও কষ্ট হয়। তার মনে পড়ে প্রমীলার কথা, কুসুম ও টম্যাটোর পরামর্শ। সে ভাবে, একবার মদ খাইয়া দেখিলে কিরূপ হয়।

কয়েকদিন আগে রঘু এক বোতল পোর্ট লইয়া আসে। বলে, খেয়ে দেখো। এটা ঠিক মদ নয়। মেয়েরা ডেলিভারির পর এমনিই খায়। খেতেও মিষ্টি।

সেদিন কাজল খায় নাই, আজ একটা গেলাসে আউন্স খানেক ঢালিয়া লয়। টকটকে লাল জিনিস, দেখিতে ভারী সুন্দর। খাইতেও বেশ।

একটু পরেই শরীরটা ভাল বোধ হয়। কাজল আর এক আউন্স খায়। সেদিন রাত্রে ঘুম ভাল হয়। কোন গ্লানি থাকে না।

সেই হইতে বাবুরা চলিয়া গেলে রোজ রাত্রেই সে দুই পেগ করিয়া পোর্ট খায়। একদিন সবে গেলাসে চুমুক দিয়াছে এমন সময় দেখে মীনা লেপের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া তার দিকে চাহিয়া আছে। তার ছোট চোখ দুটি কুতকুত করে। চাহনিতে ফুটিয়া ওঠে ভীতি, কৌতুক ও বিস্ময়।

মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় মীনা লেপের তলায় মুখ লুকায়। কাজল গেলাসটা শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রাখিয়া মেয়ের পাশে যাইয়া শুইয়া পড়ে। তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলায়।

মা ও মেয়ে কেহই কোন কথা বলে না। মীনার ভয় করে। কাজলের করে লজ্জা। দেয়ালের ঘড়িটা টিকটিক করিয়া বাজে। বাহিরে বারান্দায় একটা কবুতর ডাকে, বক্ বকুম।

খানিক পরে মীনা বলে, তোমার মুখে গন্ধ আসছে মা।

কাজল কহিল, ওষুধ খেয়েছি।

মীনা বলিল, ওঃ ওষুধ।

মেয়ের এই "ওঃ ওষুধ" কাজলকে বড় বিচলিত করে।

কয়েকদিন পরে রঘু আসিয়া বলিল, বাঃ বাঃ, বোতলটা শেষ করে ফেলেছ দেখছি। তবু যাক্ আমার মুখ রক্ষে হল। আমার পয়সার মদে তোমার হাতে খড়ি।

কাজল কহিল, ভয় হচ্ছে বিভূতিবাবুর মতন আমিও শেষটায় না পাগল হয়ে যাই।

রঘু হাসিয়া বলিল, বোগাস। তুমি কখনও পাগল হবে না। যারা পাগল হয় তাদের ধাতই আলাদা। তুমি সে ধাতের নও।

কাজলের মনে হয় রঘুর এই উক্তি প্রশংসা নয়, নিন্দা।

রঘু বলে, তুমি বরং ল্যকি হবে! যারা আমার কাছে মদ ধরে তাদেরই বরাত ফিরে যায়। বাদ শুধু আনল্যকি সাধন।

কথাটা লুফিয়া লইয়া দীনদালাল বলিল, তা যা বলেছেন। লোকটা দুর্ভাগাদের রাজা। সাধে কি আর বেজী বলে, সাধন সকালে বাড়িতে এলে দিনটা নষ্ট হয়ে যায়।

কাজল রঘুর দিকে চাহিয়া বলিল, ওঃ বেজী বাবু, আপনার শালা বেজী। যিনি কাবলীওয়ালার সঙ্গে অংশীদারিতে টাকা খাটান?

পলটু হাসিয়া বলিল, কবির সম্বন্ধে কিছু বললেই আণ্ট্ রাগ করে।

রঘু বলে, কাজল হয়ত ভাবে সাধন মস্ত কবি হয়ে ওকে অমর করে যাবে। কিন্তু সে বেলায় ঢুঁ ঢুঁস্।

কাজল বলিল, ও কথা যাক। বিভূতিবাবুর খবর কি বলুন দেখি?

ভূতো? সে ত পটল তুলেছে বাসের তলায়—বলিয়া রঘু হাসে। তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হাসি।

বাসের তলায় চাপা পড়িয়া একটি বন্ধুর মৃত্যু যেন হাতের কাপ হইতে চা ছলকাইয়া পড়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার। রঘুর বলার ভঙ্গীতে কাজল শিহরিয়া ওঠে। তার ঘর্মাক্ত ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকায়।

পলটু বলে, মামা দিন দিন ছোটলোক হয়ে যাচ্ছ। বড় ইনার্টিষ্টিক।

বোগাস—বলিয়া রঘু আবার গেলাসে চুমুক দেয়।

কথা চাপা দেওয়ার জন্যই পলটু বলিল, এবার একখানা রবীন্দ্রনাথ হোক, আণ্ট্।

কাজল বলিল, রবিবাবুর গান আজ আর জমবে না।

দীনদালাল বলে, তা হলে সেই খানা হ'ক।

নীল শাড়ী পরে বউ চলছে
রাঙা বউ চলছে,
(যেন) ঢেউয়ের উপর ডিঙা দুলছে
নীল পাল তোলা ডিঙা দুলছে।

পলটু বলিয়া উঠিল, দীন যেন দিন দিন রসের নাগর হয়ে উঠছে। থ্রি চিয়ার্স ফর ওল্ড্ দীনু।

গান সেদিন জমিল না। আড্ডাও নয়। কাজলের মনে হইতে লাগিল হতভাগ্য বিভূতির আত্মা যেন ঘরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—রঘুদের চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে।

রঘু সেদিন ককটেইলের ব্যবস্থা করিল। জিন রাম্ ও বিয়ারের পাঞ্চ। তিন রকম মদ মিশানো এই ককটেইল খাইয়াও কাজলের নেশা হয় না। মুখখানা শুধু একটু লাল হয়। লালচে গোলাপী।

রঘু বলে, তুমি দেখছি এ লাইনেও কুলীন। অভ্যেসটা বংশগত বুঝি? তোমার বাবাও মদ খেত না কি?

কাজল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, আর যাই করুন, বাপ মার নাম এখানে তুলবেন না। জানেন না ত আমার বাবা কি ছিলেন, কেমন মানুষ—বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া যায়।

মাতাল তিনটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাউয়ি করে। কাজল বাহিরে যাইয়া ছাদের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। উপরে পেঁজা তুলার মতন পাতলা সাদা মেঘের আড়ালে একফালি চাঁদ। ভারী সুন্দর আর ভারী করুণ—সদ্য শোকাতুরা বিধবার মতন। ঐ দিকে চাহিয়াই নিজের অজ্ঞাতে কাজল বলিয়া ওঠে, উঃ বাবা।

একদিন গভীর রাত্রে কাজল চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পায়। এরূপ শব্দ আগেও দু' এক বার শুনিয়াছে, কিন্তু এতটা সুস্পষ্ট নয়। আজ মনে হয় আলতা কাঁদিতেছে। একটু পরে কানে যায় 'খাবি কি হারামজাদি? এর পরে উনুনের ছাই বেড়ে দেব'—কুসুমের কণ্ঠস্বর।

কিছুদিন যাবৎ কুসুম আলতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। প্রায়ই গালি দেয়। তবে এর আগে কাজল আলতাকে কখনও কাঁদিতে শোনে নাই। আজ কাল তিন নম্বরের ভাইপো দোপেঁয়াজী কুসুমের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করে। গুজুর গুজুর করে। কাজলের মনে হয় দোপেঁয়াজীর যাতায়াতের সঙ্গে আলতার এই কান্নার সম্পর্ক আছে।

দুই তিন দিন পরে দোপেঁয়াজী একটি সুশ্রী যুবককে লইয়া আসিল। তার বয়স আনুমানিক ত্রিশ। যুবাটি কুসুমের ঘরে যাইয়া মিনিট পনর ছিল। সে চলিয়া গেলে দোপেঁয়াজী কাজলের ঘরে আসিয়া গল্প ফাঁদিয়া দিল, উনহার নাম কৌশুল চাঁদজী। গুরুজী হোগা, মোহান্ত মহারাজ।

মোহান্ত সম্বন্ধে কাজলের মনে একটা ভীতি ছিল। তার মনে পড়িল বলভদ্রের কথা, মোষচণ্ডীর মোহান্ত বংশ। সে বলিল, ইনি কোথাকার মোহান্ত ?

দোপেঁয়াজী বলিল, আভি হুয়া নেই। লেকিন ইস্কো বাদ হোগা। আংম্বেঠিকা মঠ, উসিকো মোহান্ত ধরমচাঁদজীকা পয়লা নম্বর চিলা।

সে আর যাহা বলিল, তার মর্মার্থ এই যে ধরমচাঁদের এই চিলা বা চেলাটি মেয়েদের প্রথম-যৌবন ভোগের জন্য একেবারে পাগল। এই উদ্দেশ্যে সে সোনাবাগান ধরনের পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। চর লাগাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করে। জলের মত অর্থ ব্যয় করে।

কাজল কহিল, তুমি এসব জানলে কি করে ?

হাম ভি ধরমচাঁদজীকা পাশ মন্তর লিয়া। হামার চচ্চাভি লিয়া। ঔর বিলকুল আমির আদমী। গিরগিটকা রাজা, বহুত ম্যাজেস্তর, বেলেস্তার।

দোপেঁয়াজীর সঙ্গে কৌশলচাঁদ আরও দু'এক দিন যাতায়াত করে। একদিন দোপেঁয়াজী কাজলের ঘরে আসিয়া বলে, কৌশল বহুত রূপেয়া দেনে মাংতা থা। লেকিন আলতা রাজী ভইলো না।

প্রমীলা উপস্থিত ছিল, সে বলিল, তাহলে এর মধ্যে রস আছে বল, ঘন রস।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন রসের কাঙাল হইয়া উঠিতেছে। আজকাল অনেক সময়ই কাজলের ঘরে থাকে। বৈকালে এখানে চা খায়। মধ্যে মধ্যে মদ চাহিয়া নেয়, আর দু এক টাকা ধার। সে জিজ্ঞাসা করে, বেত্তান্তটি কি বল দেখি, পেঁয়াজ।

দোপেঁয়াজী বলিল, হাম পিঁয়াজ নেই, লশুন ভি নেই, দোপেঁয়াজী বুড়া মা।

প্রমীলা বলিল, বুড়ো কিরে, তোর কি চোখও নেই ? এখনও বাবুরা ঘুরে ঘুরে—

দোপেঁয়াজী বলিল, তুমকো উমার ত সত্তর হোগা।

জলন্ত তেলে যেন ফোড়ন পড়ে। প্রমীলা চীৎকার করিয়া ওঠে, হাড় হাবাতে পানওয়ালার নিকুচি করেছে।

দোপেঁয়াজীও মুখ খুলিতেছিল, বুড়ীকা—

কাজল ইশারায় তাকে থামাইয়া দেয়। প্রমীলাকে বলে, তার চেয়ে বরং রসের কথা শোন, পিরজিল দি।

প্রমীলা বলিল, তা বটে। শুধু শুধু ছোট নোকের সঙ্গে—

তার সৌভাগ্যক্রমে শেষের কথাটা দোপেঁয়াজীর কানে যায় না। সে কুশলচাঁদের গল্প জুড়িয়া দেয়।

ছেলেবেলায় কাজলরা যেরূপ দূর্বা হাতে করিয়া ব্রতকথা শুনিত প্রমীলাও সেইরূপ হাঁ করিয়া দোপেঁয়াজীর গল্প শোনে আর মধ্যে মধ্যে নাকে নস্য গুঁজিয়া দেয়।

দোপেঁয়াজী বলে, আলতা রাজী হইতো। লেকিন কুসম সব মিট্টি করিয়ে দিলে।

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, মরণদশা কথার ছিরি দেখনা, মাটিকে বলে মিট্টি।

কাজল জিজ্ঞাসা করল, মাটি করল কি রকম?

দোপেঁয়াজী বলিল, কুসম মাইয়ার গালে চড় মারিয়া বলল, কব্ বিয়া ভৈলো, উ লিয়ে মশগুল আছিস কিরে হতচ্ছাড়ী?

কৌশুঁল কইল, বিয়া? সাদি! তব্ ত মাইয়া উচ্ছিস্ট্ আছে। মোহান্ত হোকে হাম কভি উচ্ছিস্ট্ ভোজন করবে না।

প্রমীলা খুশি হইয়া বলিল, তাহলে কুসমটা খুব জব্দ হয়েছে বল্।

জরুর। কুসম কইলো হমার মাইয়া বেকুফ আছে। লেকীন সত্তী। যব্ বিয়া ভৈলো উস বখত কুঁড়ি থা—বলিয়া দোপেঁয়াজী তিনটি আঙুল দিয়া ফুলের কুঁড়ি বুঝাইবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যায়—কুসম কইলো সোয়ামীকা সাথ দেখা ভি হয়নি।

প্রমীলা প্রশ্ন করে, তোমার কৌশুঁল নিশ্চয় তা বিশ্বাস করেনি? আর করবেই বা কেন? বেশ্যার কথা ত।

দোপেঁয়াজী হাসিয়া বলিল, উ চালাক আছে। আভি কজ্জল বিবিকো মাংছে।

কাজল বলিল, আমায়?

জরুর। তুমি সত্তি নেই উলোক জানতা, মগর বহুত খাপসুরত। কৌশুঁলকা পছন্ হইয়ে গেলো।

কুশলচাঁদ আলতার নাম করিয়া আসিয়াছে। কাজল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে পারে না। ইহা এই পল্লীর রীতি বিরুদ্ধ। তা ছাড়া মোহান্ত শ্রেণীর উপরও তার একটা বিরক্তি ছিল। সে কহিল, তাকে বলে দিও সুবিধে হবে না।

দোপেঁয়াজী এই পল্লীর নিয়ম ভালই জানে। তবু সে আর একবার টোপ ফেলিয়া দেখিল, উ বহুত আমির আদমী। হমার চচ্চাজী দর দস্তুর করিয়ে দেবে।

কাজল কহিল, থাক্ আমিরে আমার দরকার নেই।

দোপেঁয়াজী কাজলের অলক্ষ্যে জিভ বাহির করিয়া ভেংচি কাটে। অন্য সকল বিষয়ের মতন এই বিষয়েও সে তার কাকার অনুকরণ করে। সে চলিয়া গেলে প্রমীলা বলিল, রাজী হলেই পারতিস। তা থেকে বরং কুসমকে দু'টাকা দিলেই তার মুখবন্ধ হ'ত।

কাজল কহিল, ওসব ঝামেলা আমার পছন্দ হয় না।

তা ঠিক। ঝামেলা না করাই ভাল। কুসমের যা মেজাজ।

কাজল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কাজল কারও মেজাজের তোয়াক্কা রাখে না।

তা রাখবি কেন? তুই হলি পাড়ার কস্তর—প্রমীলা কাজলকে কস্তরী বা কৌস্তভমনি কি যে বলিতে চায় বোঝা যায় না। কিন্তু এই তোষামুদিতে কাজল খুশি হয়।

একটু পরে প্রমীলা বলে, শুনলুম, আজকাল কুসম মেয়ের উপর মারধরও শুরু করেছে।

কাজল কহিল, হ্যাঁ, দু'একদিন কান্নাও শুনেছি। কী অন্যায় বল দেখি, শুধু শুধু মারধর।

প্রমীলা বলিল, শুধু শুধু কি রকম? মেয়ে যে রোজগার করতে চায় না।

সেই জন্য মা হয়ে মেয়েকে মারবে?

মারবে না? মা থেকে মেয়ে, মেয়ে থেকে নাতনী সিঁড়ি বেয়ে এ পাড়ায় এই ত চলে আসছে।

ব্যবসা যদি করাবেই তাহলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কেন? বিয়ের পর মেয়ে ত রাজী হবেই না।

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, এ রাস্তার বিয়ে! ও ত পুতুল খেলা। আমার হয়েছিল, কুসমের হয়েছিল। অনেকেরই হয়, কণ্ঠী বদল, মালাবদল ক'রে।

তোমারও বিয়ে হয়েছিল?

কেন, আমি কি ফেলনা নাকি? আমার বিয়েতে কালিয়া পোলাউ অবধি হয়েছিল। আর নাউ চিংড়ী। তবে বর জানত এ বিয়ে ঘরকন্নার জন্য নয়।

কাজল কোন কথা বলে না। তার কানে শুধু বাজে, বিয়ে! ওত পুতুল খেলা।

প্রমীলা বলিল, মা বুড়ো হ'লে মেয়ে রোজগার করে খাওয়াবে এইত সোনা-বাগানের কানুন। কুসমের উপরও অত্যাচার কম হয়নি। ওকেও সোয়ামী বাতিকে পেয়েছিল। রেশম কাঠ পেটা করে ভূত ছাড়ালে।

কাজল কহিল, মেয়েটার বয়েস যে মোটে চোদ্দ, পিরমিলদি।

এই ত দাঁওয়ের সময়।

কয়েকদিন পরে কুসুম কাজলকে ধরিল, আলতাকে তুমি একটু মানুষ করে দাও, মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম।

কুসুম কি বলিতে চায় তাহা বুঝিলেও কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে?

ওকে বল রোজগার করতে। কুম্কমের নাতির মেয়ে একটা হা-ভাতের জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকবে এ কেমন কথা বল দেখি?

আপনি বলেন নি?

আমি বলে বলে ত হয়রান হয়ে গেছি।

আপনার কথা না রাখলে আমার কথাই বা শুনবে কেন?

তা শুনবে। তোমার এখন পড়তা ভাল। মোটা রোজগার। রোজগেরে লোকের কথা সবাই শোনে। দেবতারা শোনে। সাহেবরা শোনে।

কাজল কহিল, সোয়ামীকে ভালবেসে যদি এ পথে আসতে না চায় ত আপনিই বা জিদ করছেন কেন?

কুসুম বলিল, ওঃ এইবার বুঝলাম কত ধানে কত চাল। তোমার ক্ষেতি হবে বলে ভয় করছে বুঝি? মেয়েটা যুবো কিনা।

আলতার সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শুনিয়া কাজলের হাসি পায়। পরক্ষণেই মনে হয়, এ পথে যৌবনই চড়া দামে বিকায়। তার সেই যৌবন ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। শুধু আলতা কেন, এরপর বহু প্রতিদ্বন্দ্বীই আসিবে। তাদের কাছে একদিন পরাজয় স্বীকার করিতে হইবেই।

কুসুমের কয়েকটি টাকা ধার করার দরকার ছিল। কাজল অসন্তুষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সে বলিল, কিছু মনে ক'র না ভাই। তুমি হলে রূপের চুড়ো। অনেক অনেক যৌবনই তোমার কাছে হার মানবে।

কাজল কহিল, না দিদি, তুমি ঠিকই বলেছ।

কাজল লখিয়াকে দিয়া সাধনকে খবর পাঠাইয়াছিল। দু'তিন দিন পরে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাজল কহিল, এ কী, আপনার চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। আগের চেয়ে ঢের কালো।

সাধন বলিল, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরিবরা কালো হয়ে যায়। ওটা অভাবেরে পুরস্কার। যাক্, তুমি আমায় খবর দিয়েছ কেন বল দেখি?

দরকার আছে। আপনি অনেক দিন এদিকে আসেন নি। কেমন আছেন?

সাধন বলিল, যেমন থাকি। সামলে আর উঠতে পারলুম না।

এক একজন থাকে যার এই রকমই চলে। একটানা দুর্ভোগ। মামা মাসী মাসভুত বোন ভগ্নীপতি এদের লইয়াই সাধনের সংসার। এই সংসারের ঝামেলা সে আর কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। মাতুলটি লম্পট। সম্প্রতি বিবাহ করিয়া সাধনের এই বোঝা সে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। সাধন এ সম্পর্কে সাধারণতঃ কোন উচ্চবাচ্য করে না। অভিযোগ ত নয়ই। আজ বলিল, কিছুদিন হল মামাও বিয়ে করেছে।

কাজল বলিল, এ খবর আমি জানতুম।

উৎপল বলেছে বুঝি? মামার বিয়ের দিন হঠাৎ সে এসে হাজির হয়েছিল।

উৎপল সাধনের সঙ্গে কলেজে পড়িত। বর্তমানে কিষেণগঞ্জে ওকালতি করে। সাধন কাজলের সঙ্গে তার আলাপ করাইয়া দেয়। সেই হইতে কলিকাতায় আসিলেই সে কাজলের গান শুনিয়া যায়। তার ঘরে বসিয়া মদ খায়। আগে সাধনও সঙ্গে থাকিত। কাজল বলিল, কই আপনি ত তাঁর সঙ্গেও আর এলেন না?

সাধন বলিল, সুবিধে হয়ে ওঠে নি।

উৎপলকে সে যে আর বরদাস্ত করিতে পারে না একথা চাপিয়া গেল। একটু পরে কহিল, শুনলাম তুমি মদ ধরেছ?

উৎপলবাবু বলেছে বুঝি?

শুধু সে নয়। তোমাদের প্রমীলাও বলেছে।

তাকে পেলেন কোথায়?

আজ যখন আসছিলুম তখন সে পানের দোকানের সামনে গুলতানি

করছিল। আমায় দেখে ডাকল, এই যে কবরেজ ভাই। একবার আমাদের ওখানে চল।

কাজল কহিল, কবরেজ ভাই মানে?

তোমরা কবি বল, প্রমীলা তার সঙ্গে রাজা জুড়ে দিয়েছে—বলিয়া সাধন হাসে।

আপনি গেলেন তার ঘরে?

না গিয়ে উপায় ছিল না। সে ভারী নাছোড়বান্দা।

সে আর কি বললে?

তোমাদের বারোয়ারি পূজোর গল্প, তাই নিয়ে বিন্দুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া থেকে শুরু করে এ পাড়ায় কে হতুর্কি আছে তার খরগোসের চার চারটে বাচ্চা হওয়ার খবর অবধি বাদ দেয়নি কিছুই।

কাজলের মুখখানা হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, এঁ্যা, হতুর্কির খরগোসের বাচ্চা হয়েছে বুঝি? দেখে আসতে হবে ত।

এইরূপে খুঁটিনাটিতে আনন্দ, তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা পতিতাদের এই স্বভাব সাধন বহুবারই লক্ষ্য করিয়াছে। তাই কাজলের এই উচ্ছ্বাসে সে মোটেই বিস্মিত হইল না। বলিল, আমি ভাবছি তোমার মদ ধরার কথা। আমায় তুমিই মদ ছাড়ালে, অথচ নিজের বেলায়—

কাজল বলিল, আপনার বেলায় মদ ছাড়ার দরকার ছিল।

আর তোমার?

শরীর রক্ষের জন্য মদ ধরেছি। আমি আর পারছিলুম না।

অসহায়ের মতন কাজলের এই কাতর স্বীকারোক্তি সাধনকে পীড়া দেয়। নিজেকেও তার কেমন যেন অসহায় মনে হয়, অসহায় আর অপরাধী।

বাহিরে রোদে ভরা উজ্জ্বল আকাশ। একটু দূরে এক বাড়ির ছাদের কার্নিশের উপর গঙ্গাজলের পাইপ দেখা যায়। দুইটা নলের জোড়ার কাছে কলের মুখে একটা পিপাসার্ত কাক বসিয়া। কাকটি কলের গোড়ায় বার বার ঠোকর দেয়, জলের জন্য কী চেষ্টাই না করে! সাধনের মনে পড়ে অদৃষ্টের দরজায় হতভাগ্য মানুষের কপাল ঠোকার কথা।

খানিকক্ষণ পরে কাজল বলিল, আপনাকে ডেকেছি মীনার জন্য। আমার ইচ্ছে তাকে কোন বোর্ডিং-এ বা আশ্রমে রাখি।

তোমায় ছেড়ে সে থাকতে পারবে?

পারবে ত বলেছে, পারতে তাকে হবেই। তা ছাড়া উপায় নেই—কাজলের কণ্ঠে অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রকাশ পায়। সাধন উহার কারণ বুঝিতে পারে না। একটু থামিয়া কাজল আবার আপনা হইতেই বলে, ভয় হয় পাছে বুড়ো বয়সে মীনার উপর আমি অত্যেচার করি। এক মুঠো ভাতের জন্যে···।

সাধন প্রমীলার কাছে আলতার উপর কুসুমের অত্যাচারের কাহিনীও শুনিয়াছিল। সে কহিল, সবাই ত তোমার বাড়িউলির মতন নয়।

পিরমিলদির কাছে শুনেছেন বুঝি? কিন্তু তা ছাড়াও কারণ আছে—বলিয়া কাজল লেপের তলায় মীনার মুখ লুকাইবার গল্প করিল। বলিল, সেও আজ ক'মাস হয়ে গেল। মীনাকে এ বাড়ি থেকে সরাতে চাওয়ার কারণ শুধু কুসুম নয়—আমিও। আমি, এই পাড়া। আপনি একটা জায়গা দেখুন।

সাধন বলিল, হ্যাঁ, দেখব।

রথীনের মতন সাধনেরও কাজল সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা ছিল। তাকে ঘিরিয়া সে নানা কল্পনা করিত। তাকে ভাল করিয়া তুলিবে, নিজের আদর্শের অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবে কল্পনাগুলি এই ধরনের। গরিব বলিয়া সেই কল্পনাকে সে রূপ দিতে পারে নাই। গরিব বলিয়াই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

সেই কাজলের এ কী পরিবর্তন! প্রমীলা বলিয়াছে কাজু সব বিষয়েই ফাষ্টো। বুকটা কত দরাজ। তাছাড়া কী মদই না খেতে পারে। জলে মাছের মতন মদের টামলায় সাঁতার কাটে। (প্রমীলা টাম্বলারকে বলে টামলা)। মদ ধরেছে ত সবে ক'মাস। এর মধ্যেই কুসমকে হার মানিয়েছে।

বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়া নিচের ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে সাধন ভাবিতেছিল, আগের কাজলের কথা, বিড়ি সিগ্রেটের ধোঁয়ায় যার কষ্ট হইত, পেঁয়াজ রসোনের গন্ধে যে মুখ ফিরাইয়া নিত, সেই কাজল।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছেন?

ভাবছিলুম বিধিলিপির কথা। ট্রাম কিংবা ট্রেনের মতনই বাঁধা লাইনের উপর দিয়ে ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না।

কাজল কহিল, হ্যাঁ, কথাটা ভারী সত্যি।

সাধন সেদিন ছিল অনেকক্ষণ, কাজলের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হইল। সে আজকাল কি ধরনের বই পড়ে, সিনেমায় কোন্ জাতীয় ছবি তার ভাল লাগে এই সব।

বটতলার বই-এর বদলে নূতন সব রোমাঞ্চ সিরিজ চালু হইয়াছে। কাজলের

বই-এর আলমারির অর্ধেকটা সেই সব বইয়ে বোঝাই। সাধন বই-এর আলমারির দিকে তাকাইতেই কাজল বলিল, বাবুরা এই সব বইই উপহার দেয়। মাঝে মাঝে আবার জিজ্ঞেস করে, আমার বইখানা আছে ত? কারও দেওয়া বই হারিয়ে গেলে সে পেঁচার মতন মুখ ভার করে বলে, বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস না। বাসলে আমার উপহার হারিয়ে ফেলতে না।

কাজল উপসংহার করে এই বলিয়া—আগে ভাবতাম নেকামি মেয়েদের একচেটে এখন দেখছি পুরুষরাও ওতে কম যায় না।

মীনা পল্টুর সঙ্গে ষ্টুডিয়োতে ছবি তোলা দেখিতে গিয়াছিল। চা খাইয়া সাধন চলিয়া যাইতেছে এই সময় সে ফিরিয়া আসিল। তার পরনে সাটিনের সালোয়ার, মাথার চুল সবুজ সিল্কের ফিতা দিয়া বাঁধা, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল। বছর খানেকের মধ্যে সে বেশ একটু লম্বা হইয়াছে। লম্বা আর রোগা। চোখ দুটি বড় বড়। তার মুখে কাজলের মুখের একটু আদল আছে। একটুক্ষণ সাধনের দিকে চাহিয়া 'আঙ্কু' বলিয়া সে তার কাছে যাইয়া দাঁড়ায়।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, পল্টুবাবু কোথায়?

মীনা বলিল, তিনি আমায় দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন।

সাধন বলিল, কি দেখলে ষ্টুডিওর?

পল্টুবাবুর নাচ। ভারী সুন্দর। তিনি এমনি করে নাচেন—বলিয়া মীনা নাচিতে আরম্ভ করে। ডান হাত শূন্যে বাড়াইয়া দিয়া বলে, একটা মেয়ের কোমর ধরে নাচলো।

কাজল কহিল, থাক তোমায় আর নাচতে হবে না।

নাচ দেখাইতে না পারিয়া মীনা বেশ একটু হতাশ হয়। সাধন জিজ্ঞাসা করে, আর কি দেখলে?

দেখলুম ওকে, এন. জি. কাট—ডিরেক্টর ছবি তোলার সময় ক্যামেরাম্যান ও সাউণ্ড রেকর্ডারকে যেরূপ নির্দেশ দেন মীনাও কথাগুলি সেইরূপ গম্ভীরভাবে বলে।

সাধন ও কাজল হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। কাজল বলে, এবার যাও, বাবলি মাসীর কাছে গিয়ে পোশাক ছেড়ে এস।

মীনা মুখ কালো করিয়া ছাদে যাইয়া ঝিকে ডাকিল, বাবলি মাসী।

সাধন একটা চাপা বেদনা লইয়া ফিরিয়া যায়। খানিকটা পথ যাইয়া তার মনে পড়ে কবিতার বইখানা দেওয়া হয় নাই। উহা পকেটে রহিয়া গিয়াছে।

সত্যিই আমি মেয়েটাকে ভালবেসে ফেললুম নাকি—বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলে। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে তাকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাবিবে লোকটা পাগল।

কিছুদিন হইল তার প্রথম বই 'বিত্তাঞ্জলি' বাহির হইয়াছে। এই বই তাকে বেশ খ্যাতি ও মর্যাদা দিয়াছে। সুধী সমাজ বলিয়াছেন, বিত্তাঞ্জলি বাংলা সাহিত্যের একটা সম্পদ।

ভালবাসার কথা মনে পড়িলেই সাধনের হাসি পায়। সে ভাবে ওটা ধনীর এবং অকেজোর বিলাস।

হাসে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বইখানা কাজলকে দিতে ভুলিয়া যাওয়ার জন্য নিজের উপর তার রাগ হয়।

কয়েকদিন পরের কথা। কাজল এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিতে বাজিল রাত আটটা। সদর দরজায়ই টম্যাটো বলিল, তোমার ঘর যে লোকে ভরে গেছে দিদি।

কাজল বলিল, লোকের জ্বালায় পাগল হতে হবে দেখছি।

টম্যাটো বলিল, পাগল করা লোক এরা নয়। তোমার সব কুটুম সাক্ষেৎ।

কাজল ঘরের সামনে যাইয়া প্রথমেই তার বৌদিকে দেখে। গণেশের বৌ আগে কৃশ ছিল। এই কয় বছরে বেশ মোটা হইয়াছে। গিন্নী ধরনের চেহারা, সামনের দিকে পা ছড়াইয়া সে কোলের শিশুকে স্তন্য দিতেছিল। তার পাশেই গণেশ, পথশ্রান্ত ধূলি সমাচ্ছন্ন মূর্তি। সে এক দৃষ্টে স্ত্রীর মাতৃরূপ দেখিতেছে।

ঘরে আর দুইটি শিশু, কয়েকটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে একজন শুধু কাজলের পরিচিত—তার দাদার শাশুড়ী। গাল ভাঙিয়া যাওয়ায় তার দাঁতগুলি আগের চেয়ে অনেক বড় দেখায়। কপালের উপর কতগুলি কাঁচা পাকা চুল। পাকার সংখ্যাই শতকরা সত্তরটি।

একটি তরুণী দেয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কুশলগ্ন কিশোরীর ছবির দিকে চাহিয়া আছে। মেয়েটি সুন্দরী, বাড়ন্ত কচিগাছের মতন তার সর্ব অঙ্গ দিয়া সুষমা যেন উপচাইয়া পড়ে।

পাশেই গণেশের স্ত্রীর কোল ঘেঁষিয়া মীনা বসিয়া আছে। সে বাটি

হইতে তুলিয়া চিঁড়ার মতন কি যেন খায়। মাকে দেখিয়া বলে, মা মামাবাবু এসেছে। মামাবাবু, মাসীমা, দিদিমা।

দিদিমা শুনিয়া কাজল এদিক ওদিক তাকায়। তার চোখ দু'টি শারদাকে খোঁজে। মীনা গণেশের শাশুড়ী তারকভাবিনীকে দেখাইয়া বলে, এই যে দিদিমা। দিদিমা নাড়ু দিয়েছে, মাসীমা দিয়েছে পাটালি, চিঁড়ে। নারকোলের চিঁড়ে—বলিয়া মীনা খিল খিল করিয়া হাসে।

তোরা হলি শহুরে বড়লোক, নারকোলের চিঁড়ে শুনে হাসবিই ত—তারক-ভাবিনী তার পরই কাজলের দিকে চাহিয়া বলেন, দেখেই তোমায় চিনেছি। অমন রূপ, রূপ না যেন লাখো-ফুল-ফোটা কেষ্টচুড়ো গাছ। ঐ যে ছবি দেখছে ও হল ছ্যানা। আবাগী পেটে এল আর আমারও হাতের নোয়া খসল। ভাইয়েরা জোচ্ছনা বলে ডাকে। অমন কট্‌মটে নাম, আমি তাই ছ্যানা ক'রে নিয়েছি।

জোছনার শৈশবে কাজল তাকে দেখিয়াছে। তার জন্মের পর তারক ভাবিনী বিধবা হন। এই জন্য মেয়েকে তিনি অত্যন্ত লাঞ্ছনা দিতেন কাজল ইহাও জানে। হয়ত এখনও দেন তাই জোছনার চেহারায় কেমন যেন বিষাদের ছাপ।

তারকভাবিনী মেয়েকে বলিলেন, এ হচ্ছে ফুলির ননদ। তোর গনুদার মায়ের পেটের বোন।

শৈশবে গণেশের স্ত্রীর প্রায়ই গাল গলা ফুলিত বলিয়া তারকভাবিনী মেয়েকে ফুলি বলিয়া ডাকিতেন।

জোছনা কাজলের দিকে আগাইয়া যায়। তার মা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েকে ইঙ্গিত করেন, ওকে পেন্নাম করিস না যেন। এই ইঙ্গিতে তার মুখখানা আরও বিকৃত দেখায়।

জ্যোৎস্না নিজে সুন্দরী, তার চেয়ে বড় এক সুন্দরীর কাছে, পরিণততর যৌবনের কাছে সে মাথা নিচু করে।

ইস্—বলিয়া তার মা কাপড়ের খুঁটে গেরো দেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সবাই। কাজল ভ্রাতাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, আমায় খামকা অপমান করাবার জন্যই তুমি এদের নিয়ে এসেছ না কি?

গণেশ কোন জবাব দেয় না। কাজল আবার বলে, এসেছ কেন বল দেখি?

গণেশ এবার উত্তর করে, সামনে মস্ত বড় যোগ, অধোদয়। এতে গঙ্গাস্নান করলে পূর্বপুরুষরা মুক্ত হয়ে যান। তোর বৌদি সেই পুণ্যের লোভ সংবরণ করতে পারলে না।

তাই তাকে নিয়ে পুণ্যি করতে এলে আমার বাড়িতে? বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সঙ্গে যারা এসেছেন ওরা কারা?

একজন রবি মজুমদারের বৌ, আর একজন পার্বতী দারোগার এপক্ষের শাশুড়ী।

মহা মহাপুণ্যাত্মারা গঙ্গা নাইতে এসেছেন দেখছি—কাজলের গলাটা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। গণেশ বলিল, আস্তে বল্, নইলে শ্বশুর বাড়িতে আমার মান থাকবে না।

কাজল কহিল, যারা আমায় দেশছাড়া করেছে তোমার শাশুড়ী তাদের একজন। সেকথাও ভুলে গেছ?

দেশছাড়ার কারণ শুধু তারকভাবিনী নন, গণেশের স্ত্রীও। কাজল সে কথা আর তুলিল না।

গণেশ বলিল, যাক গতস্য শোচনা নাস্তি, ওসব ক্ষমা কর।

কাজল বলিল, কালই তোমরা একটা জায়গা দেখে নাও।

গণেশ বলে, গরিব মানুষ। কোথাই বা দেখব? কোন রকমে দুটো দিন তুই চালিয়ে নে।

কাজল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গণেশ ইনাইয়া বিনাইয়া বলে, তুই হচ্ছিস ভাই-এর মতন ছোট বোন। তোর বৌদিও তোকে গোরার চাইতে কম দেখে না।

কাজল বলিল, গোরা, মা, ওরা আছেন কেমন?

মা আছেন এক রকম, বুড়োরা যে রকম থাকে। তাঁকেও আসতে বলেছিলুম। তিনি রাজী হলেন না।

ভালই করেছেন। তিনি এলে আমি গলায় দড়ি দিতুম। গোরার খবর কি? সে নাকি জেলে গিছল?

হ্যাঁ। এখন পুলিস তাকে বাড়িতে অন্তরীণ করেছে। হপ্তায় তিন দিন থানায় হাজিরা দিতে হয়। তবে সরকার থেকে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে দেয় তাই রক্ষে। সংসারের নিয়মিত আয় বলতে ত শুধু ঐ কটি টাকা।

অন্ধকারের মধ্যে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কাজল তার নির্লজ্জতার পরিমাপ করিতে পারে না।

গণেশ ঘরে যাইয়া শাশুড়ীকে বলে, ছাদেই আপনার রান্নার যোগাড় করি তা হলে ?

তারকভাবিনী বলিলেন, তা কর বাবা।

গণেশ বলিল, রাত হয়ে গেল। আজ আর আমিষের দরকার নেই। আমরা সবাই আপনার পেরসাদ পাব'খন। মায়ের প্রসাদ হিঃ হিঃ।

যা কর ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে ক'র কিন্তু। বুড়ো বয়সে গঙ্গা নাইতে এসে শুচিশুদ্ধ আচারে থাকতে চাই !

মজুমদারের স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, যদি ভুলচুক হয়ে যায় এই জন্যে আগে থেকে কাপড়ে আরও কয়েকটা গেরো দিয়ে রাখুন। গেরো গুণে গঙ্গায় ডুব দেবেন।

তা বটে। কিন্তু গেরোও যে হয়ে গেল অনেক। গায়ে মেলেচ্ছের থুতু লাগায় একটা, পাঁউরুটি ছুঁয়ে দেওয়ায় একটা, বনগাঁ ইষ্টিশানে চা খাওয়ার জন্যে একটা—

সেদিন তোলা উনানে তাদের রান্না হইল। কাজল বলিয়াছিল স্টোভে রাঁধিতে। তারকভাবিনীর তাতে আপত্তি। তিনি কহিলেন, ঐ ফোঁস উনুনের রান্না খেয়ে জাত খোয়াতে চাইনে বাবা। ওতে বিপদও ঢের। কিরণের শালী ফোঁস উনুন ফেটে আগুনে পুড়ে মারা গেল।

এর পর কয়দিনের ইতিহাস একপক্ষে নির্লজ্জতা অপর পক্ষে লাঞ্ছনার ধারাবাহিক কাহিনী। ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া করিয়াও সমাজ সংসার কাজলকে রেহাই দিল না। অতিথিরা তার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাদের রান্না হয় ছাদে, রাত্রে সবাই থাকে দোতলায় মীনার পড়ার ঘরে। তার পড়া বন্ধ, কাজলের রোজগারও বন্ধ হইবার উপক্রম। এদিকে অতিথিরা এমন ভাব দেখান যেন এই বাড়িতে উঠিয়া তার উপর তারা যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন।

পুণ্যতিথিতে স্নানের পর সবাই মিলিয়া কাজলের পয়সায় হাওড়ার পুল, পরেশনাথের মন্দির, চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর দেখিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইল দীন দালাল। তারকভাবিনী বলিলেন, তোমারও আখেরের কাজ হচ্ছে, কাজল। বিশুদ্ধ বামুনের আশীর্বাদ কুড়ুচ্ছো।

এই কয়দিনেই প্রমীলার সঙ্গে তার বেশ ভাব হইয়া গেল। প্রমীলা তাকে ডাকে, তরুদি। তিনি প্রমীলাকে সম্বোধন করেন, ভাই পিরমিল বলিয়া।

পরনিন্দায় বিশেষতঃ মেয়েদের কুৎসাকীর্তনে এই সদ্ভাবের সূত্রপাত।

তারকভাবিনী তাদের গ্রামের মেয়েদের বহু গল্প করেন। সত্য মিথ্যায় জড়ানো যত সব প্রেমের কাহিনী। বলেন, ঐ যে দেখছ মজুমদার-বৌ ও একটি বিচ্ছু। ছিল আমার এক ননদ। কি বলব ঘরের কথা! উপর মুখো থুতু ফেললে নিজের মুখেই পড়ে। ননদ মিনসেদের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা কইত না। তারপর এই যে কাজলিকে দেখছ ওত যুবো দেখলেই সুর ভাঁজতে বসত।

প্রমীলা মন্তব্য করিল, নইলে এ রাস্তায় এসেছে?

সে একদিন তারক ভাবিনীকে জল খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। খাওয়ায় মিষ্টি আর সিদ্ধির সরবৎ। নেশা চড়িলে তারক নিজের যৌবনের এক কাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, কাউকে ব'ল না যেন।

প্রমীলা বলে, সে পিরমিল আমি নই। আমার এই বুক হ'ল হাজারো লোকের গোপন কথার সিন্ধুক।

তারকভাবিনী বলেন, সেই বিশ্বেসেই ত বলা। বিশ্বেস আর ভালবাসা।

প্রমীলা জিজ্ঞাসা করে, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে সোনাবাগানে এসে উঠেছ। দেশে এই নিয়ে গোলমাল বাধবে না?

বাধলেই হ'ল? দেশে গিয়ে বলব কালীঘাটে আদি গঙ্গার গর্ভে ছিলেম। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ির ওরাই হ'ল একঘরে করার মালিক। চুড়োমণির বাড়ি। সবাই ভয় করে।

প্রমীলার কৃপায় তারকভাবিনীর এই গোপন কথা দুদিনের মধ্যেই সোনাবাগানের সবাই জানিয়া গেল। সে এক একজনকে বলে আর সাবধান করিয়া দেয়, আর কাউকে ব'ল না যেন। তোমায় ভালবাসি তাই বললুম।

এ বাড়িতে উঠিয়া অবধি গণেশ ও তার স্ত্রী উভয়েই পাল্লা দিয়া কাজলের কাছে অভাব অভিযোগ জানাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের ঘরখানা পড় পড়। একখানামাত্র ঘর—পড়িলে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই থাকিবে না। বাসন বলিতে পিতলের একটা চুমকি পর্যন্ত নাই। কাজল বলে, যজমেনে বামুনের ঘরে বাসন নাই কেন?

গণেশ উত্তর করে, ক্রিয়া কর্মে যা দু'একখানা পাই তাই বেচেই ত সংসার চালাতে হয়। তা'ছাড়া কাজ কর্মই বা কোথায়? ধর্মে কর্মে কি আর

লোকের মতি আছে? বছর অন্তর একবার বাপমায়ের শ্রাদ্ধ, তাই করতে চায় না।

তার স্ত্রী বলিল, তাই ত জমি জমা ভিটে সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখন পরের প্রজা হয়ে আছি।

কাজল বলিয়া উঠিল, প্রজা! তা হলে আমার টাকাগুলো—

গণেশ বলিল, প্রজা বটে তবে মৌরুসী মোকররী।

তার স্ত্রী স্বামীকে ধমকে দেয়, তুমি চুপ কর দেখি।

কাজলের মুখের ভাব দেখিয়াই ব্যাপারটা সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তারপর তাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাঁচু যখন এসেছিল তুমি টাকাটা তাকে দিয়েছিলে বুঝি?

কাজল কহিল, হ্যাঁ।

সে কিন্তু চেপে গেছে।

কাজল বলিল, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল।

কাজলের বৌদি বলিল, পাঁচু বরং দেশে ফিরে গিয়ে রটিয়েছে যে কাজলের বাড়ি গিয়ে জুতো চশমা সব হারিয়ে এলুম।

কাজল গম্ভীর হইয়া যায়। তার বৌদি একটুক্ষণ ননদের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, টাকা যদি দিতে পার তাহলে তোমার ভাইয়ের কাছে আর দিও না। ও খরচা করে ফেলবে! গাঁয়ের থিয়েটারের রাজা সাজার লোভে সেদিনও দুটো সিন কিনে দিয়েছে।

রাজা হওয়ার শখ হ'ল আবার কবে থেকে?

নাচ বন্ধ হওয়ার পর থেকে। বয়স হয়েছে নাচতে ত আর পারে না। এসব কথা ওকে ব'লো না যেন। টাকার ব্যবস্থা যদি করতে পার তাহলে ননদ ভাজেই—

কাজল বলিল, তোমরা আমায় মাফ ক'র। ওসব আমার ভালো লাগে না।

না লাগা আর বৈচিত্তির কি? মানুষের মন ত।

স্নানযোগের পর সপ্তাহখানেক পরে তারকভাবিনী কহিলেন, আমি আর মজুমদারের বৌ গনুকে নিয়ে কাশী গয়া করে আসি। এরা তোমার এখানে কদিন থাক্।

অতিথিদের আরও দীর্ঘ দিন থাকার প্রস্তাবে কাজল ভয় পাইয়া যায়।

বলে, আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন। আমি আর পেরে উঠছি না। তার কথায় যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পায়।

তারকভাবিনী বলেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমরাও ত ফেলনা নই। গরিব কুটুম সাক্ষেৎ, তুমি বড় লোক তাই তোমার বাড়িতে এসে উঠেছি।

কাজল বলে, পুণ্যি করতে এসে বেশ্যাপাড়ায় ওঠাই আপনাদের উচিত হয় নি।

তারকভাবিনী অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, ওঃ বাবা!

তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে কাজল তার মুখের উপর এইরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারিবে। তিনি একটু পরেই বড় মেয়েকে বলিলেন, দেখ্‌, ফুলি, একেই বলে সঙ্গ দোষ। তোর ননদটা ছিল কেমন ভালমানুষ, আর আজকাল কী ছোটলোকই না হয়ে গেছে। মুখে কিছু আটকায় না।

জোছনা বলিল, যাক তবু একবার কাজলদির সুখ্যেত্‌ করলে।

বৃদ্ধা বলিলেন, কেন রে আবাগী, আমি কি খালি নোকের নিন্দেই করি না কি?

সেই দিনই বৈকালে বাড়িতে পুলিসের আবির্ভাব হয়। পুলিসের সঙ্গে কাজলের খাতির খুব। কেহ তার সঙ্গে মদ খায়, কেহ তাকে লইয়া বেড়াইতে যায়। তার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে সবাই। এই হ্যাণ্ডসেককে কুসুম বলে হাতঝাঁকানি।

পুলিসকে কাজলের ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুসুমও পিছন পিছন আসিয়া দরজায় দাঁড়ায়। একটা অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি?

প্রশ্নের ভঙ্গীতে কুসুম থতমত খাইয়া যায়। বলে, আমি, আমি হনু বাড়িউলী কুসম। কুমকমের নাতনি।

বাড়িউলী? ব'স, ব'স। তোমাকে দিয়ে দরকার আছে। এই জুম্মন, ইস্কো দেখো।

গালপাট্টাওয়ালা একটি কনস্টেবল তার দিকে একটু আগাইয়া আসিলে, 'ওঃ বাবা' বলিয়া কুসুম কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। তার আর বাক্‌স্ফূর্তি হয় না।

কাজল কাঁটা দিয়া সোয়েটার বুনিতেছিল। কাঁটা হাতেই আগাইয়া আসিয়া অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই আপনাদের?

অফিসার বলেন, তোমার নাম কাজল ?

হ্যাঁ।

তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

ওয়ারেণ্ট !

হ্যাঁ। তুমি ছ্যানা নামে একটি মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছ।

কাজল যেন আকাশ হইতে পড়ে। বলে, ব্যবসা চালাচ্ছি! জ্যোছনাকে দিয়ে ?—বলে বটে কিন্তু তার মুখ সাদা হইয়া যায়। অফিসার বলেন, অভিনয়ের চেষ্টা করে কোন সুবিধে হবে না। গণেশ নামে এক ছোকরা জ্যোৎস্নাকে পাড়াগাঁ থেকে এনে তাকে দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে। তুমিও তার রোজগার খাচ্ছ। ঠিক নয় ? কি, জবাব দিচ্ছ না যে ?

কাজল ভয়ে ভয়ে বলে, গণেশ আমার দাদা, জ্যোৎস্না তার শালী।

অফিসার বলেন, শুনলাম তার মাও এসেছে। এ একটা বীগ কন্সপিরেসি দেখছি। ছোট মেয়ে এ বাড়িতে আর কটি আছে ?

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া অফিসার গর্জিয়া ওঠেন। বলেন, আউট্, আউট্ উইথ্ ইট্।

কাজল বলে, আছে। আছে আমার মীনা।

তোমার মেয়ে ?

কাজল মাথা নাড়াইয়া জানায়, হ্যাঁ।

আর কেউ ?

কুসুম বলিয়া উঠিল, না বাবা আর কেউ নেই।

ঠিক ত ? মিথ্যে ধরা পড়লে তোমারও বিপদ হবে কিন্তু।

সৌভাগ্যক্রমে আলতা বাড়ি ছিল না। পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কুসুম কহিল, আর কেউ নেই। আমি মা কালীর দিব্যি করে বলতে পারি।

বেশ, সার্চ করে দেখা যাক্।

সব ঘরেই খানাতল্লাস হয়। তারকভাবিনীরা মীনার ঘরে ছিলেন। পুলিসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারক মালা জপিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার বলিয়া ওঠেন, হ্রীং ফট্। তার গলা দিয়া শব্দ যেন বাহির হয় না।

জোছনা ছিল ঘুমাইয়া। দরজায় পুলিসের জুতার শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে হাঁ করিয়া অফিসারের দিকে তাকাইয়া থাকে। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার নাম ?

জোছনা।

তোমায় ছ্যানা বলে ডাকে ?

জ্যোৎস্না মাথা নাড়াইয়া জানায়, হ্যাঁ।

এ রাস্তায় তুমি কতদিন ?

কুড়ি বাইশ দিন হ'ল মায়ের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এসেছি।

সবাই দেখছি এক সুরে বাঁধা। তোমার বয়স ?

সতের বছর।

বাবুরা এলে তুমি কত করে নেও ?

জোছনা এবার কাঁদিয়া ফেলে। তারক ভাবিনী অফিসারের দিকে চাহিয়া বলেন, আপনি এ কি বলছেন ? আমার মেয়ে ত পেশাকর নয়। আমরা এসেছি গঙ্গা নাইতে।

অফিসার রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ। ছ্যানা তোমার মেয়ে। আর এটি ?

তারকভাবিনী বলিলেন গনু, আমার জামাই।

গণেশের স্ত্রীকে দেখাইয়া অফিসার কহিলেন, আর এটি ?

এবার উত্তর করিল গণেশ—উনি আমার পরিবার।

মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করানোই তা'হলে তোমার পেশা ?

তারকভাবিনী বলিলেন, নাঃ বাবা। ও ত কলকাতায় আসেই না। ওর এখন পেশা দাঁড়িয়েছে যাত্রার দলে রাজা সাজা। সেদিনও চিতসির বোসেদের বাড়িতে হরিশচন্দর হয়েছিল।

রবি মজুমদারের বউ এবং পার্বতীর শাশুড়ীও এদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে শুনিয়া অফিসার বলিলেন, দল বেঁধে পুণ্যি করতে এসেছ দেখছি। এবার থানায় গিয়েও কিছু পুণ্যি করতে হবে।

গণেশ বলে, এ্যাঁ, থানায়! আমায় থানায় যেতে হবে ?

হ্যাঁ, তোমাদের সবাইকে।

তারকভাবিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদেরও ?

তোমার মেয়ের বয়স কত ?

বয়স যে কত বলিলেন, কত বলা উচিত তারক ভাবিনী তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাকে নীরব দেখিয়া অফিসার বলেন, হঠাৎ থেমে গেলে যে ?

তারক বলেন, কারও বয়স আমি মনে রাখতে পারি না, ঐটে কেমন আমার দোষ।

বেশ, থানায় গিয়ে মনে পড়বে 'খন।

আমায়ও থানায় যেতে হবে ?

নিশ্চয়।

তারকভাবিনী এবার রবি মজুমদারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, বলতে পার ঝড়ে মধুমতীতে জাহাজডুবি হয়েছিল যেন কবে ?

মজুমদার গিন্নী বলিলেন, সে ঐ বছর সতরই হবে। তারক ভাবিনী বলিল, আমার ছ্যানা হয় সেই বছর।

অফিসার হাসিয়া বলেন, তবু এতক্ষণে মনে পড়ল। যাক্ তোমরা তৈরি হয়ে নাও। তুমি, ছ্যানা আর গণেশ। (তারপর কাজলের দিকে চাহিয়া) তোমায়ও যেতে হবে কাজল, তোমাকে তোমার মেয়েকে। সে কোথায় ? তাকে ডাক।

কাজল বলে, আমার ঐ একরত্তি মেয়েকেও নিয়ে যাবেন ?

ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে যাতে ব্যবসা করাতে না পার সেই জন্যে।

তড়িতাহতের মত কাজলের সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়া উঠে। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলে, না, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ওকে দিয়ে কোনদিনই ব্যবসা করাব না।

অফিসার একটু মুচকি হাসেন, ভারী শীতল হাসি। সেই হাসিতে কাজলের বুকখানা যেন হিম হইয়া যায়। সে আর কোন কথা বলে না। অফিসার একটি কনস্টেবলকে ট্যাক্সি আনিতে হুকুম করেন।

ঘরময় কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। প্রথমে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, তারক ভাবিনী। তার দেখাদেখি আর সবাই। বাদ শুধু গণেশের স্ত্রী আর তার কোলের মেয়েটি। মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিতেছিল। তারকভাবিনী রাগিয়া বলিলেন, মুখপোড়া আবাগীর এই হ'ল হাসির সময়।

গণেশের স্ত্রী মাকে বলিল, অত ভয় পাচ্ছ কেন ? পুলিস ত আর পাগলা কুকুর নয় যে কামড়ে দেবে।

অফিসার ও তার সহকারী পরস্পর মুখ চাওয়া চাউয়ি করেন।

ট্যাক্সি আসিলে দেখা যায় তারক ভাবিনী অনুপস্থিত। অফিসার বলেন, জুম্মন আসামী তারক ভাবিনীকো বোলাও।

তারক ভাবিনী বাথরুমে গিয়াছিলেন। জুম্মন চীৎকার আরম্ভ করিল, আসামী তারক বিবি। আসামী তারক।

মরণ দশা। মুখপোড়ারা আমায়ও বিবি বানিয়েছে—বলিতে বলিতে তারক ভাবিনী বাহির হইয়া আসেন।

পুলিস কাজলদের যখন ধরিয়া লইয়া যায় গলি-শুদ্ধ মেয়েরা তখন তাদের দিকে চাহিয়াছিল। কেহ জানলা দিয়া মুখ বাড়ায়, কেহ বা ছাদের আলিসার আড়ালে থাকিয়া ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া দেখে। অনুমান চলে নানারকম। কেহ বলে, ও নিশ্চয়ই কোকেন বেচত নইলে অত টাকা আসে কোত্থেকে? অনেকেই ইহা সমর্থন করে, কেহ প্রকাশ্যে কেহ বা মৌন থাকিয়া।

একদল প্রমীলাকে ধরিল, ব্যাপারখানা কি বল দেখি। তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমার সঙ্গে অত ভাব।

প্রমীলা বলিল, কি করে বলব কার পেটে কি আছে। আমি কুকিন বেচায় নয়, মদ চোলাইতেও নেই। একটু নস্যি, তাও কিনে টানি।

কুকিন বা কোকেনের অংশ বাদ দিয়া রসবতী পাড়ায় মদ চোলাইয়ের কথা রটাইয়া দেয়। যাকে পায় তাকেই বলে, জান ভাই কাজল মদের ভাঁটি খুলেছিল?

কেহ যদি প্রশ্ন করে, খুলেছে কোথায় আর তুমিই বা জানলে কি করে—রসবতী অমনি জবাব দেয়, ও সিঁথির এক বাগানে মদ চোলাই করে। মস্ত দল। শুনলুম পিরমিলদির কাছে। সে ত আর মিথ্যে বলবে না। দুজনে অত ঢলাঢলি।

কথাটা সুবালা ছাড়া প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিল। তার কাছে রসবতী বলিয়াছিল আরও বেশ ফলাও করিয়া—জানিস কাজলের গ্যাস বেলুন এবার ফটাস?

সুবালা বলে, কি রকম?

তাকে পুলিসে ধরেছে কেন জানিস?

শুনেছি ত ওর বৌদির বোন এসেছিল, ধরেছে সেই জন্য।

মিথ্যে কথা। সিঁথির এক বাগানে ও মদ চোলাই করত।

সুবালা বলিল, আমি বিশ্বাস করি না।

তুই ত করবিই না। কাজলির গায়ের গন্ধও তোর ভাল লাগে। পিরিত বটে। মেয়েতে মেয়েতে গা শোঁকাশুকি।

পুলিসের গাড়ীতে ওঠার সময় কাজল লখিয়াকে বলিয়া যায়, সাধনবাবু আর পল্টুবাবুকে খবর দিস।

লখিয়া সাধনের বাড়িটা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে পল্টুকে খবর দিল।

রঘু ছিল কোর্টে। পল্টু যাইয়া তাকে ধরিল, আণ্টের জামিনের একটা ব্যবস্থা কর মামু।

খবরটা রঘু জানিত। সে 'বোগাস' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চুরুট টানিতে লাগিল।

পরের দিন কাজলদের খালাস করিয়া আনে তিন নম্বর। খোঁড়া মানুষ, তার উপর বয়স হইয়াছে। সে দোপেঁয়াজীকে লইয়া উকিল বাড়ি যায়। যথেষ্ট খরচা করে। কাজল জামিনে বাহির হইয়া আসিলে প্রশ্ন করে, তুমি ভাল মানুষ আছ, তুমার ই-খেতি কে করল? কোন্ বাঁদিকা বাচ্চা?

এ সম্পর্কে কাজলের মনে সন্দেহ ছিল না এরূপ নয় কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। শুধু কহিল, তুমি ছিলে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারলুম। আর দেখলুম এবার বাবুদের ব্যাভার।

তিন নম্বর বলিল, উসব বড় আদমীকো বাত ছোড় দেও। ফুর্তি লুঠবে, লেকিন উবগার করনেকো বখত উনকো সরম লাগে।

তোমায় খবর দিলে কে?

মামু। পণ্টু মামু।

রঘু ভাগিনেয়কে মামু বলিয়া ডাকে, এই পাড়ায় সেই নামটাই চলিয়া গিয়াছে।

তিন নম্বর আরও বলিল, লেকিন দীন্ বাবুভি বহুত তগলিভ করেছে।

কথাটা কাজলের মনঃপূত হয় না। তার মনে পড়ে রথীনের অসুখের সময়ে দীনুর ব্যবহার। খবর জানাইবে বলিয়া সে পাঁচটা টাকা নিয়া যায়। পরের দিন আসিয়া দেয় মিথ্যা খবর। কাজল বলে, ওকে নিষেধ করে দিও।

তিম নম্বর তার মনের ভাব বুঝিয়া বলে, গরিব আদমী দো-চার পৈসা ত লিবেই। লেকিন উস্কো দেকে কামভি ভালা হোচ্ছে।

কাজল নিরুপায়ের মতন বলে, বেশ যা ভাল বোঝ কর। তোমার এ দেনা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

হামভি মুফত্ কিয়া নেই। তুমার বহুত খাইয়েছি। ঔরভি বহুত মিলবে।—বলিয়া তিন নম্বর দেনার কথাটা একেবারে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়।

একদিন এই মানুষটির উপজীবিকা ছিল নারীর দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ। লোকে তাকে কী ঘৃণাই না ক'রত! কাজলও করিত। আজ তার চরিত্রের এই দিক কাজলকে অবাক করিয়া দিল।

মামলার দ্বিতীয় তারিখে হাকিম মীনা ভিন্ন আর সবাইকে মুক্তি দেন। তারক ভাবিনীর উপর হুকুম হয় জ্যোৎস্নাকে লইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। সব শেষে কাজলকে বলেন, তোমার মেয়ে আর তোমার সঙ্গে থাকতে পাবে না। থাকবে কোন আশ্রমে। নর্থের ডেপুটি কমিশনার তার ব্যবস্থা করবেন।

কাজল হাকিমের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলে, হুজুর, আমার মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতে পাবে না? ঐ একরত্তি মেয়ে!

হাকিম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, বেশ্যার সে অধিকার থাকে না। মানুষের স্বাভাবিক কোন অধিকারই নয়—বলিয়া লাঞ্চের জন্য উঠিয়া যান।

কাজল ডকেই দাঁড়াইয়া থাকে। তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। মীনা ছিল তার পাশে, একেবারে কাছ ঘেঁষিয়া। মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোর্ট-শুদ্ধ লোকের চোখ তখন তাদের উপর ন্যস্ত। দু'এক জনের হয়ত সহানুভূতিও হইয়াছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই উপভোগ করিতে লাগিল। একজন ত বলিয়াই উঠিল, শখ করে আবার ছেলে পেটে ধরেছেন। তখন মনে ছিল না?

সঙ্গে সঙ্গেই উঠিল একটা হাসির লহর। কাজল চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে বক্তা একটি তরুণ পুলিস অফিসার। তার মুখে পাঁচুর আদল—মনে হয় যেন তারই একটা ছোট সংস্করণ। কাজল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া নেয়।

মুক্তির আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারক ভাবিনী মন মরা হইয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিয়া তিনি মুখ খুলিয়া দিলেন, বেটাদের মরণ হয় না, পুলিস আর হাকিমদের? ওদের কচি কাচ্চার মাথায় বিছেয় কামড়ায় না? আর পরকেই বা দুষব কি? যত নষ্টের গোড়া হ'ল ফুলি। কী মেয়েই না পেটে ধরেছিলুম!

গণেশের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, না ধরলেই পারতে। আমি কি বলেছিলুম, পেটে ধর গো, আমায় পেটে ধর।—কথাটা সে বলিল সুর করিয়া।

তারক ভাবিনী কহিলেন, কী রক্তহারাম মেয়ে বাবা! মায়ের পেটের দেনা অবধি ঝেড়ে ফেলছে।

গণেশের স্ত্রী বলিল, শুধু শুধু গাল দিও না, আমার ননদের খাচ্ছ, তার পয়সায় পুণ্যি করছ, আর দুষছও আমায়!

তারক ভাবিনী বলেন—ওরে আমার ননদ গরবী রে, তুই তো এখানে উঠ্‌তে বললি।

মিথ্যে বললে তোমার মুখে পোকা পড়বে না? আগে আমি বলিনি। তুমিই বললে, তোর ননদের অঢেল রোজগার, চ' তার ওখানে উঠি, পুণ্যির খরচা লাগবে না, বরং কাপড়টা আসটা নিয়েই ফিরতে পারবো।

বড় মেয়ের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বৃদ্ধা এবার জোছনাকে লইয়া পড়িলেন—আমার শত্তুর ঐ ছ্যানাটা। ও যখন পেটে তখন করবীর বীচি খেলুম, তাতে কিছু হ'ল না। শুধু ওয়াক্ তুলে মরি আর কি?

কাজলের বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল। জ্যোছনার চোখ ছলছল করিতে দেখিয়া সে বলিল, আপনি চুপ করুন দেখি।

তারক ভাবিনী তখনও বোধ হয় কিছু আদায়ের আশা করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, বেশ, তুমি যখন বলছ মা তখন চুপ করলুম।

পরের দিন রাত্রের গাড়ীতে তিনি সকলকে লইয়া দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

পুলিস মেয়েটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। এ যে কত বড় দুর্দৈব কাজল তাহা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ছেলের হাতের খাবারের ঠোঙা চিলে ছোঁ মারিয়া নিলে সে যেমন হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে—কাজলও ঠিক তেমনি হতবাক্ হইয়া যায়। অথচ অল্প কিছু দিন আগে সে নিজেই সাধনের কাছে প্রস্তাব করিয়াছে মীনুর জন্য অন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করুন। ওকে এখানে রাখতে চাই না, এই আবহাওয়ার মধ্যে।

তখন বোঝে নাই যে মেয়েকে ছাড়িয়া থাকিতে এতখানি কষ্ট হইবে। বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইল বলিয়াই হয়ত বেদনাটা এত বেশী করিয়া বাজিল।

মীনার স্মৃতি তার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রতিটি পদক্ষেপে মনে পড়ে তার কথা, ছোট্ট জীবনের নানা খুঁটিনাটি। তার হাসি আবদার, তার ভালবাসা। তিন চার বছর বয়স পর্যন্ত শেষ রাত্রে সে কাজলের ঘুম

ভাঙাইত—"মা তুমি কই, কই মা" বলিয়া। ভান করিত যেন মকে দেখিতে পায় নাই।

মদ খাওয়া লইয়া কী লজ্জাই না দিল! দুষ্ট মেয়ে একবার শুধু বলিল, ওঃ ওষুধ। তারপরই লেপের তলায় মুখ লুকাইল। আজ সেই সব স্মৃতি কাজলের চোখের উপর জ্বল জ্বল করে।

মেয়েটা তাকে বড্ড ভাল বাসিত, তার চেয়ে ঢের বেশী। আর সে তার কাছে মিথ্যা বলিত, তাকে ঠকাইত! মিথ্যাচার দিন দিন যেন তার সঙ্গী হইয়া উঠিতেছে। বারবনিতা জীবনের অবশ্যম্ভাবী এই অভিশাপ। আজকের দুঃখ ত তারই শাস্তি।

এক একবার ভয়ও হয়, মীনা হয়ত সময় মত খাইতে পায় না, হয়ত ওরা মারধর করে। কখনও বা ভাবে, নাটাগড় নারী সদনের কর্তাটি যদি পুরাণসিন্ধুর মতন হয়, তাহা হইলে উপায়? এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া মন উদ্বেল হইয়া ওঠে। যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে; মেয়েদের আশ্রমের নিয়ম কানুন কিছু জান ভাই?

কুসুম বলে, কি করে জানব? দিদিমা কুমকমের আমলে নাট বেলাটের ভয়ে লাল পাগড়ি এ বাড়ি মুখো ঘেঁষত না। আজ তোর দশা দেখে আমারও ভয় হচ্ছে, আলতাকে ওরা ছিনিয়ে না নেয়।

তা ঠিক। আচ্ছা, পার কাউকে দিয়ে খোঁজ নেওয়াতে? ওকে পাঠিয়েছে নাটাগড়ে। উর্মিলা নারীসদনে।

বলব খ'ন তোমাদের বাড়িওলাকে। মানুষটার ক্ষ্যামতা ছিল ঢের, তবে মাতাল। পেটে মদ ভাঙ পড়লে জ্ঞান গম্যি কিছু থাকে না।

কাজলকে নিরাশ করিল সবাই। একমাত্র প্রমীলা কহিল, জানি বৈ কি। মেয়ে আশ্রমে যত্ন হয় খুব। আমার ঘরে হলদে পাগড়ি পরা এক বাবু আসত, হংসরাজ। তার আশ্রম ছিল। মেয়েদের সে দেখত নিজের সন্তানের মত। তোকে বলিনি বুঝি?

না বলনি ত।

ওঃ। তা বলিই বা কত? সারা কলকেতার ঐতিহাস ত।

ওরা লেখাপড়া শেখাত?

তা বলতে পারব না, আমি কখনও শুধোই নি। তবে হংস ছিল বিদ্যের জালা। মেয়েদের সে কি আর পড়ায় নি?

কাজল কহিল, যাই বল দিদি, পুলিসের বুদ্ধির তারিফ করতে হবে। মায়ের কোল থেকে মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে তার ভাল করতে চায়।

প্রমীলা কহিল, ওরা সব মুরুখ্যু। গো মুরুখ্যুর দল।

আমার ঘরে এত উকিল ব্যারিষ্টার আসে, এত হাকিম। তারা একবারটি বলল না যে এমন আইন আছে।

প্রমীলা নাকে নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, মুরুখ্যু ওরা সবাই সমান।

কাজলের কখনও বা রথীনকে মনে পড়ে। দুঃখ আসিলেই সে তার কথা ভাবে। দুঃখের সঙ্গে তার স্মৃতি যেন জড়াইয়া আছে মুশকিল আসানের মত।

কয়েকদিন পরে দীন দালাল আসিলে সে বলিল, আপনি এত উকিল মোক্তার চড়িয়ে খান। কই আপনিও ত আইনটার কথা একবার বললেন না?

দীন কহিল, আইন আছে জানতুম। অথচ এদিকে দেখছি বেশ্যারা ঘরে ঘরে মেয়ে পুষছে, তাই বলি নি। বিশেষ করে পুলিসের সঙ্গে তোমার অত ভাব। ভেবেছিলুম ওরা তোমার কোন ক্ষেতি করবে না।

কাজল কহিল, সবই আমার অদৃষ্ট।

শেষে শুনলাম, এও পুলিসেরই কাণ্ড। তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে লাউরি।

লাউরি!—বলিয়া কাজল শুধু একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করে। সেও এইরূপ অনুমানই করিয়াছিল। তরুর বাড়িতে মনিমালার ঘরে তার সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রে মধ্যে মধ্যে সে কাজলের ঘরে আসিত, নিখরচায় আড্ডা দিত, মদ খাইত। কয়েকদিন আগে জোছনাকে দেখিয়া সে বলে, খাসা মেয়েটি ত, যেমন কচি তেমনি রসাল। ওকে পাওয়া যায় না?

কাজল বলে, চুপ, চুপ। ও হল দাদার শালী। মায়ের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এসেছে।

তোমার দাদার শালী? তা হলে ত আমারও মধুর সম্পর্ক।

সর্বনাশ। শুনলে ওর মা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে আসবে।

লাউরি সেদিন আর কিছু বলে না। তারপর ঐ উদ্দেশ্যে কয়েকদিন ঘন ঘন যাতায়াত করে। কাজল একদিন তাকে রুক্ষ কণ্ঠেই বলে, ও মতলব নিয়ে আর আসবেন না। আপনি ভদ্দর লোক, তার উপর বয়স হয়েছে, এখন এ সব ছেড়ে দিন।

লাউরি কাজলকে শাসাইয়া যায়, আচ্ছা, এর ফল তোমাকেও ভুগতে হবে কিন্তু।

কাজল দীনকে কহিল, অথচ এই লাউরি বাবুই ছ মাস আগে নাতির অন্নপ্রাশনের নাম করে এক ছড়া মফ্‌. চেন নিয়ে গেছে। আজ অবধি ফেরৎ দেয় নি।

দীন বলিল, এ অভ্যেস ওদের অনেকের আছে! সেদিন কাগজে দেখলুম কোথাকার এক জাঁদরেল পুলিসের ঐ জন্য চাকরি গেছে।

কাজল কহিল, গয়না সামান্য ব্যাপার। কিন্তু মানুষ যে মানুষের এত বড় অনিষ্ট করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

দীন বলিল, মানুষ না পারে এমন কাজ নেই।

একটু পরে কাজল কহিল, দয়া করে সাধনবাবুকে খবর দেবেন। তিনি যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

সাধন ত জেলে।

জেলে! কেন?

কি এক স্বদেশী কবিতা লিখেছিল সেই জন্যে। এখন শুনচি চাটগাঁয় বোমারুদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বুদ্ধি শুদ্ধি ত কোন দিনই—

ফজলে আলি একদিন বলিয়াছিল টেররিষ্ট সন্দেহে পুলিস সাধনের বাড়ি খানাতল্লাশি করিয়াছে। তখন রঘুর দল নাক সিটকায় আর কাজলের হয় শ্রদ্ধা। সে কহিল, বুদ্ধি শুদ্ধি ব'লে থামলেন যে?

দীন বলিল, পাছে তুমি রাগ কর। তবে মানুষটার গুণও ছিল ঢের। আজ কাল শুনছি কবি বলেও নাম কিনেছে।

হ্যাঁ, শুনেছি আমিও। পল্টু বাবু বলেছেন। যাক্ আপনি একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন নাটাগড় নারী সদন জায়গাটা কেমন, ওখানকার কর্তারাই বা কিরূপ।

হ্যাঁ দেখব—বলিয়া দীন দালাল বিদায় নেয়। কয়েকদিন পরে আসিয়া খবর দেয়, নারী সদনে মেয়েদের যত্ন ত হয়ই না বরং কর্তৃপক্ষ তাদের দিয়া ব্যবসা করায়।

কাজল বলে, তার মানে?

সিন্ধী পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দেয়।

কাজল বালবিধবা, চিরকালের অসহায়া। আশ্রয়ের অভাবে শেষ পর্যন্ত এই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহের কথা শুনিয়া সে বলিল, তা হলে মেয়েদের উপকার করে বলুন?

উপকার!—বলিয়া দীন হাসে, বিদ্রূপের হাসি। সেই হাসিতে কাজলের অশ্রু পর্যন্ত শুকাইয়া যায়। চোখের উপর সে যেন দেখিতে পায় একদল শয়তান নারীদেহের কারবার খুলিয়াছে। তরুণীর রক্ত-মাংস তাদের কাছে পণ্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃদ্ধ বেশ্যার চেয়েও হীন, কশাইয়ের চেয়েও নির্মম এই মানুষগুলির সম্পর্কে তার গলা দিয়া একটা শব্দ পর্যন্ত বাহির হয় না। তার জিভ গলা সব যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভাল একটা অবলা আশ্রমের খবর পাওয়া গেল, রসা শিবপুরের চিরঞ্জীব হোম। খবর আনিল পল্টু। সে বলিল, হোমটা আমাদের বি. ডি. আর. ষ্টুডিওর কাছেই। অনেকে সুখ্যাতি করে। সেক্রেটারী নরেন চৌধুরী শুনেছি লোক ভাল।

নারীসদন হইতে মীনাকে স্থানান্তরিত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম চাই। কাজল ভাল উকিল দিয়া চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দরখাস্ত দেয়। তিনি আবেদন নামঞ্জুর করেন। তবে কাজলকে দুই মাসে একবার করিয়া মেয়ের সহিত দেখা করার হুকুম দেন। আগের হাকিমের আদেশ ছিল বৎসরে মাত্র তিনবার দেখা করিতে পারিবে।

আবেদন নিবেদনে কাটে প্রায় দুই মাস। এর কয়েকদিন পরে ইণ্টারভিউর তারিখে কাজল নাটাগড় নারীসদনে যায়।

মস্ত বড় বাগান। একদিন বোধ হয় ধনীর বিলাস ভবন ছিল। আজ কেমন যেন শ্রীহীন। ঢুকিয়াই বাঁয়ে দারোয়ানের ঘর। তবে একটা দিক্ কাত হইয়া পড়িয়াছে, দেয়ালে আস্তর নাই, গজ কুড়ি পরে আর একটা ঘরের অবস্থা আরও শোচনীয়।

ফটক হইতে সরু একটা পথ উত্তর মুখো গিয়াছে। তার দু'পাশে বুনো গাছ ও আগাছার জঙ্গল। একটু যাইয়া বাঁয়ে পানাপুকুর। পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পানা সরাইয়া বাঁশ ও কাঠ দিয়া ঘাট বাঁধা হইয়াছে। সেখানে কয়েকটি মেয়ে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ধোপার পাটে কাপড় কাচে। নানাবয়সের মেয়ে, লম্বা ও বেঁটে, মোটা ও রোগা যেন একদল বন্দিনী। পরনে মলিন বসন। তারা চোখ তুলিয়া গাড়ীর দিকে তাকায়। কাজলের বুক ছাঁৎ করিয়া ওঠে। মনে পড়ে আলিপুর পশুশালার কথা, সেখানকার একদল বন্দী পশু যেন দর্শকের দিকে চাহিয়া আছে।

পুকুরের উত্তরে একটু দূরে ব্যারাকের মত লম্বা বাড়ি। একতলা। মাঝখানে সিঁড়ির সামনে আপিস। দরজার পাশে কালো বোর্ডে লেখা,

ঊর্মিলা নারী সদন, নাটাগড়। আর এক পাশে সেক্রেটারী ও সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের নাম। দুধারের ঘরগুলির কোনটার জানালায় বা কাপড় শেমিজ ঝুলিতেছে, রোয়াকে লেপ তোশক শুকাইতেছে।

সিঁড়ির পাশে গাড়ী থামিবামাত্র বাচ্চা-কোলে একটা বানরী আসিয়া হাত পাতে। কাজল পাদানির উপরের চাঙারি হইতে একটা কেক দেয়। বানরী সঙ্গে সঙ্গেই উহা মুখে পোরে। খাবার না পাইয়া বাচ্চাটা প্রথমে মাকে ভেংচি কাটে তার পর কাজলকে।

কাজল অফিসের সামনে যাইয়া ডাকে, কে আছেন?

অফিস ঘর হইতে লম্বা চওড়া একটি মহিলা বাহির হইয়া আসেন। বয়স পঞ্চাশের উপর, নাকের উপরের দিকটা অত্যন্ত চাপা, নাই বলিলেই চলে। মুখের চামড়া জায়গায় জায়গায় ঢিলা, সমস্ত অঙ্গই শিথিল। বেশের পারিপাট্য ও ক্রিম পাউডারের জেল্লায় মহিলাকে ক্লাউনের মত দেখায়। পিছনে শীর্ণ খর্বকায় একটি পুরুষ, মাথার মাঝখানটা চৌকো করিয়া কামানো, তার উপর সাদা মলম চকচক করে।

মহিলা কহিলেন, নমস্কার। আপনিই মীনার মা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি পঙ্কজদেবী, এ মহকুমার পঙ্ক দি, বিশেষ করে কংগ্রেসী মহলে। আর ইনি শ্রী বর্ধন। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি। ঊর্মিলা ছিল আমার মেয়ে, তার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠান।

এই সময় মীনা বাগান হইতে 'মা' 'মা' বলিয়া ছুটিয়া আসে। তার গায়ে ফুলতোলা সাদা ফ্রক, সিঁথির ডান দিকে লাল ফিতা দিয়া বো বাঁধা। সে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে পঙ্কজ মোটা গলায় বলিয়া ওঠেন, নো নো।

কাজল এই নো-এর মর্ম বুঝিতে পারে না। পঙ্কজ বলেন, এটা হচ্ছে আমার শিক্ষাদানের স্পেশাল প্রণালী। বিজ্ঞান সম্মত। আরও পাঁচটা মেয়ে (যাদের মা, বাপ নেই অথবা তাঁরা আসেন না) এই দৃশ্য দেখলে আঘাত পেতে পারে তাই কোন উচ্ছ্বাস, যাকে বলে সেন্টিমেণ্টালিটি তা আমি—

কাজল বাধা দিয়া বলে, আপনার বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা একদিনের জন্য অন্ততঃ থাক—বলিয়াই মেয়েকে বুকে তুলিয়া চুমা খায়। চুমায় চুমায় তার মুখ ছাইয়া ফেলে। তার মনে হয় মীনা শুকাইয়া গিয়াছে, দু'মাসে তার গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়াছে।

সে মেয়ের সর্বশরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলায়। তার চোখ ছল ছল করিয়া ওঠে। বলে, তোর কোন অসুখ করেছিল ?

মীনা বলে, না মা।

তবে, তবে শুকিয়ে গেছিস যে ?

জবাব দেন পঙ্কজ, শুকোয় নি। বরং শরীরটে আগের চেয়ে ফিট্ হয়েছে। ফিট আর হার্ডি।

কাজলের রূপ ও গহনার জলুসে শ্রীবর্ধনের চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। মাথার কামানো চৌকো জায়গা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি বলিলেন, মেয়েটি খাসা—

কথাটা যে কার উদ্দেশে, মীনার না তার মায়ের, ঠিক বোঝা গেল না। পঙ্কজ দেবী স্বামীকে বলিলেন, তোমার ত এখন থাকার কথা নয়, মেয়েদের ইণ্টারভিউয়ের সময়। নারীসদনের রুলস—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীবর্ধন উঠিয়া যান। যাওয়ার সময় কাজলের দিকে হাত তুলিয়া বলেন, নমস্কার।

কাজল মেয়েকে একটু আদর করিতে চায়, অপরের অসাক্ষাতে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চায়। পঙ্কজের কাছে সেইরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করে। কিন্তু পঙ্কজ ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি বসিয়াই থাকেন। কাজল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কি পড়ছ মা ?

পঙ্কজ বললে, ক্লাস ফোরের পড়া। লেখাপড়ায় ও বেশ ভাল তাই ওর মেসোই পড়ান। আমিও মাঝে মাঝে দেখি। তবে আমার ত জানেন, সময় কম। কংগ্রেস, নারী রক্ষা, উন্মাদ আশ্রম—

কাজল প্রশ্ন করে, মেয়েদের জলখাবার কি দেন ?

তুমিই বল মীনু। দু'বেলা চা দেই, সঙ্গে মুড়ি নারকোল ডিমের পোচ, শিঙাড়া যখন যা হয়।

মীনা এই দু'মাসে খালি চা'ই পাইয়াছে বেশী, সঙ্গে কচিৎ মুড়ি বেগুনি। দু' একদিন বোধ হয় শিঙাড়া। কিন্তু সেক্রেটারীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, হ্যাঁ পাইইত। মুড়ি, বেগুনি, ডিম, রসগোল্লা—

ফর্দটা হয়ত আরও দীর্ঘ হইত। কিন্তু পঙ্কজ এই সময় ছোট্ট একটি গলা খাকারি দেওয়ায় রসগোল্লায়ই ছেদ পড়িল।

কাজল ছিল এক ঘণ্টার উপর। কিন্তু মীনার সঙ্গে কথা হইল খুব কম।

বেশীর ভাগই বলিলেন পঙ্কজ। আত্মীয়বন্ধুদের তিনি লম্বা এক ফিরিস্তি দেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভার সভাপতি পর্যন্ত এই তালিকা হইতে বাদ যান না কেহই। কেহ বর্ধন গোষ্ঠীর অর্থাৎ তার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়, কেহ বা বাপের বাড়ির। তবে বাপের বাড়ির আত্মীয়রাই বেশী পদস্থ।

লোক্যাল কংগ্রেসও তাঁর হাতের মধ্যে। সাত আট শ' হাড়ি মুচি তাঁর কথায় ওঠে বসে। তিনি কহিলেন, এই ত ক'দিন পরে জেলা বোর্ডের ইলেকশন। এখন থেকেই সবাই ঘোরাঘুরি করছে, কংগ্রেসীরা, রায় বাহাদুর, রায় সাহেবের দল।

কাজল চাঙারি ভরতি খাবার আনিয়াছিল। সে মীনাকে নিজের হাতে খাওয়াইল।

তুমি খাও মা—বলিয়া মীনা একটা সন্দেশ মায়ের মুখের সামনে তুলিয়া ধরে। কাজল হয়ত খাইত, কিন্তু পঙ্কজের উপস্থিতির জন্য তার কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে। নারীসদনের প্রত্যেকটি মেয়েকে সে নিজ হাতে খাবার দেয়। তাদের চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে একটা অপূর্ব আনন্দ। একজন ত কাঁদিয়াই ফেলে। একটি প্রৌঢ়া আশীর্বাদ করে, রাজ্যমন্ত্রী হও। ব্যবসায় সোনা ফলুক।

তার ব্যবসায়ের কথা তাহা হইলে এখানেও পৌছিয়াছে! কিন্তু আসিল কেমন করিয়া? কাজল মেয়েদের সামনে যেন এতটুকু হইয়া গেল।

আর সকলকে খাওয়াইয়া সে পঙ্কজকে বলিল, আপনিও দুটো নিন।

নিশ্চয়—বলিয়া একগাল হাসিয়া পঙ্কজ নিজ হাতেই চাঙারি হইতে খাবার তুলিলেন। কয়েক মুঠা খাইয়া স্বামীর জন্যও কিছু চাহিয়া নিলেন।

একে ত অমন সুন্দরী, তার উপর মোটর করিয়া আসিয়াছে। পরনে নিখুঁত দামী পোশাক। কাজলের মতন দর্শক নারী সদনে বিরল। পঙ্কজ তাকে খাতির করেন খুব। গাড়ীর পা দানির কাছে দাঁড়াইয়া নারী সদনের গল্প জুড়িয়া দেন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উর্মিলা নারী সদনই শ্রেষ্ঠ। কন্যার স্মৃতিরক্ষা কল্পে এর প্রতিষ্ঠা। তাই তারা উভয়েই যথেষ্ট পরিশ্রম করেন, তিনি সেক্রেটারী হিসাবে আর তাঁর স্বামী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রূপে। যদিও উর্মিলা শ্রী বর্ধনের মেয়ে নয়, মেয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী ভোগলেকারের। কমরেড ভোগলেকার।

পঙ্কজ অবিশ্রাম বকিয়া যায়। সব কথা কাজলের কানে যায় না। খানিকটা পরে সে বলে, আপনারা এ বাড়িটা সারিয়ে নিন। কখন পড়ে যায়।

চেষ্টা করছি খুবই। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। ডোনর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন।

কাজলের ইচ্ছা হইল বলে, নিচ্ছেন বোধ হয় আপনারা মেয়েদের সিন্ধী পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বিয়ে দেন ব'লে। এমন সময় পঙ্কজ চাঁদার খাতা খুলিয়া ধরিলেন—নারী সদনের ডোনেশন বুক।

কাজল বলে, নাম লিখব না। যা পারি পাঠিয়ে দেব।

লিখবেন না কেন? আমরা দেখাতে চাই আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের এখানে সমান অধিকার।

কাজলের সর্ব অঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। সে বলে, চাঁদা দেওয়ার অধিকার থেকে চাঁড়ালকে বেশ্যাকেও কেউ বাদ দেয় না। গোঁড়া সনাতনীরাও নয়।

পঙ্কজ কহিলেন, আপনি রাগ করলেন দেখছি। আমি সে ভেবে কিছু বলি নি।

কাজল ফিরিল একটা বেদনা লইয়া। তার কত আদরের মীনা, অত যত্নে মানুষ। সে যখন গর্ভে তখন রথীনের আবির্ভাব। কাজল মনে করিত মীনা ভাগ্যবতী হইবে। আজ নিজের চোখে তার ভাগ্য দেখিয়া আসিল।

মেয়ে হয়ত সময় মত খাইতে পায় না। হয়ত বা তাকে দিয়াও কাপড় কাচায়। সে থাকে ভয়ে ভয়ে। সে ত একরত্তি মেয়ে, পঙ্কজকে ভয় করে সবাই। প্রৌঢ়ারা পর্যন্ত প্রতিটি কথার জবাব দেয় তার মুখের দিকে চাহিয়া। আর এক কথা আশ্রমের সবাই জানিয়াছে সে পতিতা। পতিতার মেয়ে বলিয়া তারা হয়ত মীনাকে ঘৃণা করে। ঐ টুকু মেয়েকে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়।

এইসব ব্যাপারে মনটা যখন তোলপাড় হইয়া উঠিতেছিল ঠিক সেই সময় গণেশের চিঠি আসিল। সময়মত পৌঁছ সংবাদ না দেওয়ার জন্য মামুলী দুঃখ প্রকাশ তার পর অর্থভিক্ষা, চিঠিতে যথারীতি সবই ছিল।

কাজল চিঠিখানা পুরাপুরি না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিত কিন্তু এই সময় তার চোখে পড়িল জোছনার মৃত্যু সংবাদ। গণেশ লিখিয়াছে—কিছুদিন যাবৎ ছ্যানার কোন খবর নাই। সে একদিন ফুল্লশ্রীতে স্নান করিতে যায়

তারপর আর কেহ তাকে দেখে নাই। অনেকের বিশ্বাস তাকে কুমীরে খাইয়াছে, কারও বা ধারণা সে জলের তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে।

হতভাগিনী জোছনা, বাঙালী ঘরের মেয়ে, অর্থাভাবে বিবাহ হয় নাই। সমাজ তাকে লইয়া ঘোঁট পাকায়। গর্ভধারিণী যন্ত্রণা দেয়। এদেরই একদল আসিয়া সোনাবাগানের অধিবাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই তাদের ধূপগঞ্জ। এই তাদের দেশের সমাজ।

কাজলের মনে হয় জোছনা ইচ্ছা করিয়া নদীর জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নিজের বিলোপ সাধন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে।

সারাটা দিন বিষাদ ও বেদনায় তার মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মনে পড়ে চারুকে। চারু বাঙালী মেয়ের দুর্ভাগ্যের আর এক দিক। বনের ঝরা ফুলের মতন এই সব জীবন। এই চারু ও জোছনার দল লোকের চোখের আড়ালে ঝরিয়া পড়ে; নিজেদের বেদনা লইয়া মাটির বুকে মিশিয়া যায়।

তার জীবনে মীনার প্রভাব যে কতখানি কাজল নিজেও তাহা জানিত না। ছোট্ট এই মেয়েটি সব সময়ই মায়ের গতিপথে রাশ টানিয়া রাখিত। কাজল দিনের বেলায় মদ খাইত না, বাবু বসাইত না।

এবার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। শনি রবিবার দুপুর হইতেই তার ঘরে বৈঠক বসে। সারা রাত হৈ হল্লা চলে। একটানা ছুটি থাকিলে পর পর দুই তিন দিন প্রমোদবন্যা বহিয়া যায়।

এতদিন তার ধরন ধারণ ছিল ভদ্র ঘরের মেয়ের মত, লাবণ্যও সেইরূপ। চেহারায় কি আচার-ব্যবহারে পেশার কোন ছাপ ছিল না, বোঝার উপায় ছিল না যে সে একজন বারবনিতা, রাত্রে মদ খায়, অর্থের বিনিময়ে যার তার সঙ্গে প্রেমের বেসাতি করে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই রথীন আকৃষ্ট হয়, কবি সাধন অন্তরঙ্গ হইয়া ওঠে।

এবার কাজল এই বিশিষ্টতা হারাইল। হারাইল হয়ত নিজের অজ্ঞাতে। ক্রমে ক্রমে তার মুখ খুলিয়া গেল। শুরু হইল, 'মরে গেনু', 'মাইরি আর কি' এই ধরনের সোনাবাগানী রসিকতা। দেওয়ালে নগ্ন চিত্র উঠিল, দেয়াল ও আলমারির মাথায় কতগুলি নগ্ন পুতুল।

বাবুরা অনেকেই এই পরিবর্তনে খুশি হয়। পল্টু বলে, এই বার গিয়ে

মানিয়েছে। এতদিন এ পাড়ায় তুমি বড় বে-মানান ছিলে আণ্ট্। বাংলার জোলো মাটিতে যেন পেশোয়ারের বেদানা।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে খুশি হয়, সুবালা। বলে, আগে তোকে সত্যি সত্যি ভয় করতুম।

কাজল প্রশ্ন করে, আর এখন ?

এখন আর ভয় কিসের ? তুই ত আমাদেরই একজন হয়ে গেছিস।

সেই ত ভাল ভাই।

নগ্ন পুতুলের দিকে চাহিয়া সুবালা বলিল, আমার আছে কতগুলো নেংটো ছবি। মেয়ে পুরুষে জোড়ায় জোড়ায়।

প্যারিস পিকচার বুঝি ?

ঠিক বলেছিস। ইঞ্জিরি নাম ছাই আমার মনে থাকে না। আমায় এক বাবু দিয়েছে, বুড়ো মানুষ কিন্তু রসে টৈ-টুম্বুর, রসবড়ার মতন। তুই ছবিগুলো দেখবি ?

বেশ ত, নিয়ে আসিস।

আলোচনা হয় সকালে। দুপুরের পর সুবালা প্যারিস পিকচারগুলি লইয়া আসে। দেখিয়া কাজলের চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। সুবালা বলে, বুঝেছি তোর রক্ত চনবন করে উঠেছে। উঠবেই ত। একে এই ছবি তার উপর তোর অমন যৈবন। যৈবন না যেন পাগলা ঘোড়া—বলিয়াই সুর ধরে,

যৈবন সাগরে ডুবিয়া মরিনু
হেরিনু মোহন রূপ,
কি কহিব সখি
অন্তিমে জ্বালিবি
বঁধুর পিরিতি ধূপ।

কাজল ত হাসিয়াই আকুল।

দুই বান্ধবীতে বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হয়—যৌন জীবনের নানা রহস্য। কামনা উদগ্র কার ? পুরুষের না নারীর ? সুবালা বলে, কাম মেয়েদেরই বেশী। দেখিস না হেংলাপনা ?

কাজল বলে, না ভাই, কাম বেশী আমাদের তবে চাপা। চাপা বলেই পুড়িয়ে মারে। এই যে এত মেয়ে বাজারে দেহ বেচতে এসেছে এ ত সেই কামের'ই জন্য। পুরুষরা পারত না, পাগল হয়ে ছুটে পালাতো।

সুবালা বলে, আমি এসেছি পেটের জ্বালায় আর পাঁচ জনের অত্যেচারে।

কাজল বলে, আমার কিন্তু রক্তের খিদেই বড়।

কার স্বীকারোক্তি যে বেশী মর্মান্তিক বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ পরে সুবালা উঠিতে চাহিলে কাজল কহিল, একটু মাল খেয়ে যা।

তার ঘরে ছিল সেরি। দুই বান্ধবীতে মিলিয়া উহা খাইল। সুস্বাদু মদ সুবালা অনেকদিন খায় নাই, তাই মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়া গেল। ভাবাবেগে সে কাজলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোর মাহাত্মিই ত এইখানে। বড় লোক কিন্তু ছোটদের ঘেন্না করিস না।

ঘেন্না! তুই একদিন আমার কত উপকার করেছিস, তা কি ভুলতে পারি?

বড়রা ভোলে। ওদের ওই স্বভাব। ছোটরা হ'ল বড়র ওঠার সিঁড়ি, রক্ত মাংসের তৈরি ধাপ।

কাজলের ঘরে আজকাল প্রায়ই পাড়ার মেয়েদের আড্ডা বসে। সুবালা, হর্তুকি, টম্যাটো—আসে অনেকে। নতুন একটি মেয়ে আসে—জোরকদম। কুৎসিত ভাষায় আড্ডা জমাইতে তার জুড়ি পাওয়া দুষ্কর। কাজল এ বিষয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে। ধাপে ধাপে নামে। দেখিয়া রসবতীও প্রসন্ন হয়। বলে, ওই ত চাই। ওকে দেখতে পারতুম না, নেকামির জন্য। করবে বেশ্যাগিরি, আর দেখাবে গোঁসাই-গিন্নীপনা, তবু যাক্ এদ্দিনে গিয়ে ধাতস্থ হয়েছে।

রসবতী তাকে নিজেদের পংক্তিতে তুলিয়া লইয়াছে ইহাই কাজলের সান্ত্বনা। এই জন্য মধ্যে মধ্যে তার হাসি পায়। সে হাসির পিছনের ট্রাজেডি যে কত বড় তার বর্তমান বন্ধু বান্ধবরা সেটুকুও বোঝে না। বোঝার শক্তি তাদের নাই।

বেলঘরিয়ার কোনও বাগান-বাড়িতে বাংলার এক মন্ত্রীর গার্ডেন পার্টি। কাজলকে মুজরো গাহিতে হইবে। সে আসিয়াছে নীলাম্বরি পরিয়া; গায়ে নীল ব্লাউজ, হাতে দুগাছি করিয়া ব্রেসলেট, কানে রুবির ইয়ার্-রিং।

জলসা ঘরের দরজায় মন্ত্রী একগাল হাসিয়া অভ্যর্থনা করেন। ঘরের ভিতরে প্রথমেই ছিল ভণ্ডুল, তার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন, মিস কাজল দেবী, মিস্টার ভণ্ডুল বোস, ইম্‌প্রেসারিও।

উভয়ের কেহই ধরা দেয় না যে তারা পরস্পরের পরিচিত। ভণ্ডুল শুধু বলে, ওঃ ডিয়ার, ডিয়ার। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া কাজল আগাইয়া যায়।

পরিচয় হয় অনেকের সঙ্গে—মবজুলুল হোসেন, জে. পি., অল্ডারম্যান ননীভূষণ নান, কোল কিং দোলগোবিন্দ হাতী। করমর্দনের সময় কয়লা রাজ হাতীর হাতের চাপে কাজল কাতরাইয়া ওঠে, উঃ!

হাতীর পরেই রঘু উকিল বসিয়া। কাজলকে দেখিয়া সে একটু হাসে। এই লোকটিই তার মামলার সময় 'বোগাস' বলিয়া জিনিসটা উড়াইয়া দিয়াছিল। কাজল তাই মুখ ফিরাইয়া নিল। মন্ত্রী তাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন এমন সময় আসিলেন এক নূতন অতিথি। হালো জষ্টিস স্যর বিষেণ নারায়ণ—বলিয়া মন্ত্রী তাঁর দিকে আগাইয়া যান। কাজল মনে মনে নবাগতকে ধন্যবাদ দেয়।

আবার নূতন পরিচয়ের পালা। কাজলের সামনে আসিয়া স্থূল বপু বৃদ্ধ জষ্টিশ কাউল বাই-ফোক্যাল চশমার নিচের অংশ দিয়া তার দিকে তাকান। বৃদ্ধের ললাট ভ্রূ চোখের পোতা এমন কি মুখের পুরু চামড়া পর্যন্ত কুঞ্চিত হইয়া যায়। দেখায় সিন্ধু ঘোটকের মত।

পার্টিতে আরও অনেকে আসেন সমাজের শিরোমণির দল। সুন্দরী সুবেশা তরুণীও কয়েকটি, সকলেই আপ-টু-ডেট।

সন্ধ্যার কিছু পরেই গান আরম্ভ হয়। শুরু করে কাজল। গায় পর পর তিনখানা গান। তার পরই ভণ্ডুল পিওনো বাজাইয়া আরম্ভ করে,

ডোণ্ট নো হুম আই লভ্
এ পিজন অর এ ডভ্
এ রেড রোজ অর লিলি
এ বেলা অর এ মিলি.

হাসির হররা পড়িয়া যায়। করতালির পর করতালি। আরও কয়েকটি মেয়ের গানের পর দোলগোবিন্দ বলেন, এবার আপনার একখানা নাচ হ'ক, মিষ্টার বোস।

ভণ্ডুল প্রথমে আপত্তি করে। উপস্থিত সবাই জোর করিয়া ধরিলে শেষটায় পাঁচ মিনিট সময় চায়। কাজলকে বলে, আমি তৈরি হয়ে আসছি আমার সঙ্গে পিওনো বাজাতে হবে কিন্তু আপনাকে।

ভণ্ডুল বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। মিনিট কয়েক পরে পাশের এক ঘর হইতে মহাদেব বেশে বাহির হইয়া আসিল, মাথায় জটাজুট, গায়ে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, গলায় জড়ানো একটা জীবন্ত সাপ।

সাপ দেখিয়া অনেকেরই চক্ষুস্থির। নান হাঁ করিয়া তাকান। রঘু উকিল বলিয়া ওঠে, বোগাস। দোলগোবিন্দ সরিয়া যান। পাশের একটি মেয়ের পায়ে চাপ লাগায় সে বলে, হাউ ইজ্ ত্থাট্?

নে ফিয়ার লেডিস এণ্ড জেণ্টস, বলিয়া ভণ্ডুল আরম্ভ করে,

বম্ ববম্ ববম্ বম্
অন্ধকার ছম্ ছমম্
আয় রে ভূত জোর কদম্
জ্বাল আগুন গন্ গনন্।

নাচের তালে তালে তার জটাজুট ও বাঘছাল মুখর হইয়া ওঠে। গললগ্ন সাপ ফোঁস ফোঁস করে।

নাচিতে নাচিতে ভণ্ডুল কাজলের পায়ের সামনে আসিয়া উবু-হাঁটু হইয়া বসিল। মনে হইল মহাদেব পার্বতীর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন। সাপটা কাজলের বুকের কাছে ফণা তুলিলে দোলগোবিন্দ চোখ বোজেন, কাউলের মুখ দিয়া একটা শব্দ বাহির হয়, শব্দটা আ—উ-র মতন।

ঘরময় ভীতি আর অজানা আশঙ্কার ভাব। ভয় সাপের, না রুদ্র দেবতার রোষের? সাপের ফোঁস ফোঁসানির মধ্যে তারা হয়ত প্রকৃতির অভিশাপের ইঙ্গিত শুনিতে পায়। এই অভিশাপ সমাজকে সভ্যতাকে—যে সমাজ ও সভ্যতার শিরোমণি এই মন্ত্রী ও পুরাণসিন্ধু, রঘু উকিল ও সার বিষেণ নারায়ণের দল।

কাজলের কিন্তু ভয় করে না। আঙুলের মৃদু আঘাতে পিয়ানোর বুকে করুণ সুর তুলিয়া পরিস্থিতিটাকে সে আরও যেন রহস্যময় করিয়া তোলে। এই সময় বাহিরে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ হয়। গাছের ডালে ডালে ঠোকাঠুকি, দরজা জানালায় আঘাত প্রত্যাঘাতের শব্দ। ভণ্ডুলের রুদ্র নৃত্য যেন ঝঞ্ঝাকে ডাকিয়া আনে।

কৃশাঙ্গী একটি তরুণী পাশের ঘর হইতে আসিয়া তিন বার শিঙা বাজায়। এই ঘর হইতেই ভণ্ডুল মহাদেব বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। শিঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার গায়,

আয়রে ভূত জোর কদম্
তোল আওয়াজ গম্ গমম্
বম্ ববম্।

পায়ের আঘাতে মেজের উপর গম্ গম্ শব্দ তোলে।

নাচ থামে। বাহিরে ততক্ষণে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জন শোনা যায় আর গাছের পাতার উপর জলের শর্ শর্ শব্দ।

খানিকটা পরে মন্ত্রী কাজলকে ফরমাস করেন, এবার তোমার একখানা গান হ'ক। তাকে সমর্থন করেন বৃদ্ধ কাউল,—কজ্জল বিবিকা গাহনা? জরুর, জরুর।

কাজল ধরে—

শালের বনে
থেকে থেকে,
ঝড় দোলা দেয়
সে মাথা নাড়াইয়া নাড়াইয়া গায়,
ঝড় দোলা দেয়—

তার ইয়ার্-রিং দুটি দুলিতে থাকে। নাকের ডগায় দেখা যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন এক একটি মুক্তার দানা। পুরুষরা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে, শুধু পুরুষরা নয়, নারীরাও। নিজের এই জয়ে কাজলের গর্ব বোধ হয়।

দু' তিনটি মেয়ের গানের পর আবার ভণ্ডুলের নাচ। বিরহী ময়ূর নৃত্য। প্রারম্ভে বক্তৃতা। বক্তৃতা আর কিছু নয়, কুলটুর কথাকলি ব্রিজ বাণ্ডুল ড্যান্সার্ স্থুরাবায়া পেলাম্বাং সাউথ ইষ্ট এশিয়া প্রভৃতি কতগুলি শব্দ আর অঙ্গভঙ্গী। হাত দিয়া সে সেতুর মতন কি একটা দেখায়। এই বক্তৃতা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেয় নাচই এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের মিলনের সেতু, কুলটুর বা কালচারের বাহন। বাণ্ডুল ড্যান্সার্ সম্প্রতি স্থুরাবায়া পেলাম্বাং প্রভৃতি স্থানে নাচ দেখাইয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগের সেতু-বন্ধন করিয়া আসিয়াছে।

ঘন ঘন করতালের মধ্যে আরম্ভ হয় ময়ূর নৃত্য। ভণ্ডুল ময়ূর, যে মেয়েটি শিঙা বাজাইয়াছিল সে ময়ূরী। ভণ্ডুল এক একবার তার দিকে আগাইয়া যায় আর বিচিত্র শব্দ করে। শব্দটা শুনিতে 'পাখোয়াজ'এর মতন।

কাজল এবারও পিয়ানো বাজাইতেছিল। তার মনে পড়িল চারুর মৃত্যুর পর পুলিস অফিসারের প্রশ্ন, তুমি এর কাছে পাখোয়াজ কিংবা বোলতার নাম শুনেছ ?

প্রথম হইতেই মদ চলিতেছিল। নেশা হইয়াছিল প্রায় সবার। বুড়ো কাউলের সব চেয়ে বেশী। নিজেকে ময়ুর মনে করিয়া তিনি পেখম ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। পেখম হইল জানালার রঙিন একটা পর্দা।

রাত এগারটা। অতিথিদের অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা আধ-ঘুমন্ত। দোলগোবিন্দ চেয়ারের ব্যাক-রেষ্টে মাথা রাখিয়া ঝিমাইতে ছিলেন, মাথা ডান দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। মেজেয় কার্পেটের উপর অন্ডারম্যান নান শুইয়া।

কেহ নাক ডাকায়, কেহ সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ে। কাউলের মুখ দিয়া ফেনার গোলা বাহির হয়। পেঁপের ডাঁটায় ফুঁ দিয়া ছেলেরা যেমন জলের গোলা তৈরি করে সেই রকম।

একধারে শিশির চট্টর সেতার আলাপ চলিতেছে, তবলা সঙ্গত শিশির সাহার। শ্রোতাদের অবস্থা দেখিয়া তাঁরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন।

কাজল মন্ত্রীকে বলিল, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিন।

মন্ত্রী বলিলেন, এরই মধ্যে ? রাত ত মোটে এগারটা।

শরীরটে ভাল নেই।

মনে করেছিলুম সারা রাত থাকবে।

রাত্তিরে আমি বাইরে থাকি না।

অন্তত একটা দিন একটু দেরি কর হনি, ফর মাই সেক—বলিয়া মন্ত্রী কাজলের হাত ধরেন। বুলডগের মতন তার হিংস্র মুখখানা মুহূর্তের জন্য নরম হইয়া যায়।

পুরুষের এই দুর্বলতা কাজল অনেক দেখিয়াছে। আগে সহানুভূতি হইত, এখন হয় রাগ। পুরুষ মানুষকে জব্দ করিয়া সে আনন্দ পায়—পাঁচুর শ্রেণীর উপর প্রতিহিংসা লওয়ার আনন্দ। মন্ত্রীর মতন পদস্থ মানুষকে পরাস্ত করার আনন্দে ভিতরে ভিতরে শিহরণ অনুভব করিয়া সে বলিল, পারলে নিশ্চয় থাকতুম। কিন্তু থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মন্ত্রী দেখিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, দেখছ ত অবস্থা। একটু অপেক্ষা কর। এদের ব্যবস্থা করে আমি নিজেই তোমায়

রেখে আসব।—বলিয়াই অচেতন অর্ধচেতন অতিথিদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

ঘরের মধ্যে কাজলের শরীর ঘিন ঘিন করিতেছিল। সে উত্তর দিকের ঝুল-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কিছু আগে জল ঝড় থামিয়াছে। আকাশের উত্তর দিক ঘেঁষিয়া উঠিয়াছে এক ফালি চাঁদ। তবে আলো ভারী করুণ, বিরহীর অনুভূতির মত করুণ কিন্তু মিষ্টি।

মাটির বুক হইতে মিঠা গন্ধ আসে, কাজলের চেনা গন্ধ। তার আজ ইচ্ছা করে মাটির বুকে লুটাপুটি খাইতে। ছেলেবেলার মত গায়ে কাদা মাটি মাখিতে।

ভণ্ডুল পিছন হইতে আসিয়া আলগোছে তার পিঠে হাত রাখে; না দেখিয়াও কাজল বোঝে লোকটি কে। সে একটু সরিয়া যায়।

ভণ্ডুল বলে, কংগ্র্যাচুলেশন্।

কাজল নীরব। ভণ্ডুল বলিল, তোমার গান আজ সবার মনে দোলা দিয়েছে। বুড়ো কাউল থেকে ফ্যাটি দোলগোবিন্দ পর্যন্ত সবার।

কাজল বলে, আপনার নাচ দিয়েছে আরও বেশী।

তোমার ভাল লেগেছে তাহলে? এঁ?—শব্দটা শুনিতে ইংরাজী এইচ-এর মতন।

কাজল মুখ ফিরাইয়া ভণ্ডুলের দিকে তাকায়। তার মনোকলের উপর চাঁদের আলো চক চক করিতেছিল। একচক্ষু কোনও জন্তুর দিকে চাহিলে মানুষের মন যে রকম বিরূপ হয় কাজলের অবস্থাও হইল সেইরূপ। বলিল, আপনি কি চান বলুন দেখি?

ভণ্ডুল এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতই ছিল। বলিল, নাথিং, ওনলি উইস্ ইউ ওয়েল। (কিছু নয়, শুধু তোমার মঙ্গল চাই।

সত্যি?

ভণ্ডুল তার হাত ধরিয়া বলিল, বাই গ্যাড্।

সে জানে কাজল তার উপর খুশি নয়। চারুর মৃত্যুর জন্য সে তাকে দায়ী মনে করে। তাই বলিল, ডান গ্রোস ইনজাসটিস্, চারুর ব্যাপারে আই য়্যাম 'নোসেণ্ট য়্যাজ এনি মাদার গোঁসাই ওফ খরদা, চেট্টিস্ কেসেস ফলস্ টু। চারুর ব্যাপার ও টিউটিকোরিনের মামলায় সে নির্দোষ

প্রমাণিত হইয়াছে কাজল তাহা জানে। মনিমালার কাছে শুনিয়াছে। তবে খড়দহের মা গোঁসাইদের সঙ্গে ভণ্ডুল নিজের তুলনা করায় সে মনে মনে হাসিল। বলিল, সে সব জানি কিন্তু চারুর টাকাটা কি করলেন?

মাই গুডনেস্—বলিয়া ভণ্ডুল প্রথমে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার পর বলে, ইন মিমোরিয়ম, বেষ্ট ডানসারস্ প্রাইজ, উওম্যান ডান্সার।

কাজল বলে, বুঝলাম না কিছুই।

ভণ্ডুল বুঝাইয়া বলে, চারুর টাকার সুদ হইতে শ্রেষ্ঠ নারী নৃত্য-শিল্পীকে বছরে সে একশত টাকা পুরস্কার দেয়। এ বছর শুরু করিয়াছে। পুরস্কার পাইয়াছে আইলা মালিক। এই ভাবে পুরস্কার বিতরণ করিয়া চারুকে সে অমর করিতে চায়। কথাটার উপসংহার করে—ইন দি ফিল্ড্ ওফ আর্ট এণ্ড কুলটুর বলিয়া। একটু থামিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে স্যাটিস? (স্যাটিস—স্যাটিসফাইড্-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

কাজল কোন জবাব দেয় না। এর পর ভণ্ডুল আধা বাংলা, আধা ইংরেজীতে যাহা বলে তার মর্ম এই, চারুকে সে ভালবাসে, কাজলও বাসিত। তাদের দু'জনের আত্মার মিল এইখানে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য বার দুই তিন বলিল, এ্যাফিনিটি, সোল্স্ এ্যাফিনিটি।

একটু ভাবিয়া কাজল বলিল, আপনার ত অনেক চেনা জানা আছে। আমার মেয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?

মীনু, মীনু, দি ডার্লিং? হোয়াট্স ইট্?

কাজল সব খুলিয়া বলিল, মীনাকে পুলিসে ধরার কথা, নারী সদনের অবস্থা, তাকে অন্য কোনও আশ্রমে স্থানান্তরের দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়া। কথাটার উপসংহার করিল এই বলিয়া—জানেন, জায়গাটা একটা ধোবিখানা?

ধোবিখানা! ওঃ ডিয়ার, ডিয়ার।

শুনেছি সেক্রেটারীর স্বামী হলধরের একটা লণ্ড্রি আছে। নারীসদনের মেয়েদের দিয়ে তার কাপড় কাচায়।

দা ডেভিল। মীনুও কাপড় কাচে?

তা বোধ হয় কাচে না। তবে কিছুই বোঝার জো নেই। এই যে ক'বার গেছি একদিনও নিরালায় কথা হয় নি। কেউ দেখা করতে গেলে সেক্রেটারী পঙ্ক দেবী আগাগোড়া সামনে থাকে। মীনার অবস্থা জেলখানার স্বদেশী কয়েদীর মত।

তুমি মন্ত্রীকে জোর করে ধর, ফল হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ত ম্যাজিষ্ট্রেট, লাট বেলাটও ওঁর কথা ফেলতে পারবে না।

ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ যে অতি অল্প দিনের।

তাই যথেষ্ট। (এ কাজল ইজ এ কাজল আফ্‌টার অ'ল্যাট্)।

এই তোষামুদিতে কাজল প্রীত হয়। একটু হাসে। ভণ্ডুল বলে, তুমি ওকে কোথায় রাখতে চাও?

রসা চিরঞ্জীব হোম জায়গাটা শুনেছি ভাল। পল্টুবাবু ওর সেক্রেটারীর সুখ্যেত করছিলেন।

ভণ্ডুল হাসিয়া ওঠে। কাজল বলে, চেনেন নাকি?

ইয়েস। নরেন চৌধুরি এলিয়াস পশু? আগে পারা থেকে সোনা তৈরির চেষ্টা করত। এখন করেছে মেয়েদের আশ্রম। আ কাউণ্টার ফিট কয়েন।

পল্টুর প্রশংসিত চিরঞ্জীব হোমের সেক্রেটারীও যেন মেকি টাকা। কাজল হতাশ হইয়া পড়ে। ভাবে, তবে উপায়?

তাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ভণ্ডুল বলে, লেট মি সি।

দু'জনেই নীরব। অদূরে একটা ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। সেটা কিছুক্ষণ যাবৎ অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল। শব্দটা ভারী বিরক্তিকর। বুদ্ধিমান্ শ্রোতার নিকট নেতাদের রাজনৈতিক বক্তৃতার মত।

প্রায় দশ মিনিট এই অবস্থায় কাটিয়া যায়। তারপর ভণ্ডুল বলে, একটা খবর ছিল।

কি?

টুয়েল্‌ভ হান্‌ড্রেড্‌ ফর্ এ ট্রেনার।

কাজলের মনে হয় এ এক হেঁয়ালি। সে ভণ্ডুলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ভণ্ডুল বলে, ফতিমা দি গ্রেট।—যেন হেঁয়ালির গোলক ধাঁধা।

সে আবার বলে, স্কাট্‌স স্টেবল। দা টার্ফ, দা রেস।

ওঃ, রেসের কথা বলছেন?

কাজলের মুখখানা প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ঘোড়-দৌড়ের প্রতি তার এই দুর্বলতা বহুদিনের। সে তখন গরিব। সুবালার এক বাবু সেই সময় রেসে পাঁচ টাকায় একশ পঁচানব্বই টাকা পায়। সেই হইতে এই দুর্বলতার সূত্রপাত। ভণ্ডুল ইহার খবর রাখিত। সে বুঝিল ঠিক্ তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে,

কাজলের হৃদয়ের দুর্বার পিপাসার তন্ত্রী। বলিল রেসে এ সপ্তাহে দশ টাকায় বার শ' টাকা পাইয়াছে।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, লটারিতে পেয়েছেন বুঝি ?

নো স্যুইট্ হ্যানি, পেয়েছি টোটে।

টোট কি ?

ওঃ, ডিয়ার, ডিয়ার, টোটালিজেটর। ভণ্ডুল বলিয়াই যায়, বিখ্যাত ট্রেনার স্কটের সহিত মুস্তাফার নিকট মধ্যে মধ্যে সে গোপন খবর পায়। আগামী সপ্তাহেও ভাল খবর আছে। গড়োয়াল কাপ নেবে মহারাণী।

কাজল বলে, আসছে হপ্তায় আমায় নিয়ে যাবেন কিন্তু।

ইয়েস, ইয়েস—বলিয়া ভণ্ডুল কাজলের হাতে একটা মৃদু চাপ দেয়। এই সময় বারান্দার অপর প্রান্ত হইতে মন্ত্রী ডাকেন, কাজল দেবী।

কাজল তাঁর সঙ্গে বাড়ি রওনা হয় রাত প্রায় একটায়। মন্ত্রী তার কাছ ঘেঁসিয়া বসেন। কাজল সরিয়া যায়। মন্ত্রী আগাইয়া আসেন আর মধ্যে মধ্যে 'হনি' বলিয়া আদর করেন। গাড়ীর ভিতরটা গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত হইলেও তাঁকে এড়ানো কাজলের পক্ষে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। অগত্যা সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মন্ত্রী নিজের জীবনের গল্প জুড়িয়া দিলেন। ছোট হইতে ধাপে ধাপে কি করিয়া উঠিয়াছেন সেই কাহিনী। বলেন, একদিন ফেরি করেছি, ক্যানভাসের ব্যাগে করে পাঁচকড়ি দে'র ডিটেকটিভ বই আর মাসিক পত্র। কোন দিন ভাত ডাল জুটেছে, কোন দিন শুধু চানা চিবিয়েছি।

কাজল কলের খেলনার মত বসিয়া থাকে। খেলনার মতই তার মনে কোন সাড়া জাগে না। মন্ত্রী বলেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

কি কাজ ?

ক'জন এম. এল. এ-কে খানিকক্ষণ আটকে রাখতে হবে।

কাজল এই অদ্ভুত অনুরোধের অর্থ বুঝিতে পারে না। তাকে নীরব দেখিয়া মন্ত্রী বলেন, ক'রতে হবে আমাদের গদি বজায় রাখার জন্য, মন্ত্রীর মসনদ। পার্টির জন্য এসব করতে হয়।

আপনি আর কাউকে বলুন।

আর কেউ পারবে না। এ সম্ভব শুধু তোমাকে দিয়ে।

কি করতে হবে ?

বাজেট সেসনের সময় কয়েকটি এম. এল. এ-কে কোন বাগানবাড়িতে ভুলিয়ে রাখতে হবে। কয়েক ঘণ্টা। ছলা, কলা, মদ, মাংস যা দিয়ে পার। মোটা টাকা পাবে আর পাবে—কাজলের গালে সজোরে চুমা দিয়া মন্ত্রী বলিলেন, আর পাবে আমার বন্ধুত্ব।

একটা দিনের জন্য কতগুলি বড় লোকের বাঁদরামি দেখিতে পাইবে ভাবিয়া কাজল মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। বলে, বেশ করব। কিন্তু আপনাকেও আমার একটা উপকার করতে হবে।

কি ?

আমার মেয়ের একটা ব্যবস্থা।

তোমার মেয়ে আছে, পেটের সন্তান ?

হ্যাঁ।

পতিতারা সাধারণতঃ বাবুদের নিকট সন্তানের কথা স্বীকার করে না। তা'তে তাদের খাতির কমে। কাজল নিজ হইতে সন্তানের কথা বলায়, মন্ত্রী মহাশয় তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, তুমি সব বিষয়েই স্পেশ্যাল। সাধে কি আর এত নাম ডাক হয়েছে ?

কাজল মীনার ব্যাপারটা সব খুলিয়া বলিলে মন্ত্রী কহিলেন, বেশ আমি তার একটা ব্যবস্থা করব তবে এই বাজেট সেসনটা যাক্।

রেসে লাভের কথা শুনিয়া কাজল কয়েকজনের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। রেসে যাইতে নিষেধ করে সবাই। কুসুম বলে, ও রাস্তা মাড়িও না। অমন যে আমার দিদিমা কুমকম, সেও রেসকে ভয় করত। বলত, ও হচ্ছে আলক্ষ্মীর বাসা, ওখানে গেলে লক্ষ্মী গোসা হন।

লক্ষ্মীর ক্রোধের ভয়ে কাজল ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাকে উৎসাহ দিল প্রমীলা। সে বলিল, তুই মাঠে যাবি না ত যাবে কে ? তোরই তো ফুর্তি লুটবার সময়। টাকায় টাকা, যৈবনে যৈবন, অশ্বমেধের দু' দুটো ঘোড়া তুই দরজায় বেঁধে রেখেছিস।

শনিবার। বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু পরেই ভণ্ডুলের আসার কথা। কাজল আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। চুল আঁচড়ায় আর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইয়া যায়। কাউল ও মন্ত্রীর দল যে মুগ্ধ হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

মাথার ঘন কৃষ্ণ চুলের নিচে ছোট্ট একখানি ললাট, এক জোড়া টানা ভুরু, ডাগর দু'টি চোখ। চাহনিতে মাধুর্য ও ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু উগ্রতা নাই। পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁট, সুন্দর চিবুক, গলায় তিন তিনটি বলি। সংস্কৃত কোন মহাকাব্যে মদনের তিনটি সিঁড়ির কথা আছে। রথীন তাকে সেই কাব্য পড়াইবার সময় বলিত, তোমার বলি তিনটি ঠিক ঐ রকম।

বাহুর গড়নই বা কী সুন্দর! গাড়ীতে মন্ত্রী সেদিনও বলিলেন, তোমার ঐ বাহু দু'টির জন্য আমি অনেক ত্যাগ করতে রাজি আছি। অনেক পাপ।

তার এত রূপ। ভাগ্যিস ধূপগঞ্জে সকলের চোখের আড়ালে ইহা নষ্ট হইয়া যায় নাই। নিজের রূপে সে বিভোর এই সময় জোরে বাতাস হওয়ায় রথীনের ছবির উপরের পর্দাটা সরিয়া যায়। আয়নায় কাজলের পাশেই ছবির প্রতিবিম্ব পড়ে। কাজলের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়।

আগেও কয়েকবার এইরূপ হইয়াছে। কাজল ভাবিয়াছে ছবিখানা সরাইয়া রাখিবে কিন্তু সরাইয়া রাখার মতন জায়গা নাই। খাট, বিছানায়, চেয়ার, টেবিল, আলমারিতে ঘরখানা ঠাসা। মোটা গদির উপর তাকিয়ার পাহাড়। এই প্রাচুর্যের কুশ্রীতা আগের মতন তার চোখকে আর পীড়া দেয় না বরং এই রাস্তার আর পাঁচজনের মত পুতুল ও তাকিয়ার ভিড়কে সেও মর্যাদার চিহ্ন বলিয়াই মনে করে।

ভণ্ডুল আসিল একটার একটু আগে। হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, গেট রেডি, কুইক্, কুইক্।

আপনি বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি—বলিয়া কাজল পাশের ঘরে চলিয়া যায়। একটু পরে বাসন্তী রং এর শাড়ি পরিয়া, গায়ে ফারকোট চড়াইয়া, কটকি চটি পায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসে। ভণ্ডুল বলে, হাউ চার্মিং। (চার্মিং এর র'টা শোনা যায় না।)

গাড়ী ছিল অন্য একটা গলির মোড়ে। এলুমিনিয়াম রংয়ের টর্পেডো বডি গাড়ী সূর্য কিরণে ঝলমল করে। ভণ্ডুল গাড়িতে উঠিয়া চুরুট ধরাইয়া লয়। নিজেই চালায়। পাশে কাজল বসিয়া, তার কাছে অনেক গল্প করে, কোথায় কোথায় নাচ দেখাইয়া আসিয়াছে, কোন্ জায়গার আচার ব্যবহার কিরূপ, অধিবাসীদের বেশ ভুষাই বা কেমন, কোথার রাজা তার সঙ্গে করমর্দন করিয়াছেন তারই বর্ণনা।

বলে ইংরেজির খাদ মিশানো বাংলায়, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে। কাজল হয়ত সব বিশ্বাস করে না। কিন্তু শুনিতে লাগে বেশ।

তারা মাঠে পৌছিল দৌড় আরম্ভ হওয়ার মিনিট কুড়ি আগে। মাঠময় সে কি উত্তেজনা! মোটরে মোটরে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে, মানুষের মাথায় মাথায় রেসকোর্সটা কালো দেখায়। প্রতিটি ফটকের সামনে তিন চারটা করিয়া কিউ। মেয়ে পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, বাঙালী মারোয়াড়ি ফিরিঙ্গি বহুজাতির, বিভিন্ন বেশের লোকের অপূর্ব সমাবেশ। কিউর পাশে দাঁড়াইয়া ফেরিওয়ালা চীনা বাদাম, পান সিগারেট কত কি বেচে। একদল চেঁচায় রেসিং গাইড টার্‌ফ্‌ গাইড বলিয়া। কিউর লাইনগুলি ঘড়ির কাঁটার মতন ধীরে ধীরে নড়ে।

ত্বপাশের লোকেরা ঘাড় বাঁকাইয়া কাজলকে দেখে। সামনের কেহ কেহ কোন না কোন অছিলায় পিছন ফিরিয়া তাকায়। পুরুষের চোখে কামনার আগুন ও মেয়েদের চোখে ঈর্ষার জ্বালা দেখিয়া কাজল বেশ আনন্দ বোধ করে। ভণ্ডুল বোধ করে গর্ব।

গৈরিক আলখাল্লা পরা ফকির গোছের একটি লোক আসিয়া কাজলের কাছে এক টাকা দামের 'অশ্বমেধ কবচ' বেচিয়া গেল। ইহা সঙ্গে রাখিলে ঘোড়দৌড়ে বাজী জেতা নাকি অনিবার্য। কাজলের দেখাদেখি আরও অনেকে কিনিল।

মাঠে ঢুকিয়া প্রথমেই হারাধন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। তার বাঁ বগলে কতগুলি খবরের কাগজ, ডান হাতে কয়েকখানি রেসিং গাইড। একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া তিনি ত্ব' তিনখানা রেসের বই মিলাইয়া দেখিতেছেন। ভুঁড়ি হওয়া ছাড়া এই কয় বছরে তাঁর চেহারার আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। ভুঁড়িটি বিশাল, কোটের নিচের বোতাম আর লাগাইতে পারেন না। কাজলকে দেখিয়াই তিনি একগাল হাসিয়া বলিলেন, কাজল না? বেশ, বেশ। কোন খবর আছে?

রেসকোর্সে খবর মানেই ঘোড়ার খবর। কাজল তাই বলিল, না, মাঠে আজ আমি এই প্রথম।

মহারাণীর খবর প্রকাশ না করায় ভণ্ডুল কাজলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, ইউ ক্লেভার হ্যাসি।

চেনাশুনা আরও কয়েক জনের সঙ্গে দেখা। হাফ্‌-প্যান্ট পরিয়া পল্টু আসিয়াছে, পল্টু মামু। তার সঙ্গে দোলগোবিন্দ হাতী ও দাঁতের ডাক্তার

গদাধর পাঞ্জা। নতুন আলাপ হওয়ার পর এই এক সপ্তাহে দোলগোবিন্দ ডেন্টিস্ট বন্ধুটিকে লইয়া দুই দুইবার কাজলের কাছে আসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে যে পল্টুর আলাপ আছে কাজল তাহা জানিত না। কাজলকে দেখিয়া পল্টু দূর হইতে হ্যাট উঁচু করিল।

দোলগোবিন্দ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, অর্থ্ ইজ রাউণ্ড্ কথাটা ঠিকই দেখছি। আবার দেখা হয়ে গেল। (আর্থকে দোলগোবিন্দ বলেন অর্থ্।)

আটটা কেস। প্রথম দুইটায় ভণ্ডুলের কোন খবর ছিল না। তৃতীয় গাড়োয়াল কাপ, চৌদ্দ ঘোড়ার দৌড়। ক্যাপিটালিষ্ট ফেভরিট ঘোড়া, দ্বিতীয় ডি. পি. (ডেপুটি প্রিমিয়র), তৃতীয় ব্ল্যাক লেগ।

সমস্ত লোকের মুখে এক কথা, গাড়োয়াল কাপ হচ্ছে ওয়ান হর্স রেস, ক্যাপিটালিষ্টের। মধ্যে মধ্যে আর একটা ক্ষীণ অভিমতও শোনা যায়। দেখো, ডি. পি. এ রেসে পান্টারদের অবাক করে দেবে। ও হচ্ছে রব রয়ের বাচ্চা। ক্যাপিটালিষ্টের সমর্থকেরা জোর প্রতিবাদ জানায়, এ বাজী নেওয়া ওল্ড এ্যানিমাল ডি. পি.র কর্ম নয়।

মুস্তাফা একটা অলীক নাম। ভণ্ডুলকে ফতিমার খবর দিয়াছিল আশু দাস নামে ভবানীপুরের এক রেসুড়ে। সে বলিয়াছে আজ গড়োয়াল কাপে মহারাণী মাঠ ডুবিয়ে দেবে। টেলর সাহেবের মহারাণী। আমি সাহেবের নিজের কাছে শুনেছি।

মহারাণী জিতিলে মাঠ ডুবাইবারই কথা। তার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে অতি সামান্য। তাও প্লেসেই বেশী। মহারাণীর জয় জুয়াড়িদের কল্পনারও অতীত।

গেল.বার আশু দাসের খবর ঠিক হইলেও ভণ্ডুল টোটে মাত্র দুইখানি টিকিট কিনিল। কাজল কিনিল দশ খানা। বুক মেকারের কাছেও এক শ' টাকা ধরিল।

বেলা আড়াইটায় গড়োয়াল কাপের দৌড় আরম্ভ হয়। হাজার হাজার লোক মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রত্যেকে যেন দিগ্বিজয়ের জন্য ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাদের চোখে মুখে আশা ও আকাঙ্ক্ষার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

ঘোড়াগুলি মাঠের উত্তর-পূর্বে গেলে দেখা যায় মার্শাল সকলের আগে আগে ছুটিতেছে, পিছনে রাধেশ্যাম তার পর ডি. পি। মাঠময় সে কী উত্তেজনা, কী চীৎকার! মনে হয় অদূরে সমুদ্রে বাণ ডাকিয়াছে।

ভণ্ডুলের হাতে বাইনাকুলার ছিল। কাজল সেটা চাহিয়া নিয়া দৌড় দেখিতে লাগিল। প্রথমে নিচু গলায় শুরু করিল, বাক্-আপ্ মহারাণী, কাম্ অন্।

ঘোড়াগুলি আগাইবার সঙ্গে সঙ্গে তার গলা চড়িতে থাকে। উত্তেজনায় মুখ লাল হইয়া ওঠে—কাটা বেদানার মতন লালচে গোলাপী। কলরব ক্রমে বৃদ্ধি পায়, কাম অন ক্যাপিটালিষ্ট, বাক্-আপ্ ব্ল্যাক লেগ। কিল ডি. পি., পুস্ এসাইড। একটি লোক চোঙা মুখে দিয়া চেঁচাইতেছিল, কাম্ অন রোবি, কাম্ কাম্। (রোবি ক্যাপাটালিষ্টের সওয়ারের নাম)

মাত্র দেড় ফার্লং বাকী। এই সময় মহারাণীর সওয়াল টিলব্রিট ঘোড়ার মাথার উপর ঝুঁকিয়া জানোয়ারটার পেটের দুই পাশে হাঁটু দিয়া চাপ দেয়। কাজল চেঁচায়, মহারাণী, মহারাণী।

নিমেষের মধ্যে মহারাণী উল্কার মত উইনিংপোস্টএর সামনে দিয়া ছুটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ ওঠে, আঃ—আঃ—বিষাদ আর অবসাদে মিশানো এক অদ্ভুত শব্দ।

রেসারুদের মধ্যে তখনও সন্দেহ ছিল, কোন্ ঘোড়া দৌড়টা জিতিল, মহারাণী না ব্ল্যাক্ লেগ? কাজলের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে। ক্যাপিটালিষ্টের সমর্থকরা গালি দেয়, শালা রোবির কাণ্ড। ও মাঝে মাঝে এ রকম ডুবিয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে ক্যাপিটালিষ্টকে ঠিক নিয়ে আসতে পারত।

এই সময় কালো বোর্ডে নাম ওঠে, প্রথম হইয়াছে মহারাণী, দ্বিতীয় ব্ল্যাক লেগ, তৃতীয় মার্শাল। একটি প্রৌঢ় তার বন্ধুর কাছে দুঃখ করে, বোদে শালা বলেছিল আজ টিলব্রিট-মাউণ্ট জিতবে। নিদেন প্লেসেও আসবে। প্লেসেও যদি দুখানা টিকিট কিনতুম।

তার বন্ধু বলে, কিনলি নি কেন শালা? আমায়ও ত বলতে পারতিস।

প্রৌঢ় কহিল, বোদে বেটারছেলে যত বাজে খবর দেয় তাই কিনি নি। গেল হপ্তায় ও আমার দু'শ টাকা ডুবিয়েছে।

তার বন্ধু বলিল, তোর কি শালা দু'শ টাকা ছিল?

মহারাণী মোটা ডিভিডেণ্ড দেয়। টোটের দশ টাকার প্রতি টিকিটে সাত শ টাকা। এর পর বগড়িবাড়ি প্লেট। খবর না থাকায় ভণ্ডুল এই রেসে টাকা লাগাইল না। কাজল ট্যয়লাইটের দশ খানা টিকিট কিনিল। ভণ্ডুল বলিল, এ কি করলে? ট্যয়লাইট একটা আনসারটেন্ কোওয়ান্‌টিটি।

কাজল কহিল, নামটা পছন্দ হয়ে গেল। ট্যয়লাইট—গোধূলি, খাসা নাম।

এই সময় হারাধন ডাক্তার আসিয়া কাজলকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ঘোড়ায় টিকিট কিনব বল দেখি?

কাজল কহিল, আমি ত বলতে পারি না।

আগের দৌড়ে তুমি মাঠ লুটে নিলে। তখনও এই জবাব দিয়েছ। আমার বোঝা উচিত ছিল। যে জাতের যা স্বভাব—বলিয়াই ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

কাজলের মুখখানা ব্যথায় রক্তহীন হইয়া গেল। মুখের উপর সোজাসুজি চাবুক মারিলেও সে এতটা যন্ত্রণা বোধ করিত কিনা সন্দেহ।

ট্যয়লাইট দৌড়ে সব ঘোড়ার শেষে আসে। ভণ্ডুল বলে, আজ আর খেলো না। টাকা নিয়ে ওরকম ছিনিমিনি খেলতে নেই।

কাজল ম্লান হাসিয়া বলিল, টাকা ত তুচ্ছ। জীবনটা নিয়েই কী ছিনিমিনি না খেললুম! দেখলেন না হারু ডাক্তার কেমন বলে গেল?

ও কে?

ডক্টর হ্যারিডেন, হোমিওপ্যাথ। আগে সোনাবাগানে কিছু পসার ছিল। এখন নাকি বাইরেও জমিয়েছে।

হারাধন এইরূপ আঘাত না দিলে কাজল হয়ত আর কোন রেসেই খেলিত না। কিন্তু সে যেন নিজের উপর প্রতিশোধ লইতে লাগিল। খেলিল প্রত্যেক রেসে, প্রতিটিতেই হারিল। তবুও শেষ পর্যন্ত তার লাভ ছিল বেশ মোটা রকম।

সন্ধ্যার অল্প কিছু আগে রেস শেষ হয়। দু' চারটি ভাগ্যবান বাদে অধিকাংশ রেসাড়ুর মুখের উপর আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমা। অনেকেই নিঃসম্বল হইয়াছে। কারও কারও বাড়ি ফেরার ট্রাম বাসের ভাড়া পর্যন্ত নাই।

দুপুরের উত্তেজনার ফলে কাজল খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। তার ইচ্ছা বাড়ি ফিরিয়া যায়। কিন্তু ভণ্ডুল হোটেলে যাওয়ার প্রস্তাব করিল। কাজলের ইচ্ছা না থাকিলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হইল। তবে ভণ্ডুলকে দিয়া তার আগে একটা সর্ত করাইয়া নিল যে, আগামী সপ্তাহেও সে রেসের গোপন খবর জানাইবে।

গাড়ী একটা চীনা হোটেলের দরজায় আসিয়া থামে। বাড়ির সামনেটায় চীনা কারুকাজ, দুধারে দুটা ড্রাগন। জানালায় জানালায় রঙিন লণ্ঠন।

ভণ্ডুল এখানে সবার পরিচিত। দরজায় দরোয়ান তাকে সাদর অভ্যর্থনা

করে। নেপালী এক কিশোর ছুটিয়া আসিয়া মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিয়া বলে, বাণ্ডিল সাব।

ছেলেটির গায়ের রং পীত, হাসি হাসি মুখ, মুখখানা চাকার মতন। গোল দুটি চোখ দিয়া আনন্দ ও কৌতুক যেন ঠিকরিয়া পড়ে। হাসিলে সামনের বড় দুটি দাঁত দেখা যায়, তার মধ্যে একটুখানি ফাঁক। সে হাঁ করিয়া কাজলকে দেখিতেছিল। ভণ্ডুল তার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, ইউ ন্যটি জাং।

জাং বা জং বাহাদুর তাদের ভিতরে লইয়া যায়। কেবিনের মতন ছোট রুম। তিন দিক কাঠ ও রঙিন কাচে ঘেরা। এক দিকে দেওয়াল। মাঝখানে টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা, চার পাশে চারখানা চেয়ার।

ভণ্ডুল জং বাহাদুরকে বলিল, দোঠো ডিনর ঔর হুইস্কি দো পেগ।

কাজল কহিল, না ডিনার একটা আনান। আমার জন্য পটেটো চিপ্‌স্ আর ওমলেট।

জং একটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া যায়। শব্দটা 'বউ কথা কও'র মতন।

কাজল মুখ তুলিয়া কেবিনটাকে ভাল করিয়া দেখে। ডান দিকে বার্নিশ করা কাঠের উপর সুন্দর একখানি আয়না বসানো। দরজার বিপরীত দিকে সাদা দেওয়ালে মদের রঙিন বিজ্ঞাপন। চকচকে পোষাক পরা একটি হাইল্যাণ্ডারের সামনে টেবিলের উপর জনি ওয়াকারের বোতল; সেই দিকে চাহিয়া লোকটা পরম উল্লাসে ব্যাগ পাইপ বাজাইতেছে।

বাঁ দিকের ছবিখানা দৃষ্টি আরও বেশী আকর্ষণ করে। হোয়াং হো নদীর উপর ছোট ছোট অসংখ্য নৌকা। নৌকাগুলির এক একটিতে এক একটি করিয়া পরিবারের বাস। মাটির বুকে এই মানুষগুলার স্থান হয় নাই তাই তারা এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। তাদের জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই এই নৌকায়, সমাজ সংসার হোয়াংহোর জলের উপর। শিল্পী ছবির উপর দিয়া আড়াআড়ি একটা রেখা টানিয়াছেন, রেখাটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মত।

তীরে বিশাল নগর। লাখো লাখো মানুষের যেখানে বাস, হাজারো-কল কারখানা। দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ কলের ধোঁয়াই নদীর উপর আসিয়া ধূমকেতুতে পরিণত হইল নাকি?

কাজল দাঁড়াইয়া ছবিখানা দেখিতেছিল এই সময় দুই হাতে দুইখানা করিয়া ডিস লইয়া জং ভিতরে আসিল। তার পিছন পিছন আসিল চাপ-দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় একটি বয়। তার এক হাতে জনিওয়াকারের বড় বোতল, অপর

হাতে গুটি কয়েক পেগ। আলো পড়ায় তার নীল পাগড়ির উপরের সাদা চাকতিটা জ্বল জ্বল করিতেছিল।

ভণ্ডুল বলে, একঠো কড়া পেগ লাগাও। ঔর মেম সাবকো পেগমে জাস্তি সোডা, মুস্তাফা—

কাজল কহিল, আমার জন্যও বেশী সোডার দরকার নেই।

ভণ্ডুল আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের মুখে এই কথা শোনে নাই। সে অবাক হইয়া যায়।

বহুত আচ্ছা হুজুর—মুস্তাফা দুইটি গেলাসে মদ ও সোডা ঢালে। সোডা খুব কম। একবারও এদিক এদিক তাকায় না। ঢালা শেষ হইলে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়।

কাজল জিজ্ঞাসা করে, এই মুস্তাফাই কি মহারাণীর খবর দিয়েছিল ?

নো। সে স্কটের স্টেবল বয়, ট্রেনার জে. ডি. স্কট। কাম্, লেট আস্ ড্রিঙ্ক্ মহারাণীস্ হেল্থ।

পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকাইয়া তাহারা মহারাণীর স্বাস্থ্যপান করে। বয় আবার মদ দিয়া যায়।

আরম্ভ হয় ব্যাণ্ড। বাজনার তালে তালে পাশের একটা কেবিনে কে একজন টেবিল চাপড়ায়। একটা মদ্যপ সুর ভাঁজে, 'আই লভ ইউ'। সুর ভাঁজে আর কাঁদে।

চলে পেগের পর পেগ। তিনটা পেগের পর কাজল বলে, আপনারা আমাদের এত ঘেন্না করেন কেন ?

ভণ্ডুল বলে, ঘেন্না ?

হ্যাঁ, কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। দেখলেন না হারু ডাক্তার আমায় কি অপমানটা করে গেল ?—একটু থামিয়া কাজল আবার বলিল, অথচ একদিন উনিই আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলেন, তখন—তখন আমি এ রাস্তায় আসিনি। আচ্ছা দোষ কি শুধু আমার, আমাদের ? না আপনাদেরও ?

বলিতে বলিতে সে কেমন যেন উত্তেজিত হইয়া ওঠে। ভণ্ডুল জবাব দেয় না। কাজল মনের গতিবেগেই যেন বলিয়া যায়, দোষ আপনাদের, সমাজের। যারা সমাজ-ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের। অথচ সেদিন আমাদের পাড়ার চামেলীকে একটি ছোকরা বিয়ে করে নিয়ে গেল। ছেলেটি লেখাপড়া জানা, বাপ তার বড়লোক। সে একটা পতিতাকে বিয়ে করতে সাহস করল, কেন

না সে জানে তাদের সমাজ মেয়েটিকে গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে তারা কত উদার বলুন দেখি?

ভণ্ডুল বলিল, ছাটস ইট্।

কাজল তখন বলিয়াই চলিয়াছে, আর আমার সামান্য ত্রুটি মা ক্ষমা করতে পারলেন না। পারলেন না সমাজ-পতির ভয়ে, পাঁচজন আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনার জ্বালায়। অথচ সেই আত্মীয়রাই আজ আমার কাছ থেকে নানা রকম সুবিধে নিচ্ছে। এই যে আমার মেয়েকে হারিয়েছি সেও তাদেরই জন্য। যত সব নিচ স্বার্থপরের—বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

গেলাসের গায়ে তুষারকণার মত সোডার বুদ্বুদ লাগিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। দেখে আর কি যেন ভাবে। খানিকটা পরে বয়কে ডাকিয়া বলে, দোঠো পেগ লে আও।

ভণ্ডুল বলিল, আরও পেগ?

হ্যাঁ, আজ আপনার স্বাস্থ্যপান করব। আগেই করা উচিত ছিল। ভুল হয়ে গেছে।

আমার এতটা সৌভাগ্য!

এ দিনটা যে বিশেষ করে আপনার। মহারাণীর টাকা, সে ত আপনারই জন্য।

ভণ্ডুল বলে, ও ডিয়ার ডিয়ার।

আবার হুইস্কি সোডা আসে। কাজল গেলাস তুলিয়া বলে, ইওর হেল্থ। মদটা ধীরে ধীরে খায়। পেগ নিঃশেষ হওয়ার আগেই শুরু হয় এক নূতন অনুভূতি। এমনটি কখনও হয় নাই। তার মাথা ঝিম ঝিম করে। গেলাসের রঙিন তরল পদার্থের মধ্যে চারুর মুখ ভাসিয়া ওঠে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী চারু তার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

কাজলের মনে পড়ে কাচের বলের মতন কড়িকাঠ হইতে তার দেহের দোল খাওয়ার কথা। তার হাত একটু একটু কাঁপে। মুখ কাগজের মতন সাদা হইয়া যায়।

ভণ্ডুল জিজ্ঞাসা করে, হোয়াটস্ ইট্?

কাজল কোন জবাব করিতে পারে না। তার মনে হয় কে যেন ভিতর হইতে জিভ টানিয়া লইতেছে। জিভ নয় যেন একখণ্ড শুকতলা।

চারু রাগ করিলে সে হয়ত সহ্য করিতে পারিত কিন্তু এ হাসি—এ যে বড় নিষ্ঠুর! তুহিন প্রবাহের মত তার বুকে যাইয়া বিঁধিতে থাকে।

কাজল রেসের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। মঙ্গলবার ভোরে উঠিয়া খবরের কাগজে আগামী রেসের ঘোড়ার তালিকা পড়ে। বৃহস্পতিবার পড়ে ট্রাক নোট। সপ্তাহের শেষের তিনটা দিন ঘোড়দৌড়ের আলোচনায় কাটিয়া যায়। পাঁচখানা রেসিং গাইড ও খবরের কাগজ মিলাইয়া দেখে, ঘোড়ার ওজন কষে, আলোচনা করে ঘোড়ার কুলজি (পেডিগ্রি) ও পূর্ব ইতিহাস লইয়া।

শনিবার মাঠে যাইয়া টোটের টিকিট কেনে, বুকমেকারের কাছে টাকা লাগায়। তাছাড়া প্রাইভেট বুকিদের কাছেও খেলে। দৌড়ের সময় তার চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে অদ্ভুত উত্তেজনা। পল্টু বলে, তুমি দেখছি জাত রেস্‌ড়ে। তোমার বাবাও রেসাড় ছিলেন বুঝি ?

কাজল বলিল, জাত রেস্‌ড়ে, জাত মাতাল—হলেম অনেক কিছুই। কিন্তু আমার বাবা জীবনে রেসকোর্স দেখেন নি। তামাক ছাড়া তাঁর আর কোন নেশা ছিল না।

তুমি রাগ করলে দেখছি আণ্ট্‌।

না, রাগ আমি করি নি। আমায় ভণ্ডুল সাহেব কি বলে জান ? আমি লোভী, আমার জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোভ।

পল্টু কোন উত্তর করে না। কাজল বলে, লোভী হয়ত ঠিকই।

মাঝে মাঝে তার নিজেরও মনে হয় কথাটা সত্য। দেহসম্ভোগের লোভ তাকে ধূপগঞ্জ হইতে কলিকাতায় টানিয়া আনিল। রেসে মোটা লাভের লোভ দেখাইয়া ভণ্ডুল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিল। অত বিরক্তি সত্ত্বেও কাজল তাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না।

ভণ্ডুল কলিকাতায় নাই, নাচের দল লইয়া লঙ্কায় গিয়াছে। আজকাল কাজলের রেসের সঙ্গী পল্টু! সেও বে-হিসাবী খেলোয়াড়, তার ঝোঁক মোটা লাভের দিকে। ফ্লুকে খেলিয়া বড়মানুষ হইতে চায় অথচ একটা গোপন খবরও সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে লোকসান দেয় প্রচুর।

কাজলও হিসাব করিয়া খেলে না। তবে ভবানীপুরের আশুবাবুর মারফৎ টেলর সাহেবের ঘোড়ার খবর পাইয়া মধ্যে মধ্যে মোটা লাভ করে। তাহাতে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়।

কাজল তাকে চেনে না। ভণ্ডুলের কাছে শুধু নাম শুনিয়াছে। সে আশুর দেওয়া খবর সোনাবাগানের কোকেন-গদাইর নিকট হইতে সংগ্রহ করে।

বিনিময়ে গদাইকে দরকার মত পাঁচ দশ টাকা সাহায্য করিতে হয়। তা ছাড়া গদাই শপথ করাইয়া লইয়াছে যে খবর আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না।

হার জিত যাহাই হউক না কেন রেসের পর আসে অবসাদ। কাজল তখন প্রচুর মদ খায়—কোন দিন হোটেলে, কোন দিন বা বাড়ি ফিরিয়া। জিতিলে আর পাঁচটি মেয়েকে খাওয়ায়। পাড়ায় দিন দিনই তার মান বাড়িতে থাকে। এবারেও সে বারোয়ারী পূজা কমিটির সেক্রেটারী হয়। পর পর সেক্রেটারী এই তিন বৎসর।

সে পূজায় শহরের এক নামী থিয়েটার আনাইল, বিখ্যাত যাদুকর পিটার পল বিশ্বাসের ম্যাজিক দেখাইল।

কাজল মনে মনে হাসে। সে জানে এ তার রূপের পুরস্কার; পুরস্কার সুঠাম কোমল দেহের। এই দেহকে যেমন সে ভালবাসে ইহা লইয়া গর্বও তার তেমনি। এক একদিন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রেমিকের মতন নিজের গায়ে হাত বুলায়। কখনও ঝরা পালক ঘষে। মনে তখন জাগে এক অপূর্ব শিহরণ।

এই রূপ লইয়াই আবার একদিন আসিল তীব্র আঘাত।

মন্ত্রী কহিলেন, ওত বেশ্যার শরীর, মোজাইকে তৈরি নর্দমার মতন।

ব্যাপারটা এই। বাজেট সেসনের সময় মন্ত্রীর অনুরোধে কাজল আইন সভায় কয়েকটি সদস্যকে কোন বাগান বাড়িতে ভুলাইয়া আটক রাখে। তাদের মধ্যে দুজন তার চেনা। একজন নাম ভাঁড়াইয়া আসিত। কাজল তাকে জানিত কাঙালী শ্রীমানী বলিয়া। সেদিন শুনিল, লোকটির আসল নাম বিলোচন।

অপর একজন তাকে সম্বোধন কহিল, 'ইওর এক্সেলেন্সী'। কাজল তার মুখের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, আপনি সুরথ-বাবু না?

সুরথ কহিল, যাক্ তবু চিনেছ।

বিলোচন জিজ্ঞাসা করে, এক্সেলেন্সী নামের কোন ইতিহাস আছে বুঝি?

সুরথ কহিল, হ্যাঁ আমি আর আমার এক বন্ধু ওকে বলতাম হার এক্সেলেন্সী, তখন সবে বিলেত থেকে এসেছি।

দুপুর হইতেই হৈ হল্লা চলে। বৈকালে বাবুদের অবস্থা হয় ঝোড়ো

কাকের মতন। সন্ধ্যার কিছু আগে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বিলোচন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, গ্যাড, এ যে দেখছি ভোটের সময় এসে পড়ল। ওঠো ব্রাদাররা।

কাজল বলিল, মাইরি আর কি ?

বিলোচন বলে, নো নো থাকা অসম্ভব। ডিউটি ফার্স্ট, ডিউটি লাস্ট—

কাজল তার গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। বলে, হবে না ডার্লিং, যাওয়া তোমার হবে না।—বলে আর বিলোচনের টাকে হাত বুলায়।

ছাড়, ছাড়, গলায় ফাঁস লাগল যে—বলিয়া বিলোচন আবার বসিয়া পড়িল।

প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গেই কাজলকে সেদিন নানা ছলাকলা করিতে হইল। করিতে হইল প্রেমের অভিনয়। তার ঘৃণা ধরিয়া গেল। পরদিন মন্ত্রীকে বলিল, এদের নিয়ে আপনারা দেশের আইন করেন ?

মন্ত্রী বলেন, সব দেশেরই এই এক চেহারা। মানুষ আছে দু'চার জন, তা' ছাড়া সবই বিলোচনের দল।

সেদিন আইন সভায় সরকার পক্ষের জয় হয় কাজলের জন্য। মন্ত্রীর নিকট সে প্রতিশ্রুত পুরস্কার চায়। মন্ত্রী বলেন, তোমার মেয়েকে শীগ্‌গিরই আমি অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু কাজে কিছুই করেন না। কখনও বলেন, আর দু'দিনের সময় দাও। একবার বম্বে থেকে ঘুরে আসি।

বম্বে, হিল্লী, ডিল্লী, অনেক জায়গায়ই ঘোরেন। মীনার ব্যবস্থা করার সময় আর পান না। কাজল চাপ দিলে একটু আদর করিয়া বলেন, আমায় অবিশ্বাস করছ হনি ?

কাজল বলে, না তা করব কেন ?

এই ভাবে কাটে কয়েক মাস। একদিন প্রিয় পরামর্শ দিল, তুই শনির শিন্নি দে। মন্ত্রী ত মন্ত্রী, ওতে তুষ্ট হয় সব দেবতা। কাঁচা শিন্নি দিস কিন্তু, খেতেও ভাল।

কাজলের পয়সা আছে। মোটর করিয়া আসে। আশ্রমে টাকা দেয়। আসিলেই প্রত্যেককে খাবার খাওয়ায়। প্রতিবারই পঙ্কজের প্রিয় ফিস ফ্রাই লইয়া আসে। এই সব কারণে তার যাতায়াত সম্পর্কে এখন আর কোন

ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। মা ও মেয়ের কথাবার্তার সময় পঙ্কজ আর আগের মত পাহারা দেন না। তবুও মীনা এখানে থাকিতে চায় না। ঘন ঘন তাগিদ দেয়, আমায় নিয়ে চল।

কাজল বলে, পঙ্ক মাসী তোকে অত যত্ন করে, অত ভালবাসে তবু তুই যেতে চাস কেন বল্ দেখি?

মীনা উত্তর দেয়, তুমি যে মা।

আর একদিন। মীনা তাকে কি যেন বলিতে চায় লক্ষ্য করিয়া কাজল কহিল, কি ভাবছিস? বলবি কিছু?

আমতা আমতা করিয়া মীনা প্রশ্ন করে, তুমি কি মা?

তার মানে?

তুমি খুব খারাপ? ওরা বলে তুমি না কি বেশ্যা। সে কি মা?

ঠিক এই সময় পঙ্কজ আসিয়া পড়িলেন। শেষের কথা কয়টি তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, কে বলেছে এ সব?

তার মাকে নিন্দা করার জন্য মীনা বেশ একটু রাগিয়াছিল। সে কহিল, নাগিন দি, চিনি দি আর ধনিমাসী।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া পঙ্কজ কহিলেন, একধার থেকে মাগীগুলোকে সব চাব্‌কে দেব না?—বলিয়াই তাঁর মনে হইল কাজলের সামনে এতটা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ভুল করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুর নরম করিয়া লইলেন, খুব কড়া করে ধমকে দেব ওদের। আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস কাজল দেবী।

কাজল বোঝে মনে করার এখন আর কিছু নাই। অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ। মীনা জানিয়াছে সে বেশ্যা। এই নারীর দল বেশ্যা যে কি বস্তু তাহাও নিশ্চয়ই তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। আসার সময় পঙ্কজের হাত ধরিয়া কহিল, ওদের আপনি কিছু বলবেন না যেন।

পঙ্কজ ত অবাক্।

কাজল সেই দিনই মন্ত্রীকে ফোন করে। মন্ত্রী কতগুলি ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। তিনি তিক্তকণ্ঠে কি যেন বলিলেন, সাধারণতঃ এরূপ বলেন না। কাজলও কড়া জবাব দিল। মন্ত্রী গর্জিয়া উঠিলেন, কী, কি বললে?

বললুম, আপনি মিথ্যাবাদী।

এত বড় আস্পর্ধা তোমার, সোসাইটির ড্রেন। আমার বাড়ির মোজাইকের নর্দমার সঙ্গে তোমার তফাত কি ?

কাজল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তার হাত কাঁপে, রিসিভারটা হাত হইতে পড়িয়া যায়।

মাস কয়েক পরের কথা। সোনাবাগানে পর পর কয়েকটি খুন হইয়া গেল। মাঝে মাঝে আকাশে যেন ধূমকেতু ওঠার পালা পড়িয়া যায়, পতিতা-পল্লীতেও এক এক সময় সেইরূপ খুন জখমের মরশুম পড়ে।

এবার প্রথমে খুন হয় বেদানা। কাজল যখন কলিকাতায় একেবারে নূতন, এই মেয়েটি তখন ছিল প্রমীলার ভাড়াটে। তার কাছে তার সেলাইয়ের কলে কাজল সেলাই শেখে। বেদানা কৃপণ প্রকৃতির মানুষ, সম্প্রতি বাড়িওয়ালী হইয়াছিল। বাজারে গুজব তার সিন্দুকে নগদ অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা আছে।

একদিন দেখা গেল ঘরের মধ্যে তার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দুর্বৃত্তেরা শ্বাসরোধ করিয়া তাকে হত্যা করিয়াছে। এর পরই হয় জোড়া খুন, এক রাত্রে দুই বাড়িতে দুইটি পতিতা। উভয়েরই কণ্ঠনালী কাটা। অপরাধগুলি একই ধরনের। দুর্বৃত্তেরা কোন নারীর কাছে দু'চার দিন যাতায়াত করে। মোটা টাকা খরচ করিয়া তার বিশ্বাসভাজন হয়। তারপর এক দিন মদ খাওয়াইয়া হতভাগিনীর অচেতন অবস্থায় তাকে খুন করিয়া টাকাকড়ি গহনা পত্র লইয়া সরিয়া পড়ে।

পাড়াময় সে কী বিভীষিকা! মেয়েদের চোখে মুখে ভীতির ছাপ। অচেনা পুরুষের সঙ্গে তারা রাত্রি বাস করে, তাদের দেহ দান করে। সবই দু-মুঠা ভাতের জন্য। আর সেই পুরুষ ঘুমের মধ্যে গলায় ছুরি বসায়।

খুন-জখম হইল অনেকগুলি, কিন্তু আসামী ধরা পড়িল মাত্র দুই জন। এক জনকে ধরিল দোপেঁয়াজি, অপরটিকে পাম-ওলিভ। লোকটা তার গলায় ছুরি ছোঁয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পাম-ওলিভ তাকে জাপটাইয়া ধরে। তার হাত কামড়াইয়া নেয়। যন্ত্রণায় লোকটা চেঁচাইতে থাকে, ছাড়্ ছাড়্, তুই আমার মা হ'স। মা দিদিমা ঠাকুমা। এর চেয়ে বরং পুলিস ডেকে ধরিয়ে দে।

এই চীৎকার শুনিয়া আর পাঁচ জন আসিয়া লোকটাকে ধরিয়া ফেলে।

পাড়াময় নাম পড়িয়া গেল। সবাই বলিল, মেয়ে বটে পাম-ওলিভ। অমন সোঁদর যেন ননীন পুতুল কিন্তু গায়ে কী জোর!

পুলিস একটা আসামীও ধরিতে পারে না, কিন্তু শান্তি-রক্ষার ওজুহাতে গলিতে বেপরোয়া জুলুম চালায়। সন্ধ্যার পর যাকে দেখে তাকেই গ্রেপ্তার করে। টাকা পয়সা ঘড়ি চেন আংটি দিয়া ভাগ্যবানেরা সঙ্গে সঙ্গে খালাস পায়। যারা পুলিসকে খুশি করতে পারে না, তাদের ভাগ্যে জোটে হাজতবাস। সাজানো অভিযোগে লাঞ্ছনার এক শেষ হয়।

পুলিসের ভয়ে সোনাবাগান ফাঁকা হইয়া গেল। বাঁধা-বাবুরা ছাড়া কেহ আসে না, তারাও আসে সন্ধ্যার আগে। রাত্রে রোয়াকে রোয়াকে দালালরা আড্ডা দেয় না, পানওয়ালার দোকান বন্ধ থাকে। পথের দিকে চাহিলে মনে হয় স্বপ্নপুরী, এই পুরীর অধিবাসী শুধু ঐ গ্যাসগুলা। কিছুটা দূরে দূরে দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ এক একটি অভিসারিকা যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুধারের বাড়ির সদর দরজায় খিল পড়ে। ভিতরে বসিয়া মেয়েরা লুডো খেলে, দশ-পঁচিশ খেলে। বসে তাসের বৈঠক।

কখনও হয়ত একটি পাহারাওয়ালা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একতলার কোনও অধিবাসিনীর গঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেয়। পরস্পর পান ও খৈনির বিনিময় হয়। খৈনি টিপিতে টিপিতে পাহারাওয়ালা বলে, ঔর থোড়া চুনা দেও, ভেঁইয়া।

একবার হয়ত বা মেয়েটির হাত টিপিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বেসুরো গলায় গান ধরে, বিরহের গান। তার কল্পনানেত্রে ভাসিয়া ওঠে কাঁচুলি পরা প্রিয়ার রূপ। প্রিয়া সুদূর বিহার কি যুক্তপ্রদেশে কুয়া হইতে জল তুলিতে তুলিতে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কাপড়ের ফাঁক দিয়া তার বুকের কিছুটা অংশ দেখা যায়। সেই কথা মনে করিয়া বিরহী পাহারাওয়ালা গানের মধ্যেই চেঁচাইয়া ওঠে, মেরা ভেঁইয়া।

পল্লীর দুরবস্থার কথা উঠিলেই কুসুম বলে, এ রকম আরও ক'বার হয়েছে। প্রথম যখন হয় তখন পেয়ারি ময়রার ছেলে আমার ঘরে আসত আর আসত বেচু পালিত। সেই সময় একটা বাবু মেয়েমানুষকে গুলি করে মারলে। বাবু থাকত বোম্বাইয়ে, এসে দেখে মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য লোক বসায়।

টম্যাটোও তার বাঁধা বাবুদের এই ভাবে প্রতারিত করে। সে বলিল, এ্যাঁ, মারলে! খুন করলে?

কুসুম কহিল, করবে না? বাঁধা যে!

বাবু ধরা পড়েছিল?

নিজেই গিয়ে সে থানায় ধরা দিলে। বললে, ধর্মাবতার আমি দুষী।

টম্যাটো বলিল, ফাঁসী হ'ল?

না, দশ বছরের পুলিপোলাও।

অনিলা প্রশ্ন করিল, সে আবার কি?

দ্বীপান্তরি।

টম্যাটো কহিল, একটা মানুষ মারলে আর ফাঁসী হয় না?

কুসুম কহিল, রাগের মাথায় খুন করলে ফাঁসী হয় না। দিদিমা কুমকম বলেছে। অনেক জজ মাজেষ্টর তার বন্ধু ছিল ত।

দিনের পর দিন মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া ওঠে। যাদের জীবন-যাত্রা নিত্যকার আয়ের উপর নির্ভর তাদের দিনই চলে না। কারও সোনা দানা বন্ধক পড়ে, কারও থালা বাসন। সুবালা একদিন কয়েকটি টাকা ধার চাহিতে আসিলে কাজল চারটি টাকা দিয়া কহিল, হাতে বিশেষ কিছু নেই, এখন এই নিয়ে যা।

সুবালা বলিল, তোর হাতে টাকা নেই, সে কিরে? লোকে বলে ইচ্ছে করলে তুই বাড়িউলি হতে পারতিস।

কাজল কহিল, আমার হাতে কিছু থাকে না ভাই।

সুবালা বলে, ঘোড় দৌড়ে তা হ'লে লাভ নেই বল্। রসি ঠিকই বলছিল।

কি বলছিল?

বলছিল, কাজল ডুবল বলে। ও ত এ পাড়ার মেয়ে, ঘোড়ার নালের তলায় কত রাজা রাজড়া পিষে ম'ল। শুনে বাস্তু ঘুঘু অমনি বলে উঠল, রুদোগড়ের না কোথার রাজপুত্তুর তার কাছে আসত, রেসে হেরে সে হাওড়ার পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কুসুম কহিল, পিরমিল ত? তার কাছে আবার রাজপুত্তুরও।

কাজল কহিল, সে ভয় নেই, আমার কাছে রাজপুত্তুর কেউ আসে না।

কাজলের আয় প্রচুর, ব্যয়ও তেমনি। রেস, মদ, মীনার জন্য খরচা এসব ছাড়াও নানা রকমে টাকা বাহির হইয়া যায়। সে হিসাব নিকাশ করে না,

ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। হাতে কিছু নাই, সম্বলের মধ্যে শুধু কুসুমের কাছে টাকাটা। রসবতীর মন্তব্য শুনিয়া কাজল এই সব কথাই ভাবিতেছিল। সুবালা বলিল, তুই রাগ করলি না কি ভাই ?

কাজল বলে, না, রাগ করব কেন ?

এর কয়েক দিন পরে পুলিস একটি ভদ্রলোককে ধরিয়া আনে। তার গায়ের রং কালো, পরনে খাদির ধুতি পাঞ্জাবী, যেমন মিহি তেমনি ধবধবে পরিষ্কার। সঙ্গের জমাদার কাজলকে জিজ্ঞাসা করে, ই বাবুর সাথ তুমার চিন্ পছন্ আছে ?

কাজল বলে, হ্যাঁ ওঁকে চিনি। উনি মাঝে মাঝে আসেন।

মাজে !—জমাদার বিস্ময় প্রকাশ করে। তার পর বলে, বাবু কইলো, তুম্ উনার বান্দা আছে।

বাবুটি এবার গম্ভীর ভাবে অন্যদিকে তাকান। জমাদার বলে, ইন্‌কা নাম কেয়া হ্যায় ? নাম ঔর পত্তা ?

কাজল ইতস্ততঃ করে। জমাদার বলে, তব্‌ ত বাবুকো থানেমে লিয়ে যাইতে হোবে।

কাজল কহিল, তুমি একটু দাঁড়াও সাহেব। আমি তোমাদের উপেন বাবুকে ফোন করে দিচ্ছি। তিনি থানা অফিসার না ?

জমাদার মধ্যে মধ্যে কাজলের কাছে টাকা পায়, দোল দুর্গোৎসবের পার্বণী। সে কহিল, ঠিক হ্যায়।

কাজল ফোনে উপেন বাবুকে বলিল, আপনার লোক অন্নদা বাবুকে ধরেছে। অন্নদা বাবু আলিপুরের উকিল, এম. এল. এ। হ্যাঁ আমাদের গলিতে।

উত্তরে থানা অফিসার কি বলিলেন, কাজলই জানে। সে জমাদারকে বলিল, ফোন ধর। বড় বাবু তোমাকে ডাকছেন।

ফোনে থানা অফিসারের সঙ্গে জমাদারের কথা শেষ হইলে কাজল জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন ?

ঠারতে বলছেন। বলিয়া জমাদার অন্নদার দিকে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

কাজল বলিল, তিনি আসবেন বুঝি ?

হোবে—জমাদার বাহিরে বারান্দায় যাইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে।

একটু পরে থানা হইতে আসিল একটি ছোকরা অফিসার। বয়স কুড়ি বাইশ। তার চেহারা, গায়ের রং এমন কি হাত ফিরাইবার ভঙ্গী পর্যন্ত

পাঁচুর মতন। যেন তারই এক তরুণ সংস্করণ। কাজল একদিন তাকে পুলিস আদালতে দেখিয়াছিল আবার দেখিল আজ।

সে ভাবে পাঁচু কি তাকে কখনও ছাড়িবে না? ছায়ার মত পিছু পিছু চলিয়া প্রতি পদক্ষেপে তাকে লাঞ্ছনা দিবে? এ কে? পাঁচুর ত সন্তান নাই, ছোট ভাই নাই। তবে?

যুবকটিও একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। তার পর অন্নদা বাবুকে বলে, মাফ করবেন। ওরা না জেনে আপনাকে ধরেছে। ও. সি. নিজেই আসছিলেন। এই সময় ডি. সি. এসে পড়লেন।

কে, জোন্স?

না, মিস্টার গুপ্‌টা। আপনি এখানে থাকবেন, না বাড়ি যাবেন?

থাকব বলেই ত গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি।

গাড়ি আমি আনিয়ে দিতে পারি।

তা হলে দিন। আজ আর থাকব না ভাবছি।

কিছুক্ষণ পরে অন্নদা চলিয়া গেলে কাজল অফিসারটিকে বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

কি?

কাজল আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনার বাড়ি—?

শোভনায়? ধূপগঞ্জ শুনেছেন? তার কাছে।

ওঃ।

নাম জানেন না কি?

কাজল বলে, ধূপগঞ্জ নাম করা জায়গা।

শোভনা গণেশের শ্বশুর বাড়ি। কাজলদের গ্রামের ভরত বাবুর বোন কদমের সেখানে বিবাহ হইয়াছে। সে কাজলের চেয়ে অনেক বড়, প্রায় পাঁচুর বয়সী হইবে। কাজল পাঁচুর কাছে তার অনেক গল্প শুনিয়াছে, তাদের ঘনিষ্ঠতার গল্প। বলিতে বলিতে পাঁচু কখনও বা উল্লসিত হইয়া উঠিত—কদম যা একখানা মেয়ে মাইরি!

কাজলের আরও মনে পড়িল পাঁচুর সেই কথা—যারা আমার ভালবাসা পেয়েছে তাদের সবারই বরাত খুলে গেছে।

এই যুবাও হয়ত সেই সৌভাগ্যেরই একটা ফল। সম্ভবতঃ সেও তার নাম জানে—জানে তার বহু কুৎসা।

অতীতের সঙ্গে সম্পর্কটা কিছুতেই ঘুচিল না। পতিতাদের কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হয় না। কাজল মনে করে, এ তার দুর্ভাগ্যের আর এক দিক।

পরের দিন সারা কলিকাতায় রটিয়া গেল, এসেম্ব্লির জাঁদরেল বক্তা বিখ্যাত উকিল অন্নদা বড়াল গতরাত্রে সোনাবাগানে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছেন। থানায় তাঁর লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে।

জনসাধারণ অন্ততঃ এক দিনের জন্য পুলিসকে বাহবা দিল।

সোনাবাগানে খুন জখম বন্ধ হইয়াছে। পুলিসের উৎপাতও আগের চেয়ে কম। এই সময় একদিন স্যুটকেস হাতে একটি যুবা কাজলের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। স্যুটকেসের সঙ্গে চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বাঁধা শতরঞ্জি। চেহারা সুন্দর, ফরসা ছিপ ছিপে, ছেলেটি কাজলের সমবয়সী, হয়ত বা কিছু ছোটই হইবে।

সাধারণতঃ বাক্স বিছানা সমেত এ পাড়ায় কেহ আসে না, তাকে দেখিয়া মনে হয় সদ্য আগত কোনও যাত্রী ট্রেন হইতে নামিয়া মুসাফের খানার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কাজল জিজ্ঞাসা করে, কাকে চাই?

যুবক বলিল, আপনার নাম কাজল?

কাজল বলিল, হ্যাঁ।

আমি আপনার কাছেই এসেছি।

কোথেকে আসছেন?

পাঠিয়েছেন সাধন বাবু। কবি সাধন।

তিনি না জেলে?

সম্প্রতি তিনি আমাদের গ্রামে অন্তরীণ হয়েছেন।

ভিতরে আসুন। তিনি অন্তরীণ হয়েছেন কোথায়?

সে এক অজ পাড়াগাঁ, বলিয়া আগন্তুক ভিতরে ঢুকিয়া মেজের ম্যাটিনের উপর চাদর ও শতরঞ্জি রাখে। বোঝা যায় নিজের গ্রামের নাম বলিতে সে অনিচ্ছুক। কাজলের সন্দেহ হয়। সে প্রশ্ন করে, তিনি পাঠিয়েছেন কেন?

পাঠিয়েছেন বললে মিথ্যে বলা হবে। তাঁর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। কলকাতায় আমার চেনা কেউ নেই তাই এখানে পৌঁছে আপনার বাড়ির কথাই প্রথমে মনে হল।

এখানে ওঠার কথা ! যাক্ আপনি বসুন। আমি সন্ধ্যে দীপটা দিয়ে নি।

ঘরে ইলেকট্রিকের আলো আছে। কাজল তবু প্রতিটি সন্ধ্যায় ঠাকুরের সামনে তেলের আলো জ্বালে, শাঁক বাজায়।

আগন্তুক এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘরখানাকে ভাল করিয়া দেখে। জিনিসে জিনিসে ঠাসা—খাট আলমারি চেয়ার শ্বেতপাথরের টেবিল। একধারে তাকের উপর দশ বার জোড়া দামী জুতা, চপ্পল কট্‌কি-চটি হাই-হিল সু নানা রংয়ের, নানা প্যাটার্নের। আলনায় দামী শাড়ী শেমিজ ব্লাউজ ঝুলিতেছে। দেয়ালে নগ্নচিত্র, তারই মাঝখানে ক্রুশলগ্ন এক কিশোরীর ছবি।

বিপরীত দিকের দেয়ালে চকলেট রংয়ের পর্দা ঝুলিতেছে। পর্দাটা বাতাসে নড়িলে নিচ হইতে সোনালী পাড়ের মতন কি যেন উঁকি মারে। বোধ হয় কোন ছবি বা আয়নার গিল্‌টি করা ফ্রেমের অংশ।

যুবকের মনে কৌতূহল জাগে।

ঠাকুর-নমস্কার শেষ করিয়া কাজল নবাগতকে জিজ্ঞাসা করিল, সাধনবাবু আছেন কেমন ?

ভালই।

তাঁর নতুন কোন বই বেরিয়েছে ?

হ্যাঁ, সন্ধ্যাদীপ। এখানারও নাম হয়েছে খুব।

কাজলের মুখখানা প্রসন্ন হয়। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি চান ?

এখানে একদিন থাকতে চাই।

থাকতে ! এ পাড়ায় ত রাত্তিরে কেউ থাকে না। মেয়েরাও রাখে না খুনখারাপির ভয়ে।

কিসের ভয়ে ?

খুন খারাপি। মাস দুই আগে কটা খুন হয়ে গেছে। সেই থেকে বেশ কিছুদিন পুলিসের উৎপাতও চলেছে।

যুবক নিচের ঠোঁটের উপর ডান হাতের তর্জনী দিয়া বার বার আঘাত করে। খানিকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটিয়া যায়। তারপর বলে, এখন উপায় ! আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। অথচ কাজের জন্য আমার বাইরে থাকা দরকার; অন্ততঃ কয়েকটা দিন।

ওঃ, আপনি স্বদেশী বুঝি ?

যুবকটি কোন উত্তর করে না।

কাজল এই মৌনের অর্থ বোঝে। ভাবে, কি করা যায়? যুবকটিকে রাখিবে, না পত্রপাঠ বিদায় করিয়া দিবে? তার মনে পড়ে গোরার কথা, সে স্বদেশী করিয়া পুলিসের বিদ্বেষভাজন হইয়াছে। সাধনবাবুও হইয়াছেন। কাজল জিজ্ঞাসা করে, থাকবেন কদিন?

যুবক বলিল, চার পাঁচ দিন, বড় জোর এক হপ্তা।

বেশ, থাকুন।

যুবক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। কাজল বলে, আপনি ত ট্রেন থেকে সরাসরি এখানে এসেছেন। আপনার জন্য কিছু খাবার আনাই?

না। রাত্রের খাবার আমি খেয়ে এসেছি।

চা, পান, সিগ্রেট?

ওসব কিছু খাই না।

চাও নয়?

না।

একটু পরে কাজল বাহিরে যাইয়া বাড়ির আর পাঁচ জনকে শুনাইয়া শুনাইয়া চাকর লখিয়াকে ডাকিয়া বলিল, বাবুর জন্য পান সিগ্রেট আর বিয়ার নিয়ে এস। বিয়ার ছুটো, চাবি মার্কা।

লখিয়া বিয়ার পান সিগারেট আনিলে কাজল বলিল, বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে ঢেলে দাও।

লখিয়ার সামনেই আগন্তুক গেলাস তুলিয়া লয়। লখিয়া চলিয়া গেলে ছু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। যুবক একটু হাসিয়া বলে, খাসা অভিনয় করলেন যা হ'ক। যাক শেষ পর্যন্ত আমায় রাখতে রাজী হলেন যে?

কাজল বলিল, হলুম টাকার জন্য। দিতে পারবেন ত?

হয়ত পারব। চার্জ বেশী হলে পালিয়ে যেতে হবে।

সে জানে কাজল মিথ্যা বলিতেছে। টাকার জন্য তাকে রাখে নাই। কাজল নিজেও তাহা জানে।

একটি স্বদেশীওয়ালাকে (খুব সম্ভব খুনে বা ডাকাত হইবে) গোপনে আশ্রয় দেওয়ার পিছনে খানিকটা আদর্শবাদিতা আছে আর আছে বিপদের আশঙ্কা। এই অজানা আশঙ্কা কাজলের চোখে জিনিসটাকে রঙিন করিয়া তোলে। যুবাটিকে রাখিতে কাজল রাজী হয় সেই জন্য। তা ছাড়া জীবনের এক-ঘেয়েমিতে বিরক্তিও ধরিয়া গিয়াছিল।

শিকারীর তাড়া খাইয়া বনের পশুর যে অবস্থা হয় তরুণটির অবস্থাও তখন সেইরূপ। ভারী ক্লান্ত। একটু পরেই সে মেজেয় শুধু ম্যাটিনের উপর নিজের শতরঞ্জি ও চাদর বিছাইয়া লয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়ে। ওঠে পরদিন ভোরে।

গত রাত্রে কাজল লক্ষ্য করে নাই, আজ দেখে বাহিরে যাওয়ার সময় যুবকটি খোঁড়াইতেছে। তার হাঁটুর নিচে ব্যাণ্ডেজ।

আগন্তুক মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিল, এই পাঁচটা টাকা নিন। এই দিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। একটু গরম জলও চাই কিন্তু—ঘা'টা ধোয়াবার জন্য।

ওটা হল কি করে?

কাজলের কথা যেন শুনিতে পায় নাই এই ভাবে যুবক প্রশ্ন করিল, পাঁচ টাকায় হবে?

আপনি মাছ মাংস খান?

খাই সবই।

তা হ'লে কিন্তু পাঁচ টাকায় কুলুবে না।

বেশ, আরও বেশী পাবেন। শেষটায় টাকা পয়সার হিসেব দিতে হবে কিন্তু—বলিয়া যুবক হাসে। এক ধরনের হাসি থাকে যাহা মুহূর্তে অপরের বিশ্বাস অর্জন করে, পরকে আপন করিয়া লয় এই হাসিটুকু সেইরূপ অনাবিল মনের স্ফূর্ত প্রকাশ।

কাজলও হাসিয়া বলিল, পুরুষ মানুষকে সংসার খরচা নিয়ে কি করে ঠকাতে হয় আমরা মেয়েরা তা ভালই জানি।

অন্ততঃ আপনি তা জানেন না। শুনেছি ত সাধনবাবুর কাছে।

তিনি আমার বিষয়ে অনেক বাড়িয়ে বলেছেন দেখছি। যাক্ আপনাকে ডাকব কি বলে?

আমার নাম হারীত।

লম্পট মন্তুপে, রঘু ননীগোপালে, দালাল ও বাড়িওয়ালিতে কাজলের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে স্যাকার বোধ হইত। নতুন মানুষ পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। স্বদেশীকে আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব তার আত্ম-মর্যাদা বোধকেও বাড়াইয়া তুলিল।

বামুন আছে কিন্তু কাজল নিজ হাতে সব খাবার তৈরি করে, হারীতকে

যত্ন করিয়া খাওয়ায়। সকালে টোস্ট ও এগ্ পোচ, দুপুরে মাংস ভাত, বৈকালে ফিস্‌ফ্রাই সিঙাড়া সন্দেশ।

সন্ধ্যার পর আজও কাজল বাড়ির পাঁচ জনে শুনিতে পায় এই রকম উঁচু গলায় চাকরকে মদ আনার হুকুম করে। সে চলিয়া গেলে হারীত বলে, আপনি শুনেছি রবীন্দ্র সঙ্গীত অপূর্ব গান। আজ শোনাতে হবে।

বলিয়াই কাজলের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাকের উপর হইতে হারমনিয়ম নামাইয়া তার সামনে রাখে। কাজল আরম্ভ করে,

সুন্দর, হে সুন্দর
এই লভিনু সঙ্গ তব···

পর পর তিনখানা হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত। তারপর ভাটিয়ালি। কাজলের সঙ্গীতে ঘরখানা ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। তার সুর হারীতের হৃদয়তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করে। তার মনে হয় বুকের কাছে কে যেন বেহালার ছড় টানিতেছে। অনুভূতিটা অপূর্ব।

গান থামিল রাত ন'টার পর। কাজল রাতের খাবার লুচি ও ডালনা করিয়াছিল। হারীত বলিল, কত আর খাব? সন্ধ্যের পরও ত কাটলেট খাওয়ালেন। ভয় হচ্ছে, শেষটায় আপনাকে ফতুর না করি।

মাইরি আর কি?—বলিয়াই কাজল লজ্জায় জিভ কাটে। এমন একটা মানুষের সঙ্গেও সে চব্বিশ ঘণ্টা ভদ্রভাবে কথা বলিতে পারিল না!

হারীত এমন ভাব দেখায় যেন কিছু শুনিতে পায় নাই। তবু কাজল বলে, মাফ করুন।

হারীত কহিল, এর জন্য আপনাদের নয়, লজ্জা হওয়া উচিত সমাজের। এই অবস্থার জন্য দায়ী সমাজ।

আর আমরা নিজেরা?

সামান্যই। এসব সামাজিক কুব্যবস্থার ফল, কুশিক্ষার—বলিয়াই হারীত কেমন যেন গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয় পতিতাদের বেদনা তার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে।

খাওয়ার পর হারীত মেজেয় শতরঞ্জি ও চাদর পাতিলে কাজল কহিল, শুতে শোবেন কি করে? আমি বিছানা করে দিচ্ছি।

নরম বিছানায় শোয়ার আমার অভ্যেস নেই। ঘুম হবে না—বলিয়া

হারীত শুইয়া পড়ে—কাজলের কথার উপর যেন ছেদ টানিয়া দেয়। প্রকারান্তরে হয়ত বুঝাইয়া দেয় এ ঘরের কোন শয্যায় শুইতে সে অনিচ্ছুক।

কাজলও আলো নিবাইয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুম আসে না। সে লক্ষ্য করে হারীতও ঘুমায় নাই। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

খুন খারাপির পর হইতে বাঁধা বাবুরা ছাড়া রাত্রে এ পাড়ায় কেহ থাকে না। মেয়েরাও রাখিতে ভরসা করে না। হারীতের উপস্থিতি তাই দু' দিনেই বাড়ির সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুসুম কাজলকে জিজ্ঞাসা করে, তোর ঘরে যে মিন্সে আজ কদিন আছে, ও কে রে? কুটুম সাক্ষেৎ না কি?

না দিদি।

তবে?

উনি সাধনবাবুর চেনা।

ওঃ, সেই কবিওলা সাধন? তা এই খুন খারাপির দিনে ওকে না রাখলে হত না?

কাজল নীরব। কুসুম জিজ্ঞাসা করে, কাঁড়ি কাঁড়ি দিচ্ছে বুঝি?

কাজল মাথা নাড়াইয়া জানায়, না।

আগের চেনা নয়, ভালবাসার লোক নয়, মোটা টাকাও দেয় না। শুধু 'কবিওয়ালা'র পরিচিত বলিয়াই যে কাজল তাকে রাত্রে থাকিতে দেয় কুসুম ইহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মুখে বলে, তা হবে। ওকে বলে রাশের মিল।

ঘণ্টাখানেক পরে। হারীত পড়িতেছিল, কাজল ছিল রান্নাঘরে। কুসুম ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বামুন?

বইর উপর হইতে মুখ তুলিয়া হারীত বলিল, না।

ওঃ শুদ্দুর। যাক্ আমি কুসম, কুমকমের—

হারীত বলিল, নমস্কার।

আপনি রেতের বেলায় এখানে থাক বুঝি?

আমি এই দু'দিন। আপনার কি চাই?

চাইনে কিছু। আমি হনু বাড়িউলি। পাঁচটা অবলা অখলার ভাল মন্দ আমায় দেখতে হয়। জান ত বাবা, এ গলিতে পর পর কটা খুন হয়েছে?

হারীত বলিল, ওঃ—

কেন, কাজু বলেনি? আমরা ত সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছি। যাক্ পাড়ায় আপনাকে কেউ চেনে? এই ধরুন দো-পেঁয়াজি, ব্রেঞ্চি।

তারা কারা?

আমাদের গলির পানওয়ালা দো-পেঁয়াজি। ব্রেঞ্চি হল দালাল। রাত্তিরে দালালি করে, দিনের বেলা আর একটা নতুন কাজ নিয়েছে, গাড়ি রিজেভ। লোকে গাড়ি-রিজেভ বলে ডাকে।

ওদের ত চিনি না।

তবে?

হারীত এত বড় দুর্ভাগ্যের কোন কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পায় না। বলে, ওদের চিনি না বটে কিন্তু আমায় কি খুনে'র মত দেখায়?

কুসুম বলে, তা, তা আমি বলছি না। তবে আমিও ত গনৎকার নই।

তার শৃগালের মত ধূর্ততায় হারীত কৌতুক অনুভব করে। এই সময় রান্নাঘর হইতে আসিয়া কাজল কহিল, এই যে দিদি, এসেছ কতক্ষণ?

কুসুম বলে, এই এক লহমা হবে।

দুটো পান দেই?

তা দাও।—আরও কয়েকটা অবান্তর কথার পর কুসুম কহিল, ভাল মনে পড়েছে। তিরিশটে টাকার দরকার ছিল।

কাজল তার নিকট বহু টাকা পায়। দিনকয়েক আগেও পঞ্চাশ টাকা দিয়াছে। সে কহিল, হাতে ত নেই এখন।

তোমার হাতে টাকা নেই, সে কি!—কুসুম প্রথমে করে বিস্ময় প্রকাশ। তার পর "সবই আমার অদেষ্ট"—বলিয়া একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়ে। একটু পরে আবার বলে, রাত পোহালে মুন্সি পালের টেস্‌কো শুনতে হবে। মুখপোড়া আসে নোক নস্কর নিয়ে। এ পাড়ায় এলে সবাই আবার বাঘ সিংহী বনে যায়।

তিনজনেই একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। কাজল বলে, ধোঁকাটা চড়িয়ে এসেছি। আমি এখন যাই দিদি।

কুসুম বলে, তাই ত। তোর হাতে টাকা নেই। এখন উপায়।

হারীত কাজলের দিকে চাহিয়া কহিল, টাকার কাজটা আমিই চালিয়ে দি তা হলে?

কাজল কোন উত্তর করে না। কুসুম বলে, দাও বাবা, দাও।

হারীত স্যুটকেস হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া হাতের মধ্যে তিনখানা নোট লইয়া নাড়িতে থাকে। নোটের খশ খশ শব্দে অদ্ভুত ফল হয়। কুসুম বলে, বাবা যে ভাল লোক তা দেখেই বুঝেছি। চেহারা অমন সুঠাম। থাকো বাবা, এখানে থাকো। সুখী হও।

টাকা ত্রিশটা লইয়া যাওয়ার সময় সে বলিয়া গেল, একটু ধোঁকা দিস্ কিন্তু কাজু। তোর রান্না না যেন অত্রিত।

তার পরই হারীতের দিকে চাহিয়া—কাজুর সঙ্গে আমার হামেশাই লেন দেন হয়। পরে দুজনে খতেন করি। আছি যেন দুটো বোন।

সে চলিয়া গেলে কাজল হারীতকে বলিল, আপনি ওকে টাকা দিতে গেলেন কেন?

হারীত বলিল, নইলে ঝামেলা বাধাত। এসে যা মহাভারত ফেঁদেছিল।

ঝামেলা করার ক্ষ্যামতা ওর নেই। বরং টাকা দেওয়ার ফলে বাইরে থেকে গোলমাল এসে পড়লে ও আরও বেশী করে ঘোঁট পাকাবে।

হারীত কহিল, দিয়েছি ত মিসচিপ বন্ধ করার জন্য। দেখা যাক্। আচ্ছা আপনাদের 'গাড়ি-রিজেভ' মানুষটা কে?

বিরিঞ্চি। চকবাগানের মল্লিক বাড়ির ছেলে। রাত্তিরে কোকেন খায় আর দিনে প্ল্যাটফরম-টিকিট কিনে বোম্বাই পাঞ্জাব মেলে গিয়ে জায়গা জুড়ে শুয়ে থাকে। চার আনা আট আনা পেলে জায়গাটা ছেড়ে দেয়। নিজেই নিজের নাম রেখেছে—গাড়ি-রিজেভ।

কাজলের কথা শেষ হইলে হারীতের মুখ দিয়া বাহির হইল, দুর্ভাগা।

হারীতের হাঁটুর নিচের ঘাটা মস্ত বড়, দগদগে, গভীর আধ ইঞ্চির উপর। প্রথম দুইদিন সে নিজে ধুইয়াছিল। এখন ধোয়ায় কাজল। নিম পাতার জলে ধুইয়া বহরের ননী লাগায়। তিন দিনেই পচলা কাটিয়া ঘাটা বেশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। হারীত বলে, এর পর নিজে আর ধোয়াতে পারব না। আপনি আমায় অকর্মণ্য করে দিচ্ছেন।

কাজল বলে, ঘা সারবার আগে আপনাকে ছাড়লে ত।

বেশ, দেখি আমার ভাগ্য।

তখন কিন্তু বকশিশ করতে হবে, খালি ধন্যবাদে চলবে না।

আপনি ত আশাবাদী খুব! হারীত শর্মার কাছেও টাকার আশা।

এই ধরনের লঘু চপল কথাবার্তার মধ্যে কয়টা দিন কাটিয়া যায়। চলে

নিরাবিল হাসি ঠাট্টা। বেশীর ভাগ কথাই হয় ঘা ধোয়ানোর সময় বা খাওয়ার সময়। তা ছাড়া প্রায় সারাক্ষণই হারীত মোটা মোটা বই পড়ে। কখনও বা অঙ্ক কষে। দুজনে মাঝে মাঝে লেখাপড়া লইয়া আলাপ আলোচনাও করে। সেদিন উঠিল টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পিসের কথা। হারীত বইখানা পড়িতেছিল। কাজলের আলোচনা শুনিয়া বলিল, এত সব শিখলেন কার কাছে? শিখলেনই বা কবে?

আমার লেখা পড়ার হাতে খড়ি—বলিয়া কাজল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

হারীত বলিল, হাতেখড়ি শুনেছি রথিবাবুর কাছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপের পর তিনি ত বেশী দিন ছিলেন না। এত শিখলেন কবে?

এই প্রশংসায় কাজল লজ্জা বোধ করে। বলে, আপনি তাঁকে চিনতেন না কি?

হারীত বলে, আমিও তাঁর ছাত্র ছিলাম, প্রেসিডেন্সীতে পড়তুম। তখনই আমরা হার এক্সেলেন্সীর গল্প শুনেছি। পর্দার নিচের ছবিখানা রথিবাবুর না?

কাজল ধীর কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

তার মুখের দিকে তাকাইয়া হারীতের মনে হয় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিয়া সে ভাল করে নাই। কাজল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। সে আর অতীত দিনে ফিরিয়া যাইতে চায় না। রথীনের ছবির উপর পর্দা টাঙাইবার কারণ উহাই।

হারীত ভাবে দেয়ালে টাঙানো ক্রুশলগ্ন কিশোরীর ছবির কথা। কাজলের সঙ্গে সে ঐ তরুণীর জীবনের সাদৃশ্য খোঁজে। দুজনেই ঝড়ে ঝঞ্ঝায় সমান পীড়িত। ঐ তরুণীর মত কাজলেরও একটা আশ্রয় জুটিয়াছিল। কিন্তু—

হারীতের চোখের উপর রথীনের মূর্তি ভাসিয়া ওঠে। সে বলে, হী ওয়াজ জেম অফ এ ম্যান।

কিছুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হয় না। কাজল মাথা নিচু করিয়া অন্য দিনের চেয়ে ধীরে ধীরে ঘা ধোয়ায়। জল নিংড়াইয়া ঘায়ের উপর গরম তুলা চাপিয়া ধরে। হারীতের লাগে বেশ।

সবে ঘা ধোয়া শেষ হইয়াছে এমন সময় ফোন বাজিয়া ওঠে। ফোন ধরিয়া 'আপনাকে ডাকছে'—বলিয়া কাজল রিসিভারটা হারীতের দিকে আগাইয়া দেয়।

হারীত বলে, হ্যালো, কে? ও আপনি? আবার বলুন। ওঃ। এঁ্যা?

কর। আমাদের বাড়িতে টম্যাটো বলে একটি মেয়ে আছে। তাকে ডেকে দিচ্ছি।

টম্যাটো বলে, সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।

আসে প্রমীলা। মাথার চুল সব সাদা, চোখের ভুরুতেও পাক ধরিয়াছে। খালি চোখে সে দেখিতে পায় না। একখানা পুরু কাঁচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) লইয়া চলাফেরা করে। এক হাতে কাঁচখানা থাকে, অপর হাতে নস্যের কৌটা। সেই কাঁচ চোখে লাগাইয়া কাজলকে সে তিরিশ চল্লিশ সেকেণ্ড ধরিয়া দেখিল।

কাজল কহিল, কি দেখছ, দিদি?

এই দেখছি।—দুইটি মাত্র শব্দ কিন্তু প্রমীলা উহা দিয়াই প্রকাশ করিল অনেক খানি। একটু পরে বলিল, মনিষ্যিটার গোঁফ ছিল?

ওঃ, সেই ডাকুর কথা বলছ? তা ছিল বৈ কি।

গোঁফ না থাকলে কি আর ডাকাত হয়? সে গোঁফ চুমরোত?

কাজল হাসিয়া বলিল, গোঁফের উপর টান তোমার আজও গেল না।

বলছিস্ বল্। গোঁফ হল পৌরুষের নিশেনা। আমার ত গোঁফের উপর টান, কুসুমের মা রেশমের ছিল দাঁতের উপর।

কি রকম?

বাবুদের সোঁদর দাঁত না থাকলে মন বসত না।

কাজল বলিল, শুনলুম তোমার বাড়িতে সবাই আমার নাম রেখেছে শ্মশান ঘাট।

প্রমীলা কহিল, একদিন রসি বলছিল বটে, আমি অমনি শুধরে দিলুম কাজু যদি ঘাট হয়ত কাশীর মণিকর্ন্নি।

কুসুমের বিশ্বাস কাজল ডাকাতের নিকট হইতে মোটা টাকা পাইয়াছে। সে ঘন ঘন মদ খাইতে চায়। টাকা চায়। এখন আর ধার নয়।

কাজল একদিন বিরক্তি প্রকাশ করে। কুসুম সেদিন মাতাল অবস্থায় ছিল। বলিল, আমি ত মাগনা চাইছি না। চাইছি নিজের পাওনা।

পাওনা!

হ্যাঁ ডাকাতের টাকার ভাগ। আমি হুকুম না দিলে তুই ঘরে ডাকাত পুষতে পারতিস?

কেন পারতুম না শুনি?

পারতিস না বলেই ত তিরিশটে টাকা খাইয়েছিল। কিন্তু তিরিশটে আবার টাকা! বাড়িউলি চোরডাকাতের টাকার ভাগ পায় অর্দ্ধেক। ওকে বলে বাস্তুপেন্নাম।

এ পাড়ায় নতুন অনেক কিছুই শোনা যায় বিশেষতঃ বাড়িওয়ালীদের মুখে। কিন্তু কুসুমের দাবী একেবারে অপূর্ব। কাজল কহিল, তুমি বললেই ত হবে না।

কুসুম বলিল, আলবৎ হবে। এ পাড়ায় কুমকমের নাতনি যা বলবে তাই বিধেন, তাই শাস্তর।

কাজল চুপ করিয়া গেল।

কাজল নাটাগড় যাইয়া দেখে মীনার শরীর খারাপ। কেমন যেন ফ্যাকাশে, রক্তহীন। সে জিজ্ঞাসা করিল, এ রকম হয়েছে কবে থেকে?

পঙ্কজ কহিলেন, এই দিন পাঁচ ছয়।

ডাক্তার দেখান নি?

নিজেই কদিন ওষুধ দিচ্ছি। মনে করছিলুম আপনাকে খবর দেব কিন্তু আমারও বড় বিপদ চলেছে।

কাজল তার মুখের দিকে তাকায়। পঙ্কজ বলে, আপনাদের শ্রীবর্ধনের অসুখ। তিনি জ্বর আর কাসিতে ভুগছেন। তাঁকেও আমিই ওষুধ দিচ্ছি।

কাজল আস্তে আস্তে বলে, আপনি ওষুধ দিচ্ছেন?

জানেন না বুঝি? আমিও ডাক্তারি করতুন, ওঙ্কার মল, অখিল আমেদ অনেক বড় বড় ঘর আমার বাঁধা ছিল।

কাজলের মুখের দিকে চাহিয়া পঙ্কজ বোঝেন যে মেয়ের এই চিকিৎসা ব্যবসায় সে খুশি হইতে পারে নাই। তিনি বলেন, ডক্টর হ্যারিডেনকে ডাকব? বড় হোমিওপ্যাথ।

যিনি গুরুর নাম করে ওষুধ দেন?

হ্যাঁ, আপনি তাকে চেনেন দেখছি।

আমিও কবার তাঁর ওষুধ খেয়েছি, তিনি ডাক্তার ভাল। তবে আমার ইচ্ছে মীনুকে একজন বড় ডাক্তার দেখাই; এ্যালোপাথ।

সে ত ভাল কথা। আপনাদের বর্ধন মশাইকেও তাঁকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেব।

পঙ্কজের প্রস্তাবে কাজল খুশি হইতে পারে না। সে জানে একই কলে দুই জন রোগী দেখাইলে বড় ডাক্তাররা কোন রোগীকেই মন দিয়া দেখেন না।

এই সময় পাশের ঘরে জোর কাসি আরম্ভ হয়। পঙ্কজ বলেন, ওঁর কাসিটা কদিন আবার বেড়েছে। একবার দেখে আসি। আপনি একটু দাঁড়ান।

তিনি চলিয়া গেলে মীনা মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। তাঁর কোলের মধ্যে মাথা লুকাইয়া ডাকে, মা।

কাজল তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলায়। জিজ্ঞাসা করে, কিরে নাটাগড়ে সুয্যি উঠল ?

কয়েকদিন আগে মীনা মাকে লেখে, মা তুমি নাটাগড়ের সুয্যি নিয়ে গেছ।

মীনা বলে, যাও···

কাজল বলে, লজ্জা কিসের রে ?

মীনা প্রশ্ন করিল, কটকটি কেমন আছে মা ? আর আলতা দি ?

কটকটিকে তুই আর ভুলতে পারলি না।

কটকটি বড় ভাল।

হ্যাঁ। ভালই ত। বুড়ো বেরাল, আর বুড়ো বে···

আর বুড়ো কি মা ?

কাজল বলে, না ও কিছু নয়।

তার দুই দিন পরে মীনাকে কলিকাতার সেরা ডাক্তার দেখানো হয়। তিনি বলেন, ভয় নেই বটে, তবে রোগীকে সাবধান রাখতে হবে। তা না হলে এ থেকে শক্ত অসুখ দাঁড়াতে পারে।

তাঁর অভিমত কাজলকে বিচলিত করিয়া তোলে। বর্ধনের জ্বর আর কাসি চলিতেছে, রোগটা হয়ত গুরুতর এবং সংক্রামক। মেয়ের জন্য কাজলের ভয় হয়। মনে হয় সব চেয়ে আপনার জনই মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু। তার সেই শত্রু মীনা। শেষ পর্যন্ত সে হয়ত চরম প্রতিশোধ লইয়াই চলিয়া যাইবে। কাজল আর ভাবিতে পারে না।

কয়দিন যাবত কুসুমের ভাবভঙ্গী বেশ একটু আনন্দ চঞ্চল। বাড়িতে কোন ক্রিয়া কর্মের আগে গৃহস্বামীর যেমন মনে হয়—কাজটা এখন ভালয় ভালয় হয়ে গেলেই বাঁচি—তার অবস্থা সেই রকম।

একদিন সে আসিয়া কাজলকে ধরিল, ক' দিনের জন্য আমায় একখানা শাড়ী আর একটা বেলাউস ধার দিতে পার, কাজু? শীগগিরই ফিরিয়ে দেব।

কাজল জানে শাড়ী ও ব্লাউস ফিরিয়া পাইবে না তবু বলিল, বেশ।

কুসুম বলিল, নিচ্ছি অলির জন্যে। (খুশি হইলে আলতাকে সে বলে, অলি) জান ত ভাই, মেয়েটার সুবুদ্ধি হয়েছে?

আলতা পতিতার জীবন যাপন করিবে না। ইহা লইয়া মায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তার বহুদিনের। কুশলচাঁদকে ফিরাইয়া দেওয়ার পর কুসুম হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় আলতাকে গালি দেয়। সময় মত খাইতে দেয় না।

আলতা নিরালায় চোখের জল ফেলে। কারও কাছে দুঃখ জানাইয়া যে শান্তি পাইবে তারও উপায় নাই। পল্লীর কোন মেয়েকে তার সঙ্গে কথা বলিতে দেখিলেই কুসুম অমনি গর্জিয়া ওঠে, কী, মেয়েকে ভাংচি দিচ্ছ বুঝি? তা দেবেই ত। অলি এ রাস্তায় এলে সবাইকে যে উপোস করতে হবে।

আলতার অবস্থা অনেকটা নির্জন কারাকক্ষের বন্দীর মত। তার সঙ্গী শুধু কটকটি। কটকটিকে সে আদর করে। উত্তরে বিড়ালটা ডাকে, ম্যাও।

আলতা বলে, ম্যাও, ম্যাও।

কুসুম বলে, দুটো পশুতে বেশ মিলেছে কিন্তু।

কাজল ব্লাউস ও শাড়ী দিলে কুসুম বলিল, দেখলে ধর্মের ঢাক কিরকম বাজল?

এই ঢাকের রহস্য কাজল বুঝিতে পারে না। কুসুম বলে, বুঝলে না? কুমকম ছিল পুণ্যাত্মা মানুষ। কীর্তন গেয়ে গেয়ে কোলকাতার জগাই মাধাইদের চোখের জলে ভাসিয়ে দিত। বুড়ী পিরমিল তাই বলে, বিধেতা অন্যায় অনেক করে বটে কিন্তু এত বড় অন্যায় সেও করবে না। একটু দম লইয়া বৃদ্ধা আবার বলিল, যাক্ তার কথাই ঠিক হল।

ব্যাপারটা এই। বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়া আলতা শেষটায় একদিন মাকে বলে, তোমার যা ইচ্ছে কর মা।

কুসুম বলে, ঠিক? ঠিক ত হতভাগী?

সেই দিনই সে দো-পেঁয়াজীকে ডাকিয়া বলে, তোমার সেই কৌশুলকে নিয়ে এস, বাবা। কৌশুল চন্দরকে।

দো-পেঁয়াজী বলিল, কৌছুঁল? উসকো ত পাত্তা মালুম নেই। লেকিন উস্‌সে বহুত বঢ়িয়া আদমী লিয়ে আসব।

সে ত আরও ভাল। রুই কাতলা যা হয় এনো।

দো-পেঁয়াজী বলিল, তুম বাঙালী লোক মছলি কভি ভুলতে পার না। বাবু লোককো ভি মছলি বনাইয়ে দেও। রোই, কাতলা।

দো-পেঁয়াজী আজ সেই বড়িয়া আদমীকে লইয়া আসে। কালো, বেঁটে, হাতের রোঁয়া তোলা, চোখ দুটি কোকিলের মতন লাল, মাথাটা ছোট। দো-পেঁয়াজী তার পরিচয় দেয়, ই বাবু আমীর হ্যায়।

কুসুম জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোথাকার আমীর বাবা?

উত্তর দেয় দো-পেঁয়াজী—টিউ কলকা আমীর।

কুসুম বলে, ও, নাম শুনেছি। মস্ত বড় লোক, টিউকলের আমীর। তা হিঁদু ত?

এবার আমীর নিজে বলিল, হ্যাঁ মা চক্কোত্তি বামুন। কাশ্যপ গোত্র। আমায় ডাকবেন অজেন বলে।

তা ত ডাকবই। জামাইকে আর নাম ধরে ডাকব না?—একটু থামিয়া কুসুম আবার বলিল, কালীঘাটে যে পূজো মানত ছিল, বাবা।

পূজো। হোয়াট ফর?

অলির জন্যে। মেয়েটা বড় বেয়াড়া। এমনিতে অবিশ্যি ননীর পুতুল কিন্তু এ রাস্তায় কিছুতেই আসতে চায় না। তাই কালীঘাটে—

অজেন বাধা দিয়া বলিল, আলাপ পরিচয় হ'ক পাঁটা ত পাঁটা, মা কালীকে তখন বড় বড় জানোয়ার খাওয়াব। জোড়া মোষ।

কুসুমের মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে। সে মনে মনে বলে, ওরে আমার সোহাগ রে। ফুর্তি করবেন আর আগাম খরচা করবেন না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া দোপেঁয়াজী বলে, আগারি আশনাই হোনে দেও, তব রূপেয়াকো আস্তে ভাবতে হোবে না।

অজেনকে বসাইয়া কুসুম মেয়ের প্রসাধনে মন দেয়, তার মুখে পাউডার ও রুজ মাখায়, মাথায় সুগন্ধি তৈল, পায়ে আলতা, নখে নেইল পলিশ। আলতার ভরন্ত যৌবনে, এসেন্স পাউডারের গন্ধে, রুজ ও শাড়ীর শোভায় অজেন মশগুল হইয়া ওঠে।

কুসুম তার কাছে অগ্রিম প্রণামী চায়। বলে, এটা হচ্ছে মায়ের পাওনা। দশ মাস গর্ভে ধরার 'টেসকো'।

নিজের 'টেসকো' ও মেয়ের টাকা আগাম আদায় করিয়া যাওয়ার সময় সে বলে, অলি সবে এই পনরোয় পা দিয়েছে।

অজেন বলে, তবে ত একেবারে ডাঁশা।

কুসুম মনে মনে বলে, মরণ দশা।

এরপর সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাড়াটেদের কাছে কন্যার সৌভাগ্যের গল্প করে।—টিউকলরা হচ্ছে মস্ত বড় লোক। ওদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

গল্প করে বটে কিন্তু তার নজর থাকে মেয়ের ঘরের উপর। আলতার আজ সবে হাতে খড়ি। অচেনা কালো মানুষটাকে ভয় করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রথম রাত্রে তার নিজেরও ভয় করিয়াছিল—বেলেঘাটার বুড়ো আড়তদার বংশী বাবুকে। ওঃ বাবা, সে কী ভয়!

সে বাহির হইতে লক্ষ্য করে আলতার ঘরে কয়টা মদের পাঁইট গেল, সোডা কয় বোতল। পান সিগারেট খাবার সব জিনিসেরই হিসাব রাখে। চাকর ফতুয়া এক ঠোঙা খাবার লইয়া যাইতেছিল, কুসুম তাকে ডাকিল, দেখি কি নিয়ে যাচ্ছিস। শিঙাড়া? দে ত দুখানা। ছেলেবেলা থেকে শিঙাড়া আমার বড় পছন্দ।

রাত এগারটা বাজিয়া যায়, সাড়ে এগারটা বাজে। অজেনের ওঠার নাম নাই, অথচ কথা ছিল সে এগারটায় চলিয়া যাইবে। কুসুমের ইচ্ছা নয় যে লোকটি সারারাত থাকে। মেয়েকে সে একটু একটু করিয়া সওয়াইয়া লইতে চায়।

আরও খানিকটা পরে সে যাইয়া দরজায় আঘাত করিল। ভিতর হইতে মোটা গলায় আওয়াজ আসিল, কোন্ হ্যায়?

আমি কুসম, অলির মা কুসম।

ইউ ডেভিল।

কুসুম বলিল, ওঃ বাবা, মদ খেয়ে খুব ইঞ্জিরি ছাড়ছে। শাউড়িকেও ইঞ্জিরি।

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি ও ধাক্কাধাক্কির পর আঃ-উঃ ধরনের অস্পষ্ট শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া অজেন কুসুমের গায়ে একটা বিড়াল ছুড়িয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কুসুম হাউ হাউ করিয়া ওঠে। ম্যাও, ম্যাও করিতে করিতে বুড়া কটকটি কুসুমের পায়ের কাছে ঘোরে আর ল্যাজ নাড়ে।

ভীতি কাটিয়া গেলে সে কটকটিকে বলিল, নয়া যৈবন ত তাই তোকেও হিংসে করে তাড়িয়ে দিলে।

অজেন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া কুসুম এবার ডাকে, আলতা, ও অলি।

আলতা জবাব দেয় না। সে তখন বালিশে মাথা রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতেছিল। শেষ রাত্রে অজেন ঘুমাইয়া পড়িলে সে মায়ের কাছে চলিয়া আসিল।

অপরিচিত অজেন পাছে কোন অঘটন ঘটায় এই আশঙ্কায় কুসুম একটা

গোল টুলের উপর দাঁড়াইয়া বাহির হইতে দরজায় শিকল আঁটিয়া দেয়। নেশার ঘোরেই হোক বা স্বপ্নের মধ্যেই হোক অজেন তখন আপনা আপনি আধ-জড়ানো কণ্ঠে চেঁচাইতেছিল, তেরে, তে···রে।

শব্দটা ডালভাঙা যাঁতার ঘরঘরানির মতন।

দিন কয়েক যাতায়াতের পর অজেন একদিন কুসুমের কাছে নালিশ করে, আপনার মেয়ে বড় লাজুক, এতটা ভাল নয়। আমাদের পয়সারও ত দাম আছে।

সে যে কি ইঙ্গিত করিতেছে বুঝিয়া কুসুম বলিল, সে ত ঠিকই বাবা। তবে ও তোমার জিনিস। তুমি গড়িয়ে পিটিয়ে নেও। স্যাকরা যেমন সোনা গালিয়ে—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই অজেন সোৎসাহে বলিয়া ওঠে, তা যা বলেছেন, স্যাকরা আর সোনা—নাইস।

সপ্তাহ খানেক পরে ছুটির দিন। দুপুরের পর হইতে অজেন আলতার ঘরে আসর জমাইয়াছে। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব দু'তিন জন। হুইস্কি আসিয়াছে তিন পাঁইট, বিয়ার কয়েক বোতল। খাবারও প্রচুর। গলির মোড়ের কালী কেবিনের কাটলেট মটনকারি আর আস্ত একটা ফাউল রোস্ট্।

দেখি একটু—বলিয়া কুসুম নখ দিয়া রোস্টের খানিকটা খুঁটিয়া নেয়। কারির ডিস হইতে মাংস তুলিবার সময় কিছুটা ঝোল পড়ে তার শাড়ীর উপর।

তার মনে ফুর্তি আর ধরে না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ হইতে সে নিশ্চিন্ত। এর পর টাকার ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না।

সন্ধ্যার পর সে পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। দু' এক বাড়ি ঘুরিয়া যায় প্রমীলার কাছে। মেয়ের সৌভাগ্যের খবর তাকে আগেই দিয়া গিয়াছিল। আজ বলিল, জান অলিটে দুপুর থেকে ফুর্তি লুটচে?

ঠাণ্ডা পড়ায় সন্ধ্যার পরই প্রমীলা একটা কাবলী বিড়াল কোলে করিয়া শুইয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল, আমীরটি যেন কোথাকার?

কুসুম বলে, টিউকলের।

প্রমীলা প্রথম দিন হইতেই হিংসায় ফাটিয়া পড়িতেছিল। তার মেয়ে থাকিলে সেও ত রোজগার করিয়া খাওয়াইত। আজ সে বলিল, টিউকল! নাম শুনিনি ত। ধাপা-টাপার কাছে বুঝি?

কুসুম বলে, আস্তাবলের আমীর শুনেছ ত? ধরে নাও, সেই রকম।

কথাটা প্রমীলাকে হুলের মত বেঁধে। তার প্রথম প্রেমাস্পদ মাস্তর বাবা ছিলেন আস্তাবলওয়ালা। কয়েকখানি ঠিকা গাড়ির মালিক।

প্রমীলাও সমানে জবাব করে, হ্যাঁ শুনলুম তোর জামাই'র চেহারাও আমার মাস্তরই মতন।

এই বয়সেও আবার সেই আমার মাস্ত! জীবনে বহু পুরুষ আসিয়াছে কিন্তু প্রমীলা ভালবাসিয়াছে শুধু ঐ একজনকে। ছেলেটি ছিল অসাধারণ সুপুরুষ। প্রমীলা এমন মজিয়াছিল যে, সে একদিন না আসিলে লোক পাঠাইত। চাদর গায়ে জড়াইয়া মাস্তদের আস্তাবলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিত।

এখানে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া কুসুম রসবতীর ঘরে যায়। তার প্রথম বাবু তখন চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অতিথির জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল। কুসুমকে দেখিয়া বলিল, আলতার শুনলুম রুই কাতলা জুটেছে। কোথাকার রাজপুত্তুর।

রাজপুত্তুর নয়। আমীর।

কাজলি নিশ্চয়ই হিংসেয় মরে যাচ্ছে?

সে আর বলতে?—কাজল আলতাকে হিংসা করিতে পারে এই সম্ভাবনায়ই কুসুমের মনে আনন্দ আর ধরে না। বলে, ওর দিন ফুরিয়ে এল ব'লে। ঘরে লোক জন আসা অনেক কমেছে।

হারীতের আবির্ভাব কাজলের সমস্ত মনকে দোলা দিয়া যায়। এর পরই মীনার অসুখ। এই সব কারণে সকল বিষয়েই তার শৈথিল্য আসিয়াছে। গান বাজনা হৈ হুল্লোড় ভাল লাগে না। চেনা লোক ছাড়া ঘরে কাহাকেও বসায় না। নতুন কেহ আসিলে ফিরাইয়া দেয়। ওজুহাত দেখায়, শরীর খারাপ, মন খারাপ।

তার ঘরে লোক কম আসে শুনিয়া রসবতীর চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, তাই নাকি? ব'স দিদি, দুটো পান খেয়ে যাও। লখ্‌নোর জর্দা দিয়ে সাজা। কুড়ি টাকা ভরি। আমার ডাইভার বাবু দিয়েছে।

সেই ছিরিধর?

হ্যাঁ। আর কোন নেশা ত তার নেই। শুধু যা ঐ জর্দা। তা অবিশ্যি রোজ সিকি ভরি লাগে। পাঁজ জনকে দিতে থুতে হয়।

পান খাইয়া কুসুম উঠিল রাত নটা আন্দাজ। সন্ধ্যার পর হইতেই ঝির ঝির বৃষ্টি পড়িতেছিল। গলিটা ভিজিয়া পিছল হইয়াছে।

বাবুদের আমদানি প্রচুর। ঘরে ঘরে হৈ হল্লা। কোন জানালা দিয়া ইলিশ মাছ

ভাজার গন্ধ আসে, কোথায়ও বা তবলার চাঁটির শব্দ। কুসুম বাড়ি ফিরিয়া দেখে কাজলের ঘরেও নাচ গান চলিতেছে। নাচে অনিলা, তবলা সঙ্গত করে কাজল।

কুসুম খুশি হইতে পারে না। মনে মনে বলে, চেনা কোন হা-ভাতে এসেছে বোধ হয়। কিন্তু এ জলুস আর কদিন।

আলতার ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরটা অন্ধকার। অজেনের যাওয়ার কথা রাত নটায়। কুসুমের একবার ইচ্ছা হইল আলতাকে ডাকে। খোঁজ নেয়। আবার ভাবিল, ঠাণ্ডা পেয়ে ইয়ার বন্ধুদের বিদেয় করে ছুটোতে খুব ফুর্তি লুটছে। লুটুক। অলির ভয় এমনি করেই ত ভাঙাতে হবে।

কত কল্পনাই না সে করে! মেয়ে তার দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবে, কথায় কথায় টাকার জন্য দেমাকে কাজলীর কাছে হাত পাতিতে হইবে না। রোজই বিপিনের সঙ্গে মাল খাইতে পারিবে, মাল আর মাছের ফ্রাই।

বুড়া বয়সে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকিবার জন্য লোকে ছেলে চায়। সোনাবাগানের অধিবাসিনীরা চায় মেয়ে। আলতা এ রাস্তায় আসিতে না চাওয়ায় কী কষ্টেই না সে পড়িয়াছিল! ভাগ্যিস মেয়েটা শেষটায় রাজী হইল!

বিপিন ঘরে বসিয়া সিদ্ধি বাঁটিতেছিল। কুসুম বলিল, মাল আছে যে মুখপোড়া, আবার সিদ্ধি ঘোঁটা কেন?

মুখপোড়া আদরের ডাক। বহুদিন পরে মুখপোড়া শুনিয়া বিপিন যেন গলিয়া যায়। তার উপর আবার মালের খবর। সে বলে, এঁ্যা, মাল! বিলিতি ত?

তোমার যেমন বুদ্ধি। ঘরে আমীর জামাই। শাউড়ীকে সে কি আর খাঁটি খাওয়াবে?

বিপিন বলে, তা বটে। মাল আছে কতটা?

যা আছে তার সঙ্গে আর একটা পাঁট কিনলেই চলে যাবে।

পাঁট আবার কেন? মালের সঙ্গে একদিন সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে দেখ। প্রাণ তরর্…

প্রস্তাবটা কুসুমের মনে ধরিল। মদের সঙ্গে সিদ্ধির ঠাণ্ডাই—বাদলা রাতে নেশাটা জমিবে ভাল।

এই অপূর্ব পাঞ্চ খাইয়া বিপিন কিছু সময় পরেই গান ধরে,

সিদ্ধির সঙ্গে বেলাক হোয়াইট
(আর) মুর্গীর সঙ্গে হরি নাম
আ হা হা রে…

কুসুম বলে, চুপ কর না। জামাই শুনলে ভাববে কি?

একটু পরে দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িল। প্রথমে জাগিল কুসুম। ঘড়ির ঠং ঠং শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

অজেনের আজ টাকা দেওয়ার কথা। কুসুমের মতলব ছিল বেশী সময় থাকার জন্য তার নিকট অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবে। আলতাকে রাজী করাইয়া লোকটাকে সারা রাত রাখিতে পারিলে ত কথাই নাই।

আলতাকে ঘরের সামনে আসিয়া সে ডাকিল, বাবা অজ।

ভিতর হইতে কোন উত্তর আসে না। কুসুম আবার ডাকে, শুনছ, ও টিউকল। আমি কুসম ডাকছি, অলির মা।

এবারও ডাক নিষ্ফল হয়। কুসুম তারপর ডাকে আলতাকে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় একটু ধাক্কা দিতেই একটা পাল্লা খুলিয়া যায়।

ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। ঘরে আলতা বা অজেন কেহ নাই। বিছানার নিচে মদের ডিক্যাণ্টার ও গেলাস। বিছানায় পেঁয়াজকুচি ও বাদামভাজা ছড়ানো। আলনায় শেমিজ ব্লাউস কিছুই নাই। অজেন একটা স্যুটকেশ দিয়াছিল, তাহাও উধাও হইয়াছে।

কুসুম ছুটিয়া উপরে যাইয়া বিপিনকে ডাকে, ও অলপ্পে, এখনও ঘুমুচ্ছ? এ ধারে যে আগুন লেগেছে।

আগুন!—বিপিন ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই এদিক ওদিক তাকায়। প্রথমে তাকায় দরজার দিকে। তার পর বলে, আগুন কোথায়?

কুসুম বলে, দেখছ না? আমার কপালে।

ঘটনাটা শুনিয়া বিপিন বলিল, সবই ঐ ঠিকেদারের কাণ্ড। টিউবওয়েলের ঠিকেদার, এ পাড়ায় এসে আমীর সেজেছে। ছোটলোক কাঁহাকা। মৈমনসিংহের রাজার নাতিকে বেটা সে দিন কী ইনসল্টোটাই না করলে!

অজেনের পয়সায় যারা ফুর্তি করে তাদের প্রত্যেকেরই ঐ এক অবস্থা। অভিজ্ঞতাটা বিপিনেরও ব্যক্তিগত। কুসুমের অজ্ঞাতে সেও দুই তিন দিন অজেনের কাছে মদ চাহিয়া খাইয়াছে। প্রতিদিনই অপমানিত হইয়াছে। সে আবার বলিল, গয়নার লোভে ওই আলতাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

কুসুম চাপা গলায় বলে, সেগুলো যে সব গিলটির।

বিপিন বলিল, শালা ত আর তা জানে না।

তাদের আলোচনা শুনিয়া নতুন ভাড়াটে ছোট দো-আনি বলিল, বাড়িউলি মাসী, তোমার জামাইকে আমি রাত আটটায় বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আলতা ছিল ?

না।

তবে, তবে ?—বলিয়া কুসুম দো-আনির দিকেই যেন তাড়া করিয়া যায়।

দো-আনি ত অবাক্। খবরটুকু জানাইয়া সে কি যে অপরাধ করিয়াছে বুঝিতে পারে না।

এবার জোর তল্লাশি আরম্ভ হয়। ছাদে, বাথরুমে, বাটীর সর্বত্র। আবার তারা আলতার ঘরে আসে। বিপিনের চোখে পড়ে এক টুকরা লাল কাগজ। বিছানার কোণ হইতে তার একটু অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিপিন কাগজখানা তুলিয়া তার উপর চোখ বুলাইয়া বলে, এই রে !

কুসুম জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল ?

আর হ'ল।

মেয়েটা পালিয়েছে এই ত ? তা আমি আগেই বুঝেছি। কি লিখেছে একবার পড় দেখি।

বিপিন পড়িয়া শোনায়—

মা, আমি চললুম। জানি তুমি দুঃখু পাবে, কিন্তু এ সব আমার ভাল লাগে না। এ পাড়াও নয়।

দেবীদির চাকর মতি বলেছে আমায় বিয়ে করবে। পুরুত ডেকে, মন্তর প'ড়ে। তুমি আশীর্বাদ কর আমরা যেন সুখী হই।

মতি লোক খুব ভাল। লেখাপড়া জানে। বিয়ে করেই সে কারবার খুলবে। ইলেকৃটি মিস্তিরির দোকান।

অজ বাবু আজ টাকা দিলে। সে আমি নিয়ে চললুম। রাগ ক'রনা যেন।

আমার জন্ম ভেব না। মাঝে মধ্যে খবর দেব। তোমায় বড্ড ভালবাসি মা। কিন্তু এ রাস্তা আমার ভাল লাগে না। বাবুদেরও নয়।

ইতি তোমার অলি।

কুসুমের চোথ মুথ দিয়া হতাশা আর ক্রোধ যেন ফাটিয়া পড়ে। অজেন আসার পর এই কয়দিন কল্পনার কী সৌধই না সে গড়িয়াছিল ! আলতা মুহূর্তে সব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। কুসুম দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, টাকা ! হারামজাদী টাকাটাও নিয়ে গেল ! রাত পোহালে বন্ধু মুদীটাকে টাকা দেওয়ার কথা। মুটকো এলে—

সে পাগলের মতন প্রলাপ বকে। টাকার শোকের সঙ্গে সমস্ত জীবনটা যেন ভিড় করিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। কুমকুমের স্মৃতি ছাড়া উজ্জ্বল রেখা তাতে একটিও নাই।

কুসুম বিপিনের দিকে চাহিয়া বলে, কী পাপ! এরই নাম ঘোর কলি। নইলে কুমকমের ঘরের মেয়ে বেরিয়ে যায় একটা চাকরের সঙ্গে?…ফুঃ!

একটু থামিয়া আবার আপন মনেই যেন বলিতে লাগিল, এতদিন চোখে চোখে রেখেছি। ঘরে বাবু বসিয়ে কী ফাঁকিটাই না দিলে!

বিপিন বলিল, নিজে কি আর ফাঁকি দিয়েছে? দিইয়েছে আর পাঁচ জন।

ঠিক বলেছ। রসিও তাই বলছিল, রসবতী। আমার শত্তুরের ত অভাব নেই। আলতার বাড়-বাড়ন্ত দেখে মাগীদের চোখ টাটিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই কুসুমের মনে পড়িয়া যায় আজ অজেন আসার আগে আলতাকে সে কাজলের ঘরে যাইতে দেখিয়াছে। দুজনে গুজুর গুজুর করিয়াছে—সলা পরামর্শ। সে বলিয়া উঠিল, এ কাজ নিশ্চয়ই কাজ্‌লির।

বিপিন সঙ্গে সঙ্গেই ফোড়ন দিল, আমারও সেই সন্দ। বাড়িখানা গেলার মতলব।

কুসুম জোর গলায় ডাকে, কাজ্‌লি।

কাজল নিচে ছিল, বাথরুমে। সে বলিল, কি, ডাকছ কেন?

ডাকছি কেন! হারামজাদী—বলিয়া কুসুম সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া আসে।

তার চেঁচামেচিতে আগেই কারও কারও ঘুম ভাঙিয়াছিল। এবার জাগিয়া উঠিল বাড়ির প্রায় সবাই। অন্য ভাড়াটের সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক না কেন, কুসুম কাজলকে বরাবরই খাতির করে। আজ তার প্রতি কুসুমের এই রুদ্র রূপ দেখিয়া প্রত্যেকেই অবাক হইয়া যায়।

কলঘরের সামনে আসিয়া কুসুম বলিল, আমার মেয়ের কি করেছিস, হারামজাদী?

কাজল তার দিকে চাহিয়া থাকে। নিজের শ্রবণশক্তিকেও সে যেন বিশ্বাস করিতে পারে না। কুসুম বলে, কি, নিশ্চুপ রইলি যে?

কাজল কহিল, এসব কি বাজে বকছ?

শুধু কি আমি বলছি? বলে পাঁচ জন। এই ত রসবতী। তোর ইচ্ছে আমরা উপোস করে মরি। তুই বাড়ির মালিক হ'স।

এসব কথা বলতে তোমার একটু বাধল না?

নর্দমায় থুথু ফেলব, তার আবার বাধা! হেঃ হেঃ—

কুসুমের হাসির সঙ্গে এক ঝলক দুর্গন্ধ বাহির হয়। কাজলের গা গুলাইয়া ওঠে। সে বলে, যাও, যাও। খাঁটি খেয়ে আর ছোটলোকমি করতে হবে না।

ওরে আমার বড় মানুষ রে, বিলিতি খানেওয়ালী—বলিয়া কুসুম কাজলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

কাজল এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চৌবাচ্চার কোণে লাগিয়া তার কপাল কাটিয়া যায়। আরম্ভ হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। ছোট ঘরের মধ্যে অসম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, কিল চড়, ঘুসাঘুসি। স্বাস্থ্যবতী যুবতী কাজলের সঙ্গে কুসুম আঁটিয়া উঠিতে পারে না। চেঁচায়, মুখপোড়া গেল কোথায়? খাবার বেলায় আছে আর নড়বার বেলায়—

নড়বার বেলায়ও আছি। খবরদার, বলিয়া বিপিন লাঠি হাতে দোতলা হইতে ছুটিয়া আসে। বাথরুমের সামনে আসিয়া মাথার উপর বার দুই তিন লাঠি ঘোরায়। এই সময় দেখে কুসুমের নাক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

সেও যুদ্ধে নামে। দুজনে মিলিয়া কাজলকে টানিয়া বাহিরে আনে। হুইস্কি-সিদ্ধির পাঞ্চ এবার অঘটন ঘটায়। কুসুমের ঝোঁক চাপে, কাজলকে বাড়ির বাহির করিয়া দিবে। ধাক্কা দিতে দিতে দুজনে তাকে সদর দরজার দিকে লইয়া যায়।

চেঁচামেচি শুনিয়া এবাড়ির মেয়েরা বাদেও ললিতার বাড়ির যশি, পাঁচির ভাড়াটে নিমি অনেকেই আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখে।

এই ধরনের দৃশ্য সোনাবাগানে প্রায়ই ঘটে, দালালে দালালে, বাবুতে বাবুতে, বাড়িওয়ালী ও ভাড়াটিয়ায় মারামারি। তবে মারামারি ত দূরের কথা কাজলকে কেহ কখনও কড়া কথা বলিতেও শোনে নাই। তারা ভাবে, এ কী!

কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কিছু বলে না। একবার শুধু টম্যাটো বলিয়াছিল, কাকে কি বলছ বাড়িউলি দি?

কুসুম অমনি গর্জিয়া উঠিল, তার মানে?

সময় অসময় কাজল তোমায়—

কুসুম অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দেয়। লাঠি উচাইয়া বিপিন তাড়া করিয়া যায়, ধেত্তের বিলিতি বেগুনের নিকুচি করেছে।

টম্যাটো সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে যাইয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিল।

কুসুম ও বিপিন ধাক্কা দিতে দিতে কাজলকে সদর দরজার কাছে লইয়া গেলে সে সরযূর জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়ায়। কুসুম তার চুলের মুঠা

ধরিয়া টানে, বিপিন টানে হাত ধরিয়া। কাজল নড়ে না। আপ্রাণ চেষ্টা করে গরাদ আঁকড়াইয়া থাকিবার।

বিপিন তার হাতে লাঠি মারে। সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা ঝুলিয়া পড়ে। কাজল বলিয়া ওঠে, বাবাগো।

দুজনে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া তাকে বাটীর বাহির করিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দেয়।

রাত ১টা। ভাঙা হাত ধরিয়া কাজল রোয়াকের উপর বসিয়া আছে। তার কপালে পাঁচুর দেওয়া দাগের পাশে জমাটবাঁধা খানিকটা রক্ত। চুলগুলি আলুথালু, চাহনি উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন। বাঁ চোখের কোণে একটা শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে। মুখের ঐ পাশটাই নীল দেখায়।

অতিরিক্ত গরমের পর ঠাণ্ডা পাইয়া দালাল এবং পানওয়ালার দল যে যার আড্ডায় বিশ্রাম করিতেছে। কোকেনখোর বিরিঞ্চি ঘুমাইয়া আছে একটা রোয়াকের উপর।

গলিটা জনশূন্য, রিক্ত। মেঘলা রাতের হিমেল হাওয়া সেই রিক্ততাকে আরও প্রকট করিয়া তোলে। এক এক বার জোরে হাওয়া বয়, মনে হয় সারা সোনাবাগান যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে। গলির গ্যাসের কাঁচের উপর দিয়া জল গড়াইয়া যায়। কাজলের দুই গণ্ড বাহিয়াও অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

বহুক্ষণ পরে, কতক্ষণ কাজল জানে না, নিজের অবস্থা একটু একটু করিয়া তার কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মনে পড়ে জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস, যেন দাবার একখানা ছক, কালো ঘরই তাতে বেশী—পাঁচু, কুসুম—

ধনীরা খাতির করে, মন্ত্রী কাজ বাগাইয়া নেয়, জলের মতন টাকা আসে, ঈর্ষা করে পাড়ার সবাই। দোপেঁয়াজী বিরিঞ্চির দল বলে, তুমি ত রাজরাণী আছ।

রাজরাণী, হিঃ হিঃ।

কী অদ্ভুত পরিহাস, জগতে মাথা গুঁজিবার মত একটু ঠাঁই নাই, দাঁড়াইবার জায়গা নাই! সমাজ ধূপগঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দিল, আজ তাড়াইল কুসুম। বিপিন মারিল।

রাজরাণীই বটে। হিঃ হিঃ—

উত্তরের চওড়া গলিতে শব্দ হয়—জুতার মশ মশ ও লাঠি ঠোকার শব্দ।

কাজল চাহিয়া দেখে দুতিনটি লাল পাগড়ি, সঙ্গে একটি অফিসর, শোভনার সেই তরুণ, কদমের ছেলে, পাঁচুর—

আবার সে!

শোন।

কাজলের পাশ হইতে কে যেন বলিয়া ওঠে, শোন। আধাবয়সী ঝাঁকড়া চুলো কালো একটা মানুষ। ট্যারা।

কাজল তার দিকে চায়। তার চোখ দিয়া যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হয়।

ওঃ বাবা—বলিয়া লোকটা সরিয়া পড়ে।

কাজলের মনে হয় তার পায়ের তলায় গলিটা ঘুরিতেছে। প্রমীলার জানালা, পরিবালার ছাদের গম্বুজ, হলদে বাড়ির ঝুল-বারান্দা সবই ঘোরে। ঢেউয়ের উপর নৌকার মত দোল খায়। কাজলের ভয় করে এখনই বুঝি সব হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে। সে ভয়ত্রস্ত শশকের মতন এদিক ওদিক তাকায়।

সামনের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা মাতাল বমি করে। খানিকটা বমি পড়ে গলির উপর, কাজলের সামনে বলিলেই চলে।

একটু দূরে পথচারী একটা কুকুর চোখ বুজিয়া মুর্গীর ঠ্যাং চিবায়। লোমহীন ঘেয়ো কুকুর। দগদগে ঘায়ে ভরা।

কাজলের চোখের উপর আঁধার নামিয়া আসে। অবসাদ ও ক্লান্তির অন্ধকার।

কুকুরটা, ঝাকঁড়া চুলো ট্যারা, মন্ত্রী, পাঁচু, বিপিন সব যেন একাকার হইয়া তার চোখের সামনে ঘুরিতে থাকে। ঘোরে কুসুম, তারক ভাবিনী, কদমের ছেলে, বালতি রাজ গোকুলচাঁদ। রথীনকেও একবার দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মিলাইয়া যায়।

বুড়া কটকটি একটা বিড়ালীর পিছনে ছোটে।

বাড়িগুলি আরও জোরে ঘোরে। কাজল দেখে পরিবালার বাড়ির গম্বুজের উপর তার চেনা অসংখ্য মুখ। তার মধ্যে পাঁচুর মুখই সব চেয়ে বড়।

মাঝখানে কচি একখানা মুখ।

মীনা না?

না, না। মীনাকে কোন দিনই সে ঐ ঘৃণার মধ্যে যাইতে দিবে না।